একাত্তরের আত্মঘাতের ইতিহাস

ফিরোজ মাহবুব কামাল

www.firozmahboobkamal.com

একাত্তর নিয়ে কেন এ লেখা

মানব হিসাবে প্রত্যেকের কিছু দায়- দায়িত্ব থাকে। মুসলমান হিসাবে কিছু বাড়তি দায়িত্বও থাকে। আর সে বাড়তি দায়িত্বটা হল সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেওয়া। ইসলামে এটিকে বলে শাহাদতে হক তথা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান। মুসলমান হওয়ার জন্য কালামে শাহাদত জনসম্মুখে পাঠ করতে হয়। লা-শরীক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সত্য - কালেমায়ে শাহাদত পাঠের মধ্য দিয়ে সে সাক্ষীটিই প্রবল ভাবে দিতে হয়। তবে সে দায়িত্ব এখানেই শেষ হয় না, শুরু হয় মাত্র। সত্যের পক্ষে এরূপ প্রকাশ্য সাক্ষ্যদানের পর, প্রতিটি মুসলমানের জীবনে সেটিই তার আমৃর্ত্যু জীবন- সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। ফলে জীবনের আশে পাশে যে সত্যঘটনা ঘটে তাকে সেগুলিরও পক্ষ নিতে হয়। সত্যকে বিজয়ী করতে সে শুধু মসজিদে, জনপদে বা জিহাদের ময়দানেই যায় না, আদালতেও যায়। সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে হয় সর্বসাধারণের বিবেকের আদালতেও। সে কাজটি করে লেখনী। এজন্যই লেখকের কলমের কালিকে শহিদের রক্তের চেয়ে পবিত্র বলা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে সে কাজটি যথার্থ ভাবে হয়নি। ফলে সত্য ও ন্যায়নীতি পরাজিত দেশটির সর্বত্র। ইসলামের পক্ষের শক্তি আজ পরাজিত শক্তি। এবং দুর্বৃত্তি ছেয়ে গেছে শুধু প্রশাসনে, রাজনীতি ও ব্যবসা- বাণিজ্যে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিতেও। যে সমাজে নামায রোযা আছে অথচ রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নেওয়ার লোকের অভাব সে সমাজে সুবিচার, সুনীতি ও শান্তি আসে না। তখন সুস্থ্য সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মিত হয় না। সে দেশে অতিশয় দুর্বৃত্তরাও তখন নেতা হয়, এমপি হয় এবং মন্ত্রীও হয়। মিথ্যাজীবীরা তখন বুদ্ধিজীবী রূপে গন্য হয়। দেশ তখন দূর্নীতিতে বার বার বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। আর বাংলাদেশ তো তেমনই এক দেশ।

জীবনের প্রতি পদে প্রতিটি ব্যক্তিকেই কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাকে রায়ও দিতে হয়। সেটি কখনও পরিবারে, কখনও সমাজে, আবার কখনও বা রাষ্ট্রের রাজনীতি ও প্রশাসনে। রাজনীতির ক্ষেত্রে সে রায়ের গুরুত্ব আরো অধিক। কে কত দীর্ঘকাল বাঁচলো সেটাই বড় কথা নয়, কতটা সত্য পথে থাকলো এবং কীরূপে দায়িত্বপালন করল সেটিই বড় কথা। যে সমাজে সঠিক দায়িত্বপালনকারির অভাব সে সমাজ ব্যর্থতায় রেকর্ড গড়ে। রায় প্রদানে বিচারকের অভিজ্ঞতা ও বিবেক- বুদ্ধিই যথেষ্ট নয়, অতি অপরিহায্য ছিল সত্য

ঘটনার পক্ষে বিচারকের সে আদালতে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানের বিষয়টিও। নইলে ব্যর্থ হয় ন্যায় বিচার। তখন নিরেট অপরাধীরাও নির্দোষ রূপে মূক্তি পায়।ঠিক একই কারণে জনগণও নিছক নিজ বিবেক- বুদ্ধির উপর ভরসা করে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক রায় দিতে পারে না। সে কাজে ঘটনার পক্ষে সত্য সাক্ষী চাই। সে সাক্ষী পেশ করে ইতিহাসের লেখকেরা। বাংলাদেশে সে কাজটি সঠিক ভাবে হয়নি। রাজনীতি ও প্রশাসনের ন্যায় প্রচন্ড দূর্নীতি ঢুকেছে এ ক্ষেত্রটিতেও। ইতিহাস রচনার ময়দানটি যাদের দখলে তারা চালিয়েছে প্রচন্ড মিথ্যাচার। পরিকল্পিত ভাবে রচনা করেছে বিকৃত ইতিহাস। আর সেটি ঘটেছে একাত্তরকে নিয়ে। ফলে জনগণ ব্যর্থ হচ্ছে ঘটনার বিচারে সঠিক সাক্ষী পেতে। ফলে প্রচন্ড ব্যর্থতা ফুটে উঠছে জনগণের রায়দানেও। এ রায়ে দুর্বৃত্ত স্বৈরাচারি, গণতন্ত্রের হত্যাকারি, এবং একদলীয় শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ও বাকস্বাধীনতার হরনকারীরা শুধু নিরপরাধ রূপেই নয়, নির্বাচন যোগ্যও বিবেচ্য হচ্ছে। বাংলাদেশে ইতিহাসের মূল্যায়ানে কতটা গভীর ভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক দূর্নীতি ঘটেছে একাত্তরকে নিয়ে এটি হল তার অকাঠ্য প্রমাণ।

যে কোন জাতির জীবনে সংঘাত আসে। যুদ্ধও আসে। একাত্তরে তেমন একটি যুদ্ধ এসেছিল বাংলাদেশেও। স্বভাবতাই সে যুদ্ধ বা সংঘাতে দুটি পক্ষ ছিল। সভ্য দেশে বিজয়ীরা পরাজিতদের জন্যও কিছু জায়গা ছেড়ে দেয়। যেমন আদালতে বিবাদী বা আসামীকেও আত্মপক্ষ সমর্থণে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে তাদের জন্য কোন জায়গাই রাখা হয়নি। তাদের প্রতি বরং নিক্ষিপ্ত হয়েছে নিছক গালি- গালাজ। হরন করা হয়েছে তাদের বাক স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সেকুলারদের রচিত ইতিহাসের বই তাই পরিণত হয়েছে নিছক গালিগালাজের উপাখ্যানে। এমন ইতিহাস কি বিবেকমান মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পায়? ইতিহাসের এমন গ্রন্থ তো আস্তাকুড়ের আবর্জনা হয়। আল্লাহতায়ালা লেখককে এ জীবনে বহু কিছুই কাছে থেকে দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। অনেক নেতাকে যেমন দেখার সুযোগ হয়েছে তেমনি সুযোগ মিলেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সরাসরি জানার। সুয়োগ মিলেছে দীর্ঘ কয়েক দশ ধরে মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ অবলোকনের। ফলে দায়ভারও বেড়েছে। কারণ দুর্বৃত্তি, সন্ত্রাস, মিথ্যাচার ও ধোকাবাজির ঘটনা সবার পক্ষে স্বচোক্ষে দেখার সুযোগ হয় না। কিন্তু যারা

দেখেন তাদের দায়িত্বও বেড়ে যায়। তখন শুরু হয় ঈমানের পরীক্ষা। কারণ সাক্ষী গোপন করাও তো মহাপাপ। তায় দায়ভার নিতে হয় আদালতে সত্য সাক্ষী পেশ করার। আর সেটি জনগণের আদালতে। শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্যই নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সে দায়িত্ব আরো বেশী। জনগণের আদালতে যারা লাগাতর সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা হলো ইসলাম বিরোধী শক্তি। ইসলোমকে পরাজিত দেখার মধ্যেই তাদের আনন্দ। বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় রুখতে তারা অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে একাত্তরে ইসলামপন্থিদের ভূমিকা। আসামীর কাঠগড়াতে খাড়া করছে ইসলামের পক্ষের শক্তিকে। এ কাজে তাদের প্রচন্ড আগ্রহ এ কারণে যে, দেশে প্রবল ভাবে বিজয়ী সেকুলার জাতীয়তাবাদী দর্শন। এ দর্শনে ইসলামপন্থিদের ঘায়েল করা খুবই সহজ। প্রতিটি বিচার কাজে আদলতে যেটি নীরবে কাজ করে সেটি বিচারকের বিশেষ জীবন- দর্শন বা চিন্তার মডেল। বিচারকের দর্শন বা চিন্তার মডেল পাল্টে গেলে তাই বিচারও পাল্টে যায়। ঘটনার বিচার বিশ্লেষণে একই রূপ ঘটনা ঘটে জনগণের চিন্তারাজ্যেও। চিন্তা- চেতনার সেকুলার মডেল আর ইসলামি মডেল এক নয়, পার্থক্য বিশাল। এরূপ দুই ভিন্ন চিন্তার এ দুই ভিন্ন মডেলে বিচারও তাই একই রূপ হয় না। চেতনার সেকুলার মডেলে নিরেট ব্যভিচারও চিত্রিত হয় মহাপ্রেম রূপে। বাংলাদেশের কাফের আইনে এটি কোন অপরাধই নয়। ফলে দেশটিতে পতিতাবৃত্তি সরকার অনুমোদিত একটি বৈধ পেশা। উপনিবেশিক কাফের শাসনামলে এ পাপ যে ভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্যা পেয়েছে এখনও সেটি পাচ্ছে। অথচ আল্লাহর আইনে এটি পাথর মেরে হত্যাযোগ্য অপরাধ। তেমনি সূদ খাওয়ার নাম হারাম কাজটিও সেকুলার চিন্তা- চেতনায় কোন পাপ নয়, নিষিদ্ধও নয়। অথচ ইসলামের এটি মায়ের সাথে জ্বিনার চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সেকুলারদের কাছে এ মহাপাপটি আইনসিদ্ধ ও নীতিসিদ্ধ গণ্য হচ্ছে। মানুষে মানুষে বিচারে যে প্রচন্ড পার্থক্য তা তো জীবন দর্শনে এরূপ ভিন্নতার কারণেই। দর্শনে ভিন্নতার কারণে বিষধর সাপ যেমন দেবীর আসন পায়, তেমনি ঘৃণ্য অপরাধীরাও বীরের মর্যাদা পায়।

এমন একটি সেকুলার মডেলে বিচার হয়েছে একাত্তর নিয়েও। সেকুলারিজম, জাতিয়তাবাদ, সমাজবাদ ও হিন্দুধর্মে একাত্তরে পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়াটি ছিল মহা- অপরাধ। এসব মতের অনুসারিগণ মহাকর্ম মনে

করেছে পাকিস্তান ভাঙ্গাকে। কিন্তু এটি কি অপরাধ গণ্য হতে পারে ইসলামি মানদন্ডেও? বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান, অথচ একাত্তরের বিচারে ইসলামি দর্শনের সে প্রয়োগই হয়নি। এ অবধি একাত্তরের উপর যত বিশ্লেষণ হয়েছে ও যত বই লেখা হয়েছে তার সিংহ-ভাগ হয়েছে জাতিয়তাবাদী সেকুলার চেতনায়। অথচ ইসলাম ১৪ শত বছর পূর্বেই এমন চেতনাকে কবরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে আগাছার ন্যায় এ চেতনাই প্রবল ভাবে বেড়েছে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে সোচ্চার শুধু এক পক্ষই। এবং সেটি ইসলামের বিপক্ষ শক্তি। পাঠ্য বইয়ে ইসলামি বিচারে একাত্তর নিয়ে কোন আলোচনাই নাই। পেশী শক্তির বলে সেটি এ যাবত বন্ধ রেখেছে। বাংলাদেশ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসের দেশে সেই একাত্তর থেকেই। ফলে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে সীমাহীন ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে। ইসলামের পক্ষের শক্তিও এ নিয়ে মুখ খুলছেন না। ভাবছেন, অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। সেকুলারিজমের প্রবল স্রোতের মুখে অনেকেরই শক্তভাবে দাঁড়াবার বুদ্ধিবৃত্তিক বল নাই, সাহসও নেই। তাই তারাও ভেসে চলেছেন স্রোতের টানে এবং আত্মসমর্পণ করেছে সেকুলারদের মিথ্যাচারের কাছে। মিথ্যার মোকাবেলা করা না হলে মিথ্যাই প্রবল হয়। সে মিথ্যা তখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ছাড়ে না। তাছাড়া সত্য প্রকাশ না করার জন্য মহান আল্লাহর সামনেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তবে মিথ্যার স্তুপ যত বিশালই হোক সত্যের আগমনে তা দ্রুত বিলুপ্ত হয়। আরবে হাজার হাজার বছর ধরে মিথ্যার যে স্তুপ জমেছিল তা সত্য দ্বীন আসার সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়েছিল। অথচ সত্যদ্বীন আগমনের পূর্বে কেউকি সেটি ভাবতে পেরেছিল? তাই সত্য প্রতিষ্ঠা পেলে একাত্তরের আওয়ামী বাকশালী চক্রের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস যে প্রকাশ পাবে তা নিয়ে কি সামান্যতম সন্দেহ আছে? সেটি তারা নিজেরাও বুঝে। তাই সত্যের প্রচারে বাধা দেয়। পেশীশক্তিই তাদের মূল শক্তি।

আল্লাহতায়ালা বলেছেন,“বলুন,সত্য এসে গেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। আর মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ার জন্যই।”-(সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮১)।

তবে সে জন্য শর্ত্ব হলো সত্যকে প্রকাশ করা। আর এ দায়িত্বটা প্রতিটি সত্যপন্থির। শাহাদাতে হক্ব এজন্যই ইসলামে ফরয। বস্তুতঃ এ বই লেখা হয়েছে সে দায়িত্ববোধ থেকেই। আজ যারা জীবিত,শত বছর পর এদেশে তারা কেউই থাকবে না। কিন্তু থাকবে আজকের লেখা বই। নতুন প্রজন্মের

আদালতেও একাত্তরের রাজনীতি ও ঘটনাবলি নিয়ে বিচার বসবে। বিবেকের সে আদালতে শুধু ইসলাম-বিরোধীদের বই সাক্ষী দিলে বিচারের নামে আরেক অবিচার হবে। সেখানে ইসলামপন্থিদেরও বক্তব্য চাই। নইলে ইতিহাসের বিচারকেরা সেদিনও অবাক হবে আজকের ইসলামপন্থিদের নির্লিপ্ততা দেখে। তাদের মনেও প্রশ্ন জাগবে, একাত্তরে যাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করা হয়েছিল তাদের কি কিছুই বলার ছিল না? এ বই লেখা হয়েছে সে বিষয়টিকে সামনে রেখে। তাই এ বইয়ের কাঙ্খিত পাঠক নিছক আজকের প্রজন্ম নয়, বরং শত বা বহুশত বছরের পরের নতুন প্রজন্মও। লক্ষ্য, তাদের আদালতেও সত্যকে তুলে ধরা।

আরো কথা হল, একাত্তর নিয়ে বলার বিষয় যেমন অনেক, তেমনি গবেষণার বিষয়ও অনেক। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প পরিসরে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর সুবিচার করা সম্ভব নয়। এটি একটি লাগাতর গবেষনার বিষয়। একাজ করতে গিয়ে ছয় মাসের মধ্যেই প্রয়োজন দেখা দিল দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার। আশা রইল অদূর ভবিষ্যতে আরো বর্ধিত কলেবরে ও আরো তথ্য দিয়ে তৃতীয় সংস্করণ বের করার।

সর্বশেষে মহান আল্লাহতায়ালার কাছে আকুল প্রার্থনা, তাঁর এ ক্ষুদ্র বান্দাহকে যেন আমৃত্যু নির্ভয়ে সত্য কথা বলার সামর্থ দিন। এবং সামর্থ দেন, মিথ্যা থেকে বাঁচার। তাওফিক দিন, যেন এ দুনিয়া থেকে জান্নাতের যোগ্য হয়ে বিদায় নিতে পারি। সর্বোপরি রাব্বুল আ'লামীনের কাছে আকুতি, তিনি যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন। পাঠকদের থেকেও এ দোয়াই চাই। আল্লাহতায়ালা তাঁর সকল বান্দাহদের সামর্থ দিন সত্যকে বুঝার।

প্রথম প্রকাশঃ ২৪/০৪/২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১২/১০/২০০৮

সূচী পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১: ইতিহাসের নামে মিথ্যাচার ১

অধ্যায় ২: সত্য যেভাবে মারা পড়েছে ৭

অধ্যায় ৩: ইতিহাস ভরপুর পক্ষপাতদুষ্টতায় ১৭

অধ্যায় ৪: পাকিস্তানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীরা? ২৯

অধ্যায় ৫: পাকিস্তানের সৃষ্টিতে বেশী লাভবান হয়েছিল বাঙালী মুসলমান ৩৯

অধ্যায় ৬: পাকিস্তানপন্থিদের আত্মঘাতি ভূমিকা ৪৬

অধ্যায় ৭: পাকিস্তানের ঘরের শত্রু ৫৪

অধ্যায় ৮: যে গাদ্দারী দ্বি- জাতি তত্ত্বের সাথে ৬০

অধ্যায় ৯: ভারতীয় গুপ্তচরসংস্থা র' এবং মার্কিনী সিআইয়ের ভূমিকা ৬৬

অধ্যায় ১০: জেনেবুঝে রক্তপাতের পথ বেছে নেওয়া হয় ৭৪

অধ্যায় ১১: রক্তপাত হয়েছে তিনটি পর্যায়ে ৮৪

অধ্যায় ১২: মিথ্যাচারে রেকর্ড ৯০

অধ্যায় ১৩: ইতিহাসে যে বীভৎসতার উল্লেখ নেই ৯৫

অধ্যায় ১৪: একাত্তরে মুক্তি বাহিনীর প্রকৃত সফলতা কতটুক? ১০০

অধ্যায় ১৫: পাকিস্তানের সমর্থনের অর্থ কি জালেমের সমর্থন? ১০৭

অধ্যায় ১৬: পাকিস্তানপন্থিগণ কি স্বাধীনতার বিপক্ষ- শক্তি? ১১২

অধ্যায় ১৭: ভারতপন্থিরা কি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি? ১১৯

অধ্যায় ১৮: যে ইতিহাস আত্মবিনাশের ১২৫

অধ্যায় ১৯: যে ইতিহাস আত্মঘাতি বুদ্ধিবৃত্তির ১৪৯

অধ্যায় ২০: আসল রূপে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ ১৭২

অধ্যায় ২১: যে আত্মঘাত শুরু হয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ১৮৬

অধ্যায় ২২: তীব্রতা পায় ইসলামের বিরুদ্ধে অসহনশীলতা ১৯৩

অধ্যায় ২৩: বাংলাদেশী পত্রিকায় মুজিব আমল ১৯৮

অধ্যায় ২৪: বিদেশী পত্র- পত্রিকায় শেখ মুজিব ২০৫

উপসংহারঃ যে লড়াই হতে হবে বিরামহীন ২২১

অধ্যায় ১: ইতিহাসের নামে মিথ্যাচার

বাংলাদেশে একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে প্রচুর মিথ্যাচার হয়েছে। বিকৃত হয়েছে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক। লেখা হয়েছে অসত্যে ভরপুর অসংখ্য গ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস ও নাটক। নির্মিত হয়েছে বহু ছায়াছবি। এখনও সে বিকৃত ইতিহাস রচনার কাজ চলছে জোরেসোরে। এ পরিকল্পিত মিথ্যাচারের লক্ষ্য একটিই। আর তাহলো, দেশ- বিদেশের মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থেকে সত্যকে আড়াল করা। এবং যারা একাত্তরের লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছে তাদের কৃত অপরাধগুলো লুকিয়ে নিজেদেরকে ফেরেশতাতুল্য রূপে জাহির করা। সে সাথে বিরোধী পক্ষকে দানব রূপে চিত্রিত করা। যারা দেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত করলো, গণতন্ত্রকে পাঠালো নির্বাসনে এবং মানুষকে পাঠালো ডাষ্টবিনের পাশে কুকুরের সাথে উচ্ছিষ্ঠ খোঁজের লড়াইয়ে তাদেরকে আজ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বলা হচ্ছে বস্তুত সে পরিকল্পনারই অংশ রূপে। এ মিথ্যাচারের আরেক বড় লক্ষ্য,একাত্তরে বাংলার মুসলামানদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী বিভক্তি সৃষ্টি হল, সেটিকে স্থায়ী রূপ দেয়া। বিভক্তিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্যই পরিকল্পিত ভাবে ঘৃণা ছড়ানো হচেছ। এ লক্ষ্যে একাত্তরে দালাল শব্দটির মত অতি বিষপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। যারাই একাত্তরে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাদেরকেই দালাল বলে তীব্র ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। এমন ঘৃণা ছড়ানোর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। তাছিল পাকিস্তানপন্থিদের বিরুদ্ধেকৃত অপরাধগুলোকে জায়েজ করা। আর সে লক্ষ্যে সফলও হয়েছে।

ফলে তাদেরকে চাকুরিচ্যুৎ করা, তাদের ঘরবাড়ি ও দোকান- পাঠ দখল করা, হ্যাইজাক করে মুক্তিপণ আদায় করা, কারারুদ্ধ করা, নাগরিত্ব হরণ করা, এমন কি হত্যা করা ও হত্যার পর লাশগুলোকে কবর না দিয়ে পচিয়ে ফেলাও সমাজে গ্রহনযোগ্য হয়েছে। এটিই ছিল একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যবোধ। বৃটিশ শাসনামলে হাজার হাজার মানুষ উপনিবেশিক শাসকদের কর্মচারী রূপে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের উপর অনেক জুলুম করেছেন। পুলিশের চাকুরি করতে গিয়ে অনেকে এদেশবাসীর উপর গুলিও চালিয়েছে। অনেকে বৃটিশের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে। কিন্তু ৪৭ এর পর কি কাউকে দালাল বলা হয়েছে? তাদেরকে কি জেলে ঢুকানো

হয়েছে? কারো কি নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সবাইকে বরং আবার গুরুত্বপূর্ণ পদে একই বিভাগে বসানো হয়েছে। এটি যেমন পাকিস্তানে হয়েছে তেমনি ভারতেও হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্শাল পেত্যাঁ জার্মান নাৎসীদের সহায়তায় ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে ভিশিতে এক সরকার গঠন করেছিলেন তাঁকেও বিজেতা জেনারেল দ্যাগল এ অপরাধে হত্যা করেননি। তার বিচার হয়েছিল। বিচারে তাকে জেল দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাদক্ষ হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে পরে মুক্তি দেয়া হয়। এবং মৃত্যুর পর তাঁকে বীরের মর্যাদা দেয়া হয়। - (ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে ফজলুল কাদের চৌধুরি, আব্দুস সবুর খান,শাহ আজিজুর রহমান, নূরুল আমীন, ডাঃ আব্দুল মালেক (যিনি ৭১- এ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন) এবং আরো অনেক পাকিস্তানপন্থি নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনে ১৯৪৭- এর পূর্বে ও পরে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন অথচ তাদেরকে দালাল ও খুনি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ফজলুল কাদের চৌধুরি, আব্দুস সবুর খান, খাজা খয়ের উদ্দিন নাকি হুকুম দিয়ে মানুষ খুণ করিয়েছেন। ডাঃ আব্দুল মালেকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়। অথচ এ অভিযোগগুলির কোনটিই প্রমাণিত হয়নি। মুজিব আমলে নয়, পরেও নয়। অথচ আওয়ামী বাকশালী চক্র আজও এ নিরেট মিথ্যাগুলো জোরেশোরে রটনা করে নিছক ঘৃণা সৃষ্টির লক্ষ্যে। এমন ইতিহাস রচনার লক্ষ্য দেশের কল্যাণ নয়, সত্যকে তুলে ধরাও নয় বরং এখানে প্রাধান্য পেয়েছে কিছু বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ দলের ইমেজকে বড় করে দেখানো। এবং বিরোধীদের যতটা সম্ভব কুৎসিত রূপে দেখানো। এভাবে দেশের মধ্যে সংঘাতের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা।

নানা প্রেক্ষাপটে প্রতিদেশেই বিভক্তি দেখা দেয়। সে বিভক্তি নিয়ে প্রকান্ড রক্তপাতও হয়। নবীজীর (সাঃ) আমলে আরবের মানুষ বিভক্ত হয়েছিল মুসলমান ও কাফের এদুটি শিবিরে। কিন্তু সে বিভক্তি বেশি দিন টেকেনি। সে বিভক্তি বিলুপ্ত না হলে মুসলমানগণ কি বিশ্বশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো? জার্মানরা বিভক্ত হয়েছিল নাজি ও নাজিবিরোধী এ দুই দলে। সে বিভক্তিও বেশীদিন টেকেনি। তা বিলুপ্ত না হলে জার্মানরা আজ ইউরোপের প্রধানতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হতে পারতো?

বিভক্তি দেখা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। সে বিভক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে আব্রাহাম লিংকনের আমলে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর মাঝে প্রকান্ড গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ তাতে নিহতও হয়েছিল। কিন্তু সে বিভক্তি বেশী দিন টেকেনি। সেটি বিলুপ্ত না হলে দক্ষিণ আমেরিকার মত উত্তর আমেরিকাতেও উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়ার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রের জন্ম হত। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ যেভাবে এক নাম্বার বিশ্বশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে তা কি তখন সম্ভব হত? পারতো কি পৃথিবী জুড়ে প্রভাব সৃষ্টি করতে? আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মসম্মান ও সভ্যতার নির্মাণ ঘটে তো একতার পথ ধরেই। বিভক্তির মধ্য দিয়ে আসে আত্মহনন, আত্মগ্লানি ও চরম অপমান। বাংলাদেশ আজ সে বিভক্তির পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছে। একটি দেশের জন্য এর চেয়ে বড় আত্মঘাত আর কি হতে পারে? একতার গুরুত্ব শুধু বিবেকবান মানুষই নয়, পশুপাখিও বোঝে। তাই তারাও দল বেঁধে চলে। একতা গড়া ইসলামে ফরয এবং বিভক্তি গড়ার প্রতিটি প্রচেষ্টাই হল হারাম। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে একতার পথে চলা ও না- চলার বিষয়টি ব্যক্তির খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। অলংঘনীয় নির্দেশ এসেছে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে। পবিত্র কোরআনে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন,

"ওয়া তাছিমু বিহাব্লিল্লাহে জামিয়াঁও ওয়ালাতাফাররাকু"

অর্থ: এবং তোমরা আল্লাহর রশি (আল্লাহর দ্বীন তথা পবিত্র কোরআন বা ইসলামকে) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়োনা..।- (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৩)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা শুধু যে একতাবদ্ধ হতে বলেছেন তা নয়, কিসের ভিত্তিতে একতা গড়তে হবে সেটিও বলে দিয়েছেন। সে একতা ভাষা, ভূগোল ও বর্ণভিত্তিক হবে না, হবে আল্লাহর রশি তথা ইসলাম বা কোরআন ভিত্তিক। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে কোরআনকে বা ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে, ভাষা, বর্ণ ও ভুগোলকে নয়। আল্লাহতা।য়ালা যেমন একতাবদ্ধ হতে বলেছেন তেমনি পরস্পরে বিভক্ত না হওয়ার বিরুদ্ধেও সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই তো অলঙ্ঘনীয়। ফলে একতা প্রতিষ্ঠার প্রতিটি প্রয়াস যেমন আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদত, তেমনি বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার প্রতিটি প্রয়াসই হলো বিদ্রোহ। দেশের রাজা বা বিচারকের বিরুদ্ধে যে কোন বিদ্রোহ

শাস্তি অনিবার্য করে তোলে। মহান আল্লাহর এ হুকুমের অবাধ্যতা কি রহমত বয়ে আনে? এটি তো গুরুতর বিদ্রোহ। এমন বিদ্রোহ যে আযাব ডেকে আনে তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? বাংলাদেশে সে অবাধ্যতা চলছে নানা ভাবে।

আল্লাহর অবাধ্যতা শুধু এ নয় যে জনগণের অর্থে ও সমর্থনে দেশে সূদী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বা রাষ্ট্রীয় অর্থে বেশ্যাবৃত্তি বা জ্বিনা পাহারাদারি পাচ্ছে বা আইন- আদালত থেকে আল্লাহতায়ালার আইনকে সরিয়ে ব্রিটিশ ফৌজদারি বিধি (পেনাল কোড) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বরং আল্লাহর বিরুদ্ধে বড় বিদ্রোহ ঘটেছে ভাষা,বর্ণ ও পৃথক ভূগোলের নামে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি গড়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানেরা ভাষা ও বর্ণকে নয়, ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছিল। বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি, গুজরাটি এরূপ নানা ভাষার মুসলমানগণ ভাষার পরিচয় নিয়ে নয়, ঈমানী পরিচয় নিয়ে একাতাবদ্ধ হয়েছিল। তারা সেদিন ভুলে গিয়েছিল তাদের ধর্মীয় ফেরকা ও মাজহাবী বিরোধ। উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে এটি অনন্য। পবিত্র কোরআনে মুসলমানদের বলা হয়েছে হিজবুল্লাহ বা আল্লাহর দল। এটি কি ভাবা যায়,আল্লাহতায়ালা তাঁর নিজের বাহিনীতে অনৈক্য চাইবেন? এবং সেটি ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক স্বার্থের নামে? মুসলিম উম্মাহর একতা ও বিজয়ের চেয়ে এগুলি কি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? আল্লাহতায়ালা তাঁর বাহিনীতে একতার যে কোন উদ্যোগে যে খুশি হবেন সেটিই তো স্বাভাবিক। উমহাদেশের মুসলমানদের সে একতা আল্লাহতায়ালাকে এতই খুশি করেছিল যে তাদের প্রতি তাঁর বিশাল রহমত জুটেছিল। ফলে বিজয়ও এসেছিল। এ রহমতের কারণেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করতে কোন যুদ্ধ লড়তে হয়নি। অস্ত্র না ধরেই বিশাল শত্রুপক্ষকে সেদিন তারা পরাজিত করতে পেরেছিল।

ইসলামের শত্রুপক্ষের কাছে তাদের ১৯৪৭ এর পরাজয় যেমন কাম্য ছিল না, তেমনি সহনীয়ও ছিল না। তারা তো মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করতে ব্যস্ত। ফলে তাদের চোখের সামনে পাকিস্তানের ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটবে সেটি অসহ্য ছিল। ফলে জন্ম থেকেই পাকিস্তান ইসলামবিরোধী আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের টার্গেটে পারিণত হয়। আরবদেরকে এরাই বিশেরও বেশী টুকরায় বিভক্ত রেখেছে। নব্যসৃষ্ট এসব দেশের প্রতিটিতে এমন সব তাঁবেদারকে তারা বসিয়েছে যাদের কাছে এ

বিভক্ত ভূগোল ভেঙ্গে এক অখন্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে কোন প্রয়াসই হলো চরম ফৌজদারি অপরাধ। ১৪ কোটি মানুষের বাংলাদেশও একই কারণে শত্রুশক্তির অন্যতম টার্গেট। বিশেষ করে ভারতের। ভারতের পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের ন্যায় আরেক শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে তারা মেনে নেবে না,তাদের এ ঘোষণা সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের মানুষ আল্লাহর দেওয়া শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করুক সেটিও তারা মানতে রাজী নয়। তারা আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হোক ও তার আইনের অনুসারি হোক এতেও তাদের আপত্তি। ইসলামের এ অতি সনাতন রূপকে তারা মৌলবাদ বলে। এজন্যই বাংলাদেশের অখন্ড ভূগোল যেমন টার্গেট তেমনি টার্গেট হলো একতাবদ্ধ জনগণও। যে কারণে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচন্ড আগ্রহ ছিল তেমনি আগ্রহ বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করায়ও। এজন্যই ১৯৭১ এ বিজয়ের পর পরই শুরু হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক লুণ্ঠন প্রক্রিয়া। তাদের হাতে পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া অস্ত্রসামগ্রীই শুধু লুট হয়নি। লুট হয়েছে অফিস- আদালত ও কলকারখানার বহু হাজার কোটি টাকার মালামাল। তাদের কাছে পাকিস্তান ভাঙ্গাটি ছিল প্রথম পর্ব মাত্র, শেষ পর্ব নয়। ভূগোল ভাঙ্গার লক্ষ্যে ভারতীয় সরকার ও পুলিশের সামনে পশ্চিম বাংলার মাটিতে প্রতিপালিত হচ্ছে "স্বাধীন বঙ্গভূমি" প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল এসব প্রাক্তন বৃহত্তর জেলাগুলোকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করে এরা স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্র গড়তে চায়। এদের নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার এক কালে আওয়ামী লীগের টিকেটে সংসদ সদস্য ছিলেন। জনগণকে বিভক্ত রাখার স্বার্থে এদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিভেদের সূত্রগুলো খুঁজে বের করা। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে একাত্তরের বিবাদ। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ চাইলে কি হবে,একাত্তরের ঘটে যাওয়া বিবাদ ও বিভক্তির সে দহন বেদনা থেকে বাংলাদেশের জনগণের মূক্তি নেই। বরং সে বিভক্তিকে আরো বিষাক্ত করে তারা আরেকটি গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চায়। তাই স্বাধীনতার পক্ষ- বিপক্ষের বিতর্ক শেষ হবার নয়। বরং এ বিভেদ স্থায়ী রাখতে ভারত ও তাঁর তাবেদার পক্ষ অবিরাম পেট্রোল ঢালতেই থাকবে। ভারতের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র পক্ষ। ইসলামের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এরা সবাই মিলে গড়ে তুলেছে গ্লোবাল কোয়ালিশন। ইসলামকে এরা সবাই প্রতিপক্ষ শক্তি রূপে দেখে। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মুসলমান যে মুসলিম উম্মাহর অংশ সে বিষয়টি বহু

মুসলিম ভুলে গেলেও তারা ভূলতে রাজি নয়। ফলে যে লক্ষ্যে আরবদের বিভক্ত রেখেছে সেই একই লক্ষ্যে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকেও তারা বিভক্ত রাখতে চায়। সে বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিণিয়োগ শত শত কোটি টাকা। বিপুল বিণিয়োগে নেমেছে ভারত সরকারও। তবে শিল্পখাতে নয়। অর্থনীতির অন্য খাতেও নয়। বিণিয়োগ হচ্ছে দেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা- কর্মী এবং এনজিও পরিচালকদের উপর।

স্বাধীনতার রক্ষা প্রতিদেশের জন্যই অতি ব্যয়বহুল। পাকিস্তানের মত বহুদেশের জাতীয় বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ খরচ হয়ে যায় প্রতিরক্ষা খাতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো সে ব্যয়ভারে ভেঙ্গেই গেল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনি দেশও হিমশিম খাচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এ দেশটি সে ব্যয়ভার কমাতে পার্টনার খুঁজছে। যে কোন ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন অসম্ভব। মাথাপিছু আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও সে সামর্থ কুয়েত,কাতার,আমিরাত বা সৌদিআরবের নেই। অবশ্য স্বাধীন থাকাটা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি মর্যাদাপূর্ণও। স্বাধীন ভাবে বাঁচার আনন্দটাই আলাদা। এজন্যই মর্যাদাশীল জাতি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ দিয়ে হলেও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। আর স্বাধীন থাকার জন্য শুধু একখানি পতাকা, একটুকরা ভূমি, একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হলেই চলে না। স্বাধীনতা রক্ষার সামর্থও থাকা চাই। ১৯৪৭ এ বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তানভূক্ত হওয়ার মূল গরজ তো ছিল এটিই। সে কালের বাংলার মুসলিম নেতাগণ যে কতটা বিচক্ষণ ও দুরদৃষ্টির অধিকারি ছিলেন এ হল তার প্রমাণ। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত স্বাধীন হওয়া, সিকিম, ভুটান বা ২৫ বছরের দাসচুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ হওয়া নয়, যেমনটি শেখ মুজিব করেছিলেন। ২৫ বছর চুক্তির মধ্য দিয়ে মুজিব ভারতকে যে কোন সময় বাংলাদেশে সৈন্য অনুপ্রবেশসহ সামরিক হস্তক্ষেপের অধিকার দিয়েছিল। স্বাধীনতার হেফাজতে ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দুই- দুইটি যুদ্ধ লড়েছে। আণবিক শক্তিধারি এ দেশটি এখনও তেমন লড়াইয়ে প্রস্তুত। কিন্তু সে সামর্থ কি বাংলাদেশের আছে? আর না থাকলে স্বাধীনতাই বা থাকে কতটুকু? স্বাধীনতার সুরক্ষায় অক্ষমতাই কি পরাধীনতা নয়? স্বাধীনতা রক্ষায় শুধু লোকবলই যথার্থ নয়, অর্থবল, অস্ত্রবল এবং ভূগোলের বলও চাই। আজকের ইউরোপের দেশগুলো

একতাবদ্ধ ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্ম দিচ্ছে নিজেদের সে সীমিত সামর্থের কথা ভেবেই।

অধ্যায় ২: সত্য যেভাবে মারা পড়েছে

এ নিয়ে সন্দেহ নেই যে একাত্তরের লড়াইয়ে বিস্তর রক্তক্ষয় হয়েছে,কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস রচনাকারিদের হাতে যেটি মারা গেছে সেটি হল সত্য ও ন্যায়বিচার। একাত্তরের লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা। বিজয়ের পর তারা শুধু দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনই দখলে নেয়নি,দখলে নিয়েছে ইতিহাস রচনার ন্যায় এ্যাকাডিমিক বিষয়ও। আওয়ামী শাসনামলে সরকারি অর্থে সরাকরি লোকদের লাগানো হয়েছিল ইতিহাস রচনার কাজে। ফলে যা রচনা হয়েছে তার অনেকটাই আর নিরেপক্ষ ইতিহাস থাকেনি। খুঁটিনাটি বিষয় দুরে থাক, তাদের পেশ করা প্রধান প্রধান তথ্যগুলো যে কতটা অসত্য সে প্রমাণ কি কম? লেখা হয়েছে,পাক- বাহিনী একাত্তরে তিরিশ লাখ বাঙ্গালীকে হত্যা করেছিল। হুশজ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনা আছে এমন ব্যক্তিকে দিয়ে এ তথ্য কি বিশ্বাস করানো যায়? তিরিশ লাখের অর্থ তিন মিলিয়ন। সে সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি অর্থাৎ ৭৫ মিলিয়ন। যে কোন স্কুল ছাত্রও হিসাব করে বের করতে পারে, তিরিশ লাখ মানুষের মৃত্যু হলে প্রতি ২৫ জনে মারা যেতে হয় একজনকে। যে গ্রামে ১ হাজার মানুষের বাস সে গ্রামে মারা যেতে হয় ৪০ জনকে। ঘটনাক্রমে সে গ্রামে কেউ মারা না গেলে পরবর্তী গ্রামটি যদি হয় ১ হাজার মানুষের তবে সেখান থেকে মারা যেতে হবে ৮০ জনকে। যে থানায় ১ লাখ মানুষের বাস সেখানে মারা যেতে হবে ৪ হাজার মানুষকে।

প্রতি থানায় ও প্রতি গ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা এ হারে না হলে ৩০ লাখের সংখ্যা পূরণ হবে না। তাই এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? সে সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাক- বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ হাজার। ৭০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের পক্ষে কি সম্ভব ছিল বিল- হাওর, নদীনালা, দ্বীপ ও চরাভূমিতে পরিপূর্ণ একটি দেশের প্রায় ৭০ হাজার গ্রামে পৌছানো? গ্রাম দূরে থাক প্রতিটি ইউনিয়নেও কি তারা যেতে পেরেছিল? প্রতিটি গ্রামে ও ইউনিয়নে

গেলে সীমান্তে যুদ্ধ করলো কারা? কারা পাহারা দিল দেশের বিমান বন্দর, নদীবন্দর, সবগুলো জেলা- শহর ও রাজধানী? ৩০ লাখ মানুষের নিহত হওয়ার এ তথ্য বিশ্বের দরবারে গ্রহণযোগ্য করা দূরে থাক, বিশ্বাসযোগ্য করতে পারেনি তাদের পার্টনার ভারতীয়দের কাছেও । যুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতীয় জেনারেলদের কাছে এটি এক হাস্যকর মিথ্যা। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় সে অভিমত একবার নয়, বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু জেনেবুঝে মিথা রটনা করাকে যারা রাজনীতির মূল হাতিয়ার মনে করে তাদেরকে কি সত্য গেলানো যায়? অথচ ইসলামে অতি জঘন্য হল মিথ্যা। এ পাপ মহা অভিসম্পাত ডেকে আনে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

"তাদের উপর সেদিন (রোজ হাশরের বিচার দিনে) অভিসম্পাত যারা মিথ্যা বলে।–(সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত ১০)

আর যে ব্যক্তি নিজের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ডেকে আনে তাকে আর কে রক্ষা করতে পারে? তার জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে কঠিন আযাবের ঘোষনা এসেছে এভাবেঃ

অতঃপর নিশ্চয়ই তাদেরকে জাহান্নামের আগুণে জ্বালানো হবে।- (সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত ১৬)
পবিত্র কোরআনে একথাও একাধিক বার বলা হয়েছেঃ "ফাসিরু ফিল আরদি,ফানজির কাইফা কানা আকিবাতুল মোকাযিযিবীন"।

অর্থঃ "অতঃপর ভ্রমন কর জমিনের উপর এবং দেখ,মিথ্যুকদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে"।

মানব ইতিহাসের অতি মিথ্যুক ছিল ফিরাউন, নমরুদ এবং আদ- ও সামুদ জাতি এবং নুহ (আঃ)- এর কাওমের লোকেরা। তারা মনগড়া মিথ্যা বলত। সে মিথ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করত এবং সত্যের বিজয়কে রুখত। তাদের সে মিথ্যাচারই দুনিয়াতে তাদের উপর কঠিন আযাব ডেকে এনেছিল । আর আখেরাতেও অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

যুদ্ধবিগ্রহে কত জন মারা গেল সে পরিসংখ্যান কোন সরকারই হঠাৎ দিতে পারে না। বহু মাস এমনকি বহু বছর লাগে সে পরিসংখ্যান বের করতে। অথচ শেখ মুজিবের সে সময় লাগেনি। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি চোখের পলক পড়ার আগেই পাক- বাহিনীর হাতে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে- গঞ্জে ও নগর- বন্দরে কতজন মারা গেছে তার একটা হিসাব দিয়ে দিয়েছিলেন। মিথ্যা ভাষণে পরিসংখ্যান লাগে না,বছরের পর বছর মাঠঘাট ও গ্রামগঞ্জ খুঁজে তথ্যও সংগ্রহ করা লাগে না। বরং সেটি রচিত হয় মিথ্যুকের জ্বিহবাতে,খেয়াল খুশি মতো। নিখুত পরিসংখ্যানের গরজতো তাদেরই যারা সত্য বলায় অভ্যস্থ,সে সাথে মিথ্যা পরিহারেও সতর্ক। যারা স্বাধীনতার লক্ষ্যে রক্তদান যে কোন জাতির জন্য গর্বের। কিন্তু রক্তদানের নামে মিথ্যাচার হলে তাতে ইজ্জত বাড়ে না,বাড়ে অপমান। মুজিব সেটিই বাড়িয়েছেন। গর্ব বাড়ানোর তাগিদে শেখ মুজিব সেদিন তার স্বভাবসুলভ অভ্যাসটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ফলে মুখে যা এসেছে তাই বলেছেন। সেটি যে বিশ্বাসযোগ্য নয় সেটিও তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। সম্ভবতঃ তার বিশ্বাস ছিল, পাকবাহিনী এখন পরাজিত, দেশবাসিও তার অনুগত, ফলে তিরিশ লাখ বা ষাট লাখের কথা বললেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস ক'জনের? তখন কেউ প্রতিবাদ করেনি ঠিকই কিন্তু এতে তার চরিত্র যে নীরবে মারা গেল সে হুশ কি তার ছিল? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তিনি চিহ্নিত হয়ে গেলেন মিথ্যুক রূপে। বহু হাজার বছর পরও প্রশ্ন উঠবে কারা, কবে, কিভাবে এবং কতদিনে এ গণনার কাজটি সমাধা করে? হাজার বছরের অসত্য চর্চার নায়কগণ ইতিহাসে এভাবেই বিবস্ত্র হয়। ইসলামের অতি জ্ঞানী হযরত আলী (রাঃ) "ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার জিহ্বাতে" বলে বস্তুতঃ সেটিই বুঝাতে চেয়েছেন।

মানুষ তার আসল রূপকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে পারে না। দমকা ঝড়ো হাওয়ায় মুখের পর্দা যেমন সরে যায়,তেমনি কর্মের মধ্য দিয়ে ভন্ডের মুখোশও সরে যায়। মুজিবের সে মুখোশ সরে গেছে বার বার। প্রাকৃতিক দূর্যোগে বা যুদ্ধে নরনারী দূরে থাক গবাদী পশু মারা গেলেও সভ্য দেশে একটি শুমারি হয়, ক্ষয়ক্ষতিরও পরিমাপ হয়। অথচ একাত্তরের যুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গেল সে পরিসংখ্যান তিনি নেননি। অসংখ্য মানুষ যেমন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে মারা গেছে,তেমনি মারা গেছে মুক্তি বাহিনীর হাতে। হাজার হাজার বিহারি যেমন মারা গেছে, তেমনি মারা গেছে হিন্দুও।লুটতরাজ

ও দেশত্যাগের মুখে পড়েছে যেমন বহু লক্ষ হিন্দু,তেমনি লুটতরাজ ও নিজ ঘর থেকে বহিস্কারের মুখে পড়েছে বহু লক্ষ অবাঙালী। কোন দেশে যুদ্ধ শুরু হলে সে যুদ্ধ কোন পক্ষকেই ছাড়ে না।অথচ আওয়ামী বাকশালী পক্ষ শুধু নিজ পক্ষের ক্ষয়- ক্ষতিটাকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছে।অন্য পক্ষের ব্যথা-বেদনা ও ক্ষয়ক্ষতি সামান্যতম ধর্তব্যের মধ্যেও আনেনি।কোন পক্ষে কতজন মারা গেল এবং কাদের হাতে মারা গেল - জাতির জন্য সেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিবারের প্রতি সদস্যই জানতে চায় তার আপনজন কিভাবে মারা গেল এবং কে হত্যাকারি। বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিব ও তার দলীয় নেতাদের প্রচন্ড গুণকীর্তন থাকলেও অতি প্রয়োজনীয় সে তথ্যটিই নেই। ফলে অজানাই রয়ে গেল সে তথ্যগুলো। জাতির তথ্যভান্ডার এক্ষেত্রে শূণ্য। অথচ এ তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল সরকারের। কোন দেশপ্রেমিক সরকার কি এতটা দায়িত্বহীন হতে পারে? কথা হল, জনবহুল দেশে গণনাকারিরও কি অভাব ছিল? বস্তুত যেটির অভাব ছিল সেটি মুজিব সরকারের সদিচ্ছার।

ইরাকের উপর হামলায় মার্কিন বাহিনী কতজন ইরাকীকে হত্যা করেছে সে হিসাব তারা নেয়নি। মশা- মাছি মারলে যেমন তার গণনা হয় না,তেমনি গণনা হয়নি নিহত ইরাকীদেরও। ইরাকীদের মার্কিনীরা যে কতটা তুচ্ছ ভাবতো এবং তাদের সাথে তাদের আচরণ যে কতটা বিবেকহীন ছিল এ হল তার প্রমাণ। প্রশ্ন হলো,এ ক্ষেত্রে মৃত বাংলাদেশীদের সাথে মুজিবের আচরণও কি ভিন্নতর ছিল? ফলে বাংলাদেশের মানুষের বড় দুঃখ শুধু এ নয় যে,যুদ্ধে তারা আপনজনদের হারিয়েছে। বরং বড় দুঃখ,তাদের মৃত আপনজনেরা সরকারের কাছে কোন গুরুত্বই পেল না। কোথায় কিভাবে এবং কাদের হাতে তারা মারা গেল সে হিসাবটিও হল না। কোন রেজিস্টারে বা নথিপত্রে তাদের কোন নাম নিশানাও থাকল না। গদীদখল ছাড়া আর সব কিছুই যে শেখ মুজিব ও তার দলের কাছে গুরুত্বহীন ছিল এটি হল তার প্রমাণ। বাংলাদেশের আওয়ামী স্যেকুলার পক্ষটি এতই বিবেকশূণ্য যে বিশ্ববাসী হাসলে কি হবে তারা তাদের নেতার উচ্চারিত মিথ্যাটিকে, কোন রূপ সত্যাসত্য বিচার না করেই অবিরাম আওড়িয়ে যাচ্ছে। পত্র- পত্রিকা ও বই- পুস্তকে সেটি উল্লেখও করছে। অথচ নবীজীর ভাষায় মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে অপরের শোনা কথা বিচার না করেই বলে বেড়াবে। বাংলাদেশে সে মিথ্যাচর্চাই ব্যাপক ভাবে হচ্ছে। শেখ মুজিব যেমন গণনা না

করে মুখে যা এসেছে তাই জনসম্মুখে বলেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার সে মিথ্যা কথাটি নানা জন থেকে শুনে বা কিতাবে পড়ে সত্যাসত্য বিচার না করে জনসম্মুখে রটনা করে বেড়াচ্ছে। বিবেকশুণ্যরা নেতা হলে জাতির অন্যান্যরাও যে কতটা বিবেকশূণ্য হয় এ হল তার নমুনা। ফেরাউন শূধু একাই তার রাজ্যে বিবেকশূণ্য ও মিথ্যাচারি ছিল না। সে বিবেকশূণ্য ও মিথ্যাচারি করেছিল মিশরবাসীকেও। তারাও তাকে খোদা মনে করত এবং ফিরাউনের সাথে বনি- ইসরাইলের লোকদের উৎসবভরে হত্যাকরত। হযরত মূসা (আঃ)ও তাঁর অনুসারিদের হত্যার জন্য সমুদ্র পর্যন্ত ধেয়ে গিয়েছিল। তাই বেঈমানকে হটানো এবং ঈমানদার ব্যক্তিকে নেতার আসনে বসানো এ জন্যই ইসলামে এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

নবীজী (সাঃ)র মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দাফন মুলতবী করে প্রথমে খলিফা নির্বাচনের কাজটি প্রথমে সমাধা করেছিলেন। নামাযে ইমাম নির্বাচনের চেয়ে একাজ গুরুত্বপূর্ণ। একাজ কখনও কোন রবীন্দ্র- ভক্ত, ইন্দিরাভক্ত ও কাফেরদের বিশ্বস্ত বন্ধুদের দিয়ে হয় না। তাকেঁ নিরেট ইসলামী হতে হয়। ইসলামে অঙ্গিকারহীন এমন নেতারা মুসলিম ভূমিতে আল্লাহতায়ালার রহমত এনেছেন সে নজির নেই।বরং তাদের কারনে ভয়াবহ আযাব নেমে আসে। যে আযাব কখনও আসে বন্যা ও জ্বলোচ্ছাস রূপে, কখনও দুর্ভিক্ষ রূপে, আবার কখনও বা আসে জগতজোড়া অপমানের মধ্য দিয়ে। শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে রটনা করা মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আসা উচিত ছিল দেশের বুদ্ধিজীবী ও এ্যাকাডেমিকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু তা হয়নি। বরং এসেছে আত্মসমর্পন। প্রতিবাদের সাহস নেই দেশের মেরুদন্ডহীন ও কান্ডজ্ঞানহীন বুদ্ধিজীবীদের। এদের কান্ডটি বরং আরো অদ্ভুদ ও হাস্যকর। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া এরা বরং মুজিবের রটনা করা মিথ্যাকে প্রমাণ করতে কলম ধরেছে,সেটিকে জনমনে বদ্ধমূল করতে বই লিখেছে, এমনকি গবেষণাও নেমেছে। একাজে তারা মুজিবের ন্যায়ই কট্টোর। মুজিব বিরোধীদের শায়েস্তা করতে তারা আদালতের বাইরে মেঠো আদালত বসিয়েছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। তাদেরও মন- মগজ যে কতটা বিষপুর্ণ ও প্রতিহিংসাপূর্ণ সেটি আদালতের নামে আয়োজিত জনসভায় পাঠ করা রায়ে বেরিয়ে এসেছে। দেশের আদালতের প্রতি পল্লীর নিরক্ষর ব্যক্তির যে বিশ্বাস থাকে সেটিও তারা দেখাতে পারেনি। আদালত থাকতে

এসব বুদ্ধিজীবীরা তাই নব্বইয়ের দশকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্দানে মেঠো আদালত বসিয়েছিল। এমন অদ্ভুদ ঘটনা কোন সভ্যদেশের ইতিহাসে আছে কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এককালে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গরা তাদের বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী নিগ্রো দাসদের বিরুদ্ধে ফাঁসীর আদেশ শুনানোর প্রয়োজনে এমন আদালত বসাতো। এমন আদালতকে বলা হত লিঞ্চ কোর্ট বা মেটো আদালত। এসব আদালতের কাজ হত তাদের পছন্দ মত রায় শুনিয়ে উৎসবভরে সেটি কার্যকর করা, বিচার করা নয়। সেটিই বাংলাদেশে সেকুলার বুদ্ধিজীবী রূপে যারা পরিচিত তাদের দ্বারা হয়েছে। আজ থেকে বহু শত বছর পর বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম যখন এসব বুদ্ধিজীবীদের কর্মকান্ডের ইতিহাস পড়বে, তারা শুধু অবাকই হবে না, লজ্জিতও হবে। এ ভেবে যে তাদের পূর্বপুরুষ বুদ্ধিজীবীগণ এতটাই বিবেকহীন, বিচারহীন ও প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিল। বিস্ময়ের পাশাপাশি তাদের প্রতি অবজ্ঞা এবং অবিশ্বাসও জন্মাবে। চেতনায় যারা এতটাই বিষপূর্ণ ও প্রতিহিংসাপূর্ণ তাদের কি ইতিহাসের ঘটনাবলির নিরপেক্ষ মূল্যায়নের সামর্থ থাকে? ফলে তাদের লেখা ইতিহাসের বই যে তারা আবর্জনায় ফেলবে তা নিয়েও কি সন্দেহ আছে?

হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ে সে হাদীসের বর্ণনাকারিকে জানতে হয়। বর্ণনাকারি অসত্য বা মিথ্যাভাষী প্রমাণিত হলে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় তার বর্ণীত হাদীস। অতীতে হাদীস সংগ্রহকারিগণ তাই বহুশ্রম, বহুঅর্থ ও বহু সময় ব্যয় করেছেন হাদীস বর্ণনাকারিদের চরিত্র বিচারে। তেমনি ইতিহাস রচনাকারির বেলায়। বাংলাদেশে তাই এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে ইতিহাস পাঠের আগে ইতিহাসের লেখকদের ইতিহাস জানার। ন্যায়নীতি ও বিবেকবোধ শত্রুর বিরুদ্ধেও মিথ্যা বলতে বাধা দেয়। সত্যবাদীতা মানুষের মৌলিক গুণ। এর অভাবে শুধু মনুষ্যত্বহানিই হয় না, ব্যক্তিত্বহানিও হয়। নবীজী (সাঃ) মিথ্যাচর্চাকে সকল পাপের জন্মদায়িনী মা বলেছেন। বুঝাতে চেয়েছেন, ব্যক্তির জীবনে মিথ্যাচর্চা শুরু হলে পাপের চর্চাও শুরু হয়। মিথ্যুকের জীবনে এ দুটো অপকর্ম এক সাথে চলে এবং মিথ্যা বন্ধ হলে পাপও বন্ধ হয়। পাপ অর্থই দূর্নীতি, এ দূর্নীতিতে সুনীতির পরিচর্যা বা প্রসার হয় না। বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূর্নীতি পরিচর্যা পায় এই রাজনৈতিক দূর্নীতি থেকেই। ফলে যখন কোন দেশে দূর্নীতিবাজ শাসকের করায়ত্ব হয় সেখানে দূর্নীতি বাড়ে তীব্র গতিতে। দূর্নীতিতে বাংলাদেশ আজ

যে সারা বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের মধ্যে ৫ বার প্রথম হয়েছে সেটি একদিনে হয়নি। হয়েছে বহু কাল ব্যাপী রাজনীতি এ দূর্নীতিবাজদের হাতে থাকায়। এদের কারণে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি মহলে আর কোন কাজই দূর্নীতির মত এতটা ব্যাপক ভাবে হয়নি। আর এ মিথ্যা চর্চার আসল গুরু হল দেশের রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। দেশকে আজও বিভক্ত রাখার মুল গুরুও তারা।

শেখ মুজিব বিশ টাকা মণ দরে চাল খাওয়ানোর নাম করে ৭০এর নির্বাচনে ভোট নিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতায় এসে ৫০০ টাকা মণ দরে খাইয়েছেন। ভোট নিয়েছেন গণতন্ত্রের কথা বলে, অথচ ক্ষমতায় এসে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করেছেন। কায়েম করেছেন একদলীয় বাকশালী শাসন। বাকস্বাধীনতার কথা বলেছেন,কিন্তু সকল বিরোধী পত্র- পত্রিকাকে নিষিদ্ধ করেছেন। শেখ মুজিব আইনের শাসনের কথা বলেছেন অথচ বিনাবিচারে বামপন্থি নেতা সিরাজ সিকদারকে রক্ষিবাহিনী দিয়ে হত্যা করিয়ে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছেন, “কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?” বাংলাদেশের ইতিহাসে এই হল সরকারি ভাবে প্রথম বিচার-বহিঃর্ভূত হত্যা- যার ঘোষণা দিলেন খোদ শেখ মুজিব। যদিও আওয়ামী-বাকশালী ক্যাডারদের হাতে মাঠেময়দানে হাজার হাজার হত্যাকান্ড ঘটেছে,তবে সেগুলো ঘটেছে বেসরকারিভাবে। শেখ মুজিবের শত শত মিথ্যা ওয়াদার রাজনীতির এ হল কয়েকটি নজির। অথচ রাজনীতি থেকেই নির্ধারিত হয় দেশের অন্যান্য নীতি। মিথ্যাচর্চার চেয়ে বড় দূর্নীতি আর কি হতে পারে? রাজনীতি তাই মিথ্যানির্ভর তথা দূর্নীতিনির্ভর হলে দেশে ও প্রশাসনে দূর্নীতির প্লাবন শুরু হবে সেটিই কি স্বাভাবিক নয়? এ জন্যই বহু দেশে কোন মন্ত্রী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে সে শুধু মন্ত্রীত্বই হারায় না, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সামর্থও হারায়। মুসলিম দেশে এমন ব্যক্তি সরকার প্রধান বা আমিরুল মোমিনুন হওয়া দূরের কথা সাধারণ সরকারি কর্মচারি হওয়ার যোগ্যতাও রাখে কি? অথচ বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ব্যক্তিটি শত মিথ্যার জন্ম দিল তাকে জাতির পিতা করার উদ্যোগ হয়। কোন বিবেকবান জাতি কি সেটি মেনে নেয়? আদালত এমনকি নৃশংস খুনির বিরুদ্ধেও মিথ্যা বলার অধিকার দেয় না। কারণ আদালতে মিথ্যা বলা শুরু হলে মৃত্যু ঘটে ন্যায়- বিচারের। ফলে অসম্ভব হয়ে পড়ে ন্যায়- বিচার- নির্ভর সভ্যতর সমাজ- নির্মাণ। আর

ইতিহাস লেখার কাজ তো বিচারকের কাজ। বিচারক যেমন আদালতে বাদী-বিবাদীর উভয় পক্ষের কথা শোনেন তেমনি ইতিহাস লেখককেও দুই পক্ষের কথাই লিপিবদ্ধ করতে হয়। অথচ বাংলাদেশে সেটিই হয়নি। দেশে যারা ইসলামের পক্ষের শক্তি এবং যারা ১৯৭১য়ে বাংলাদেশের সৃষ্টির বিরোধীতা করল তাদের কোন কথাকেই ইতিহাসের বইয়ে স্থান দেওয়া হয়নি। এটা ঠিক, একাত্তরে তারা পরাজিত শক্তি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পরাজিতদেরও তো স্থান থাকে। নইলে সে ইতিহাস গ্রহণযোগ্য হয় কি করে? কারণ ইতিহাস তো কোন দলের নয়, কোন বিজিত পক্ষেরও নয়। এটি সর্বদলের ও সর্বজনের। নইলে সে ইতিহাস স্থান পায় আবর্জনার স্তুপে। যেমন ঘটে আদালতে মিথ্যা সাক্ষীর ভাগ্যে। বিপক্ষ পক্ষের লোকেরাও যে দেশপ্রেমিক নাগরিক, তাদের অভিমত এবং তাদের চিন্তাচেতনারও যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে সেটি তাদের রচিত ইতিহাসে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। বরং তাদের চিত্রিত করা হয়েছে ঘাতক ও গণদুষমন রূপে। অভিধান খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে ঘৃণাপূর্ণ শব্দগুলো তাদের চরিত্রহানীর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এভাবে জাতীয় জীবনে বিভক্তি ও রক্তঝরা ক্ষতগুলোকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে একাত্তরকে ঘিরে জাতি কার্যতঃ বিভক্ত হয়েছে দ্বি-জাতিতে। যেমনটি ছিল ১৯৪৭- পূর্ব ভারতে। এমন বিভক্তিতে একমাত্র শত্রুই খুশি হতে পারে। ফলে বাংলাদেশের এ অবস্থা দেখে ভারতের ন্যায় সুযোগ সন্ধানীদের এখন আনন্দে ডুগডুগি বাজানোর দিন। জাতির এ বিভক্ত অবস্থায় তাদের মদদপুষ্টরা তো শীঘ্র একটি রক্তাত্ব লড়াইয়েরও ডাক দিচ্ছে। ভাবছে এখনই তাদের মোক্ষম সময়। একাত্তরের প্রচন্ড রক্তক্ষয়ের পরও তারা যে তৃপ্ত হয়নি বরং আরো রক্ত চায়, এ হলো তার প্রমাণ। গণতন্ত্র উপহার দিতে না পারলে কি হবে, জাতীয় জীবনে এমন রক্তঝরা বিভক্তিই আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় অবদান। অথচ বিশ্বে অন্যদের ইতিহাস ভিন্নতর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু হাজার মানুষ নিহতও হয়েছিল। অথচ যুদ্ধশেষে বিরোধীপক্ষেরও জেনারেলদের বীরের মর্যাদা দিয়ে বরণ করা হয়েছিল। তাদেরকে হত্যা বা কারারুদ্ধ করা হয়নি। যুদ্ধাপরাধিও বলা হয়নি। বরং তাদের ছবি শ্রদ্ধাভরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাদুঘরে রাখা হয়েছে। আটলান্টা শহরের পাহাড়ের গায়ে তাদের ছবি খোদাই করে চিরভাস্বর করে রাখা হয়েছে। পারস্পারিক শ্রোদ্ধবোধই তো একটি জাতির

জীবনে সংহতির জন্ম দেয়। বিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃনা ছড়িয়ে জাতীয় জীবন শান্তিময় হয়। অথচ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সেটিই করেছে। এবং সেটি তাদের জন্যও কল্যাণকর হয়নি। ১৫ ই আগষ্টের জন্ম তো তারা এভাবেই দিয়েছে। জাতীয় জীবনে যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসে তখন প্রতিটি নাগরিকই একই রকম সিদ্ধান্ত নেয় না। কিন্তু সে কারণে কাউকে ঘাতক,দেশের শত্রু বা জনগণের শত্রু বলা যায় কি? ১৯৭১এ জনাব নুরুল আমীন,শাহ আজিজুর রহমান,খান আব্দুস সবুর,ফজলুল কাদের চৌধুরি,মৌলভী ফরিদ আহমেদের ন্যায় বহু নেতা এবং মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি,নেজামে ইসলামি,জমিয়তে ইসলামি,কৃষক-শ্রমিক পার্টি,আব্দুল হকের পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পাটির ন্যায় বহু দল এবং বহু নির্দলীয় আলেম-উলামা, ইমাম, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী এবং সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি তখন শেখ মুজিব ও তার দল থেকে ভিন্নতর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য কি তাদেরকে ঘাতক বলা যায়? মুজিব বাহিনী যেমন অস্ত্র তুলে নিয়েছিল তাদেরও তখন পাকিস্তান বাঁচাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। পাকিস্তান ছিল তাদের নিজেদের দেশ, যেমনটি ছিল পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচদের। নিজেদের দেশ বাঁচাতে যে ব্যক্তি জীবন দিতে রাজি তাকে কি অন্যদের দালাল বলা যায়? অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে তাই বলা হয়েছে।

ইতিহাসের রচনাকারিগণ যে শুধু পক্ষপাতদুষ্ট তাই নয়, অতি প্রতিহিংসাপরায়ন ও কুরুচীপূর্ণ এটি হল তার নজির। অথচ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়দে আযমসহ মুসলিম লীগ নেতাদের মানবিক গুণটি চোখে পড়ার মত। সেদিন মনরঞ্জন ধরের মত কংগ্রেসের যেসব শত শত নেতা-কর্মী সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল তাদের কাউকেই জেলে পাঠানো হয়নি। কাউকে দালাল বলা হয়নি। তাদের নাগরিগকত্বও হরন করা হয়নি। তাদের ঘরবাড়ী লুটতরাজ ও দখল করা হয়নি। বরং তারা সংসদে সম্মানের সাথে বসা এবং সে সাথে মন্ত্রি হওয়ার মর্যাদা পেয়েছিলেন। অথচ বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধীতাকারিদের হয় নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে অথবা কারাবন্দী করা হয়েছে। জনাব মৌলবী ফরিদ আহম্মদের মত প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করে গুম করা হয়েছে তার লাশকে। মুসলিম লীগ সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরিকে প্রাণ দিতে

হয়েছে ঢাকার কারাগারে। বহু নিরীহ আলেম, ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র এবং হাজার হাজার রাজাকারদের হত্যা করা হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি লুট করা হয়েছে। অনেকের নাগিরগকত্ব হনন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতারা যে কতটা বিবেকশূণ্য ও মানবতাশূন্য,এসব হল তার দলীল। এগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অথচ ইতিহাসের বইয়ে এসব ঘটনা কোন বিবরণই নেই। যারা মুক্তিবাহিনীর হাতে এভাবে প্রাণ দিল বাংলাদেশের ইতিহাসে ও সরকারি পরিসংখ্যানে কোথাও তাদের কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ শেখ মুজিবের মধ্যে সেদিন যেটি প্রবল ভাবে কাজ করছিল তার নিজস্ব অযোগ্যতার ভীতি। যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না সে সমূদ্রে নামতে ভয় পায়। সে খোঁজে হাঁটু পানির খাদ। শেখ মুজিবর যোগ্যতা ছিল না বাংলাদেশের মত একটি ছোট দেশ পরিচালনার। ক্ষমতায় আসীন হওয়া মাত্র সেটি প্রমাণও করেছেন। বাংলাদেশের হাজার হাজার বছরের সমগ্র ইতিহাসে যা ঘটেনি তিনি সেটিই দেশকে উপহার দিয়েছেন। সোনার বাংলাকে তিনি ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত করেছেন। অন্যরা না জানলেও তিনি জানতেন পাকিস্তানের মত বিভিন্ন ভাষাভাষি নিয়ে গঠিত সর্ব বৃহৎ এ মুসলিম রাষ্ট্রটির শাসনভার চালানো যোগ্যতা তার নাই। সেটিকে ভেঙে সেটিকে তার সামর্থের উপযোগী করা সম্ভবতঃ তার বড় উদ্দেশ্য ছিল। ক্ষুদ্র কীট যেমন ক্ষুদ্র খাদ্য কণাকে খুঁজে তেমনি দশা ক্ষুদ্রমাপের মানুষদেরও। গড়া নয়, ভাঙ্গাই তাদের অহংকারে পরিণত হয়। মুসলিম বিশ্ব আজ যে ভাবে বিভক্ত,শক্তিহীন ও ইজ্জতহীন তা তো এসব ছোট চেতনার ছোট ছোট ব্যক্তিদের জন্যই।

অধ্যায় ৩: ইতিহাস ভরপুর পক্ষপাতদুষ্টতায়

পুলিশ, উকিল বা বিচারকের ভূমিকায় নামা ইতিহাসের লেখকের কাজ নয়। ঘটনা ঘটে যায়। সে ঘটনার পক্ষ- বিপক্ষের নিরপেক্ষ বিচারের দায়ভার প্রতিটি ব্যক্তির। যিনি ইতিহাস লেখেন তার দায়িত্ব ,সে বিচারকার্যে ব্যক্তিকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে সাহায্য করা। কিন্তু বাংলাদেশে ইতিহাস লেখকদের বড় ব্যর্থতা এবং সে সাথে বড় অপরাধ হল, পাঠকের সামনে নিরপেক্ষ তথ্য তুলে ধরতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। বরং নিজেরাই বাদী, নিজেরাই পুলিশ, সরকারি উকিল ও সরকারি ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকায় নেমেছেন। মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে ঘটনার বিচারে জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। তারা এক পক্ষের প্রচন্ড গুণকীর্তন ও অপর পক্ষের চরিত্রহনন করেছে। ইতিহাসের বিচার প্রত্যেকের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন। কারণ,এখানে কাজ করে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা- চেতনার মডেল। তাই একই ঘটনার রায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্নতর হয়। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের পর এক পক্ষের কাছে সেটি শুধু ন্যায্য নয়, উৎসবযোগ্যও গণ্য হয়েছে। ইরাকে ইঙ্গো- মার্কিন যৌথ আগ্রাসন, হত্যা ও বোমাবর্ষণ ইরাকীদের কাছে যত নিষ্ঠুরই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও তাদের মিত্রদের কাছে গণ্য হচ্ছে সভ্যতা ও গণতন্ত্রের নির্মাণে অতি মহৎ কর্ম রূপে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি ব্লেয়ারের এ নিয়ে কত অহংকার! এমন হত্যাকান্ডে নিয়োজিত নিজ দেশের নিহত যোদ্ধাদেরকে তারা জাতীয় বীর মনে করে এবং এ মহৎ কর্ম(?) জারি রাখতে ইরাকে তারা শত বছরের জন্য সৈন্য মোতায়েনের কথাও বলে, যেমনটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানপ্রার্থী জন ম্যাকেইন বলেছেন।

এমন দুটি ভিন্ন ধরনের রায় এসেছে একাত্তরের লড়াই নিয়েও। তখন দুটি ভিন্ন ও সম্পূর্ণ বিপরিত মুখী চেতনা কাজ করেছিল। একটি ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা। সে চেতনায় পাকিস্তান ভাঙ্গা, পাকিস্তানপন্থি এবং অবাঙ্গালীদের হত্যা ও তাদের ঘরবাড়ী ও দোকানপাট দখল নেওয়া ন্যায্য কর্ম গণ্য হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালীকে তাদেরকে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে বস্তিতে পাঠিয়ে দেওয়াও কোন রূপ অন্যায় মনে হয়নি। যে কোন সভ্য আইনে জবরদখলমূলক এমন কাজ জঘন্য অপরাধ। অথচ বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন

রাজনৈতিক দল ও সরকারি প্রশাসনের কাছে তা অতিশয় বীরত্বের মনে হয়েছে। সে বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ এসব সম্পত্তির জবর দখলকারিদেরকে সরকার নিজ হাতে মালিকানার দলিল পৌঁছে দিয়েছে। অথচ একাত্তরের ইতিহাসে এসব ঘটনার উল্লেখ নেই। অবাঙ্গালীদের উপর এমন নির্যাতনের বিবরণও নাই।

কোন দেশে ব্যাপক হারে পশু নির্যাতন হলে সেটিও খবর হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ অবাঙ্গালীর উপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন হল তার কোন বিবরণ দেশটির ইতিহাসের বইতে স্থানই পেল না। তাই বাংলাদেশের লিখিত ইতিহাস শুধু পক্ষপাতদুষ্ট এবং সত্যবর্জিতই নয়, অপূর্ণাঙ্গও। বরং যারা সেদিন বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশটি ভাঙ্গতে অমুসলিম কাফেরদের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করলো ও বহু মুসলিম হত্যা করল তারা চিত্রিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী রূপে। অবশ্য বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় এমনটিই স্বাভাবিক। কারণ, এখানে নিরেট বাঙ্গালী হওয়া এবং অন্য যারা বাঙ্গালী তা সে পৌত্তলিক কাফের বা নাস্তিক কমিউনিস্ট হোক তাদের সাথে একাত্ম হওয়াটাই গুরুত্ব পায়, মুসলমান বা প্যান- ইসলামিক হওয়া নয়। তাই এ ইতিহাসে বাঙ্গালী যুবকেরা কেন বিপুল সংখ্যায় মুক্তিযোদ্ধা হল সেটি বিশদ ভাবে আলোচিত হলেও লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী সন্তান কেন স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধীতা করল, কেন তারা রাজাকার হয়ে পাকিস্তানের একতা রক্ষায় নির্যাতীত হল, এমনকি প্রাণও দিল তার একটি দর্শনগত বা তত্ত্বগত বিশ্লেষণ এ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কেনই বা দেশের প্রতিটি ইসলাম দল ও প্রায় প্রতিটি ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আলেম তাদের বিরোধীতা করল তারও কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও দর্শনগত বিবরণ তারা দেয়নি। বরং এ ইতিহাসের লেখকগণ তাদেরকে চিত্রিত করেছে পাঞ্জাবী সৈনিকদের দালাল ও নারী সরবরাহকারি রূপে। এ অভিযোগ থেকে এমনকি ইসলামি দলসমূহের প্রবীণ নেতা- কর্মী ও আলেমদেরও তারা রেহাই দেয়নি। এভাবে প্রতিপক্ষের চরিত্রহানীর কোন সুযোগই তারা ছাড়েনি। সে সময়ের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিল আওয়ামি লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টি। এপক্ষটি ছিল মূলতঃ দেশের বহুল পরিচিত নাস্তিক কমিউনিস্ট,ধর্মে অঙ্গিকারশূণ্য জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের সম্মিলিত কোয়ালিশন।

১৩শত বা ১৪শত বছর আগে আরবী, ফার্সী, কূর্দী, তুর্কিভাষী অধ্যুষিত বিশাল মুসলিম রাষ্ট্র ভাঙ্গার কাজ কেউ যদি এভাবে তৎকালীন কাফেরদের সাথে কোয়ালিশন করে করতো তা হলে তাদেরকে কি বলা হত? মুসলমানদের রাষ্ট্র ভাঙ্গার কাজ যুগে যুগে যে হয়নি তা নয়,তবে কোন কালেই তা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়নি,হয়েছে কাফের ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে। সর্বশেষে হয়েছে ব্রিটিশ উপনেবিশিক শক্তির দ্বারা যারা আরব বিশ্বকে বিশেরও বেশী টুকরায় ভেংগেছে। ঈমানদার মুসলমান কাফেরদের অস্ত্র কাঁধে নিয়ে যুদ্ধ করেছে এমন নজির নেই। রাষ্ট্র দূরে থাক, ইসলাম কারো ঘর ভাঙতেও অনুমতি দেয় না।

মুসলমান হওয়ার অর্থ শুধু আল্লাহর ইবাদত করা নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসের সাথে অন্য ঈমানদার মুসলমানকেও আপন ভাই রূপে গণ্য করতে হয়। অন্য মুসলমান যে তার প্রাণপ্রিয় ভাই সেটি তার পিতা, পীর বা নেতার কথা নয়,এ ঘোষনাটি এসেছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। প্রাণপ্রিয় ভাইকে দেখা মাত্র একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াটি কেমন হয়? সেকি তাকে মারতে উদ্দ্যত হবে। তাকে ঘর থেকে নামিয়ে দিয়ে তার ঘর নিজে দখল নিবে? অথচ ঈমানের দাবী, ভাইকে দেখে তার মুখই শুধু হাসবে না আত্মাও আনন্দে আন্দোলিত হবে। অন্তরে যে ঈমান আছে এটি তো সেটিরই ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক। মুসলিম হওয়ার অর্থ শুধু নামাযী হওয়া নয়, নিজ ভাষা, নিজ গোত্র ও নিজ ভূগোলের সীমানা ডিঙ্গিয়ে অন্য ভাষা ও অন্য ভূগোলের মুসলমানের সাথে একাত্ব হওয়াও। এটিই ইসলামের বিশ্বভাতৃত্ব। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় শতশত বছর ব্যাপী পরস্পর যুদ্ধ করেছে। মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে সে আত্মঘাতি যুদ্ধ থেমে যায়, গড়ে ওঠে অটুট ভ্রাতৃত্ব। তাঁরা ভাই রূপে গ্রহণ করেছিল মক্কার মোহাজিরদেরকে। নিজের একমাত্র সম্বল ঘরখানিও ঘরহীন মোহাজির ভাইদের সাথে তারা ভাগ করে নিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরাও সেদিন মীরপুর,মোহাম্মদপুরের ন্যায় প্রায় প্রতি জেলায় বিশাল বিশাল এলাকা ছেড়ে দিয়েছিল হিন্দুস্থান থেকে আগত তাদের নির্যাতিত মোহাজির ভাইদের বাসস্থান নির্মাণে। তাদের মাঝে দোষত্রুটি যে ছিল না তা নয়। দোষত্রুটিপূর্ণ মানুষের সংখ্যা কি বাঙ্গালীদের মাঝে কম? কিন্তু সে জন্য কি একটি ভাষার মানুষের বিরুদ্ধে অত্যাচারে নামতে হবে? আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহর

বর্ণনা দিয়েছেন সীসাঢালা দেওয়াল রূপে। কোরআনের ভাষায় যা হলো "বুনিয়ানুম মারসুস"। মুসলিম উম্মাহর জন্য এটিই হল মহান আল্লাহর কাঙ্খিত মডেল। প্রতিটি মুসলমানের কাজ,সে কাঙ্খিত মডেল নির্মাণে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ। ইসলামে এটি উচ্চতর জ্বিহাদ। নবীজীর (সাঃ) যুগে এমন কোন সাহাবী ছিলেন না যারা এ জ্বিহাদে নিজেদের শ্রম,অর্থ ও মেধার বিণিয়োগ করেননি। শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী সাহাবী এ কাজে শহীদ হয়েছেন। অপর দিকে যে কোন বিচ্ছিন্নতা মুসলিম উম্মাহর সীসাঢালা দেওয়ালে ফাটল ধরায়। তাই এটি হারাম। একাজ শুধু ইসলামে জ্ঞানশূণ্য ও চেতনাশূণ্যদের হাতেই সম্ভব। এমন অজ্ঞতার কারণেই ১৯৭১ এ পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজটি জাতিয়তাবাদী সেকুলারিষ্ট শক্তি আনন্দ চিত্তে ও উৎসব- ভরে করেছে। কিন্তু ইসলামের পক্ষের শক্তি তা থেকে সযত্নে দূরে থেকেছে। বরং চেষ্টা করেছিল দেশটির হেফাজতে। ১৯৭১এ ইসলামের পক্ষের শক্তি কেন পাকিস্তানের পক্ষ নিল এটি হল তার দার্শনিক ভিত্তি। মুসলমান হওয়ার আরেক দায়বদ্ধতা হল, তাকে অনুসরণ করতে হয় ইসলামের তথা কোরআনে বর্ণীত আল্লাহর হুকুমকে। যদি সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায়ের বা অভিমতের বিরোধীও হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা নবী করীম (সাঃ) কে বলেছেন,

"ওয়া ইন তুতি আকছারা মান ফিল আরদে ইউদিল্লুকা আন সাবিলিল্লাহ"

অর্থঃ "এবং আপনি যদি এ জমিনে বসবাসকারি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের অনুসরণ করেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথকে সরিয়ে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাবে।"

অথচ যারা সেকুলার এবং যারা ইসলামী চেতনাশূণ্য তাদের দাবী 'জনগণ কখনও ভূল করে না'। তাদের এ দাবী যে কতটা মিথ্যা ও কোরআন-বিরোধী সেটি কি কোরআনের এ আয়াত শোনার পরও বুঝতে বাঁকী থাকে? আর জনগণ যে সিদ্ধান্ত নিতে কত বড় বিশাল ভূল করে সেটি কি বাংলাদেশের জনগণ এরশাদের মত দুর্বৃত্তদের বিপুল ভোটি বিজয়ী করার মধ্য দিয়ে বার বার প্রমাণ করেনি? সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই কি হিটলার বা বুশের ন্যায় নরখাদক পশুদের নির্বাচিত করেনি? মুসা (আঃ) বিরুদ্ধে ফিরাউনের পক্ষে অস্ত্র ধরেনি?

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন ইসলামের নবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)ও। মক্কার সে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রচন্ড বিরোধীতা ও বয়কটের কারণেই নবীজী (সাঃ) কে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল। মুসলমান হওয়ার অর্থই হল, শিকড়হীন কচুরিপানা বা খড়কুটোর মত গণ- স্রোতে ভেসে যাওয়া যাবে না। বরং শত বাধা- বিপত্তি সত্ত্বেও যেটি ইসলাম ও মুসলমানের জন্য কল্যাণকর সেটির উপর অটল থাকতে হবে। আর দুনিয়ার সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রটি বিনাশ করার মধ্যে ভারত ও তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কল্যাণ দেখলেও ইসলামি চেতনাশূণ্য ব্যক্তিরা সেটির মহা কল্যাণই দেখেছে। তাই পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রচন্ড বিরোধীতাও করেছে। যারা ৭১- এ পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন, তাদেরকেও সেদিন জীবনের প্রচন্ড ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। তারা জানতো পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার অর্থ ভারতীয় এজেন্ট ও আওয়ামী কর্মীবাহিনীর হামলার মুখে তাদের পড়তে হবে। তাদের ঘরবাড়ি ও দোকান- পাট জ্বলবে এবং নিজেদেরও নিহত হতে হবে। এবং সেটি যুদ্ধচলাকালীন ৯ মাসে এবং ১৬ ডিসেম্বরের পর প্রমাণিতও হয়েছিল।

কথা হল, এমন চেতনাসমৃদ্ধ আত্মত্যাগী মানুষদেরকে কি দালাল ও নারী সরবরাহকারি বলা যায়? অথচ দেশের ভারতপন্থি স্যেকুলারগণ সেটিই অবিরাম ভাবে বলছে। অবশ্য এটি যে তারা বিবেকের তাড়নায় বলছে তা নয়,তারা ব্যবহৃত হচ্ছে শত্রুপক্ষের রাজনৈতিক অভিলাষ পুরণে। পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্টরা এককালে প্রচুর বই লিখেছে ইরানীদের এ কথা বুঝাতে যে আরবরা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও প্রকান্ড হত্যাকান্ড চালিয়েছে। এদেরই আরেক দল আবার বই লিখেছে আরবদের বুঝাতে যে ইরানীরা কতটা বর্ণবাদী,আরববিদ্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারি। এভাবে দুই ভাষাভাষি মানুষের মাঝে বিভেদকে অতিশয় গভীর ও প্রতিহিংসাপূর্ণ করেছে। শুধু তাই নয়,সংঘাতকে রক্তাত্ব করতে দুই পক্ষকে যেমন অস্ত্র দিয়েছে তেমনি প্রশিক্ষণও দিয়েছে। আর এতে আরব- ইরানী বিভেদ যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতা। একই কাজ করেছ তুর্কিদের বিরুদ্ধেও। ভারতীয় ও পশ্চিমা লেখকগণ একই কাজ করছে দক্ষিণ এশিয়ায়। তারা বাংলাদেশে অবাঙ্গালী মুসলমানদেরকে শোষক,নির্যাতনকারি ও খুনি হিসাবে পেশ করছে। অথচ এ কথা লিখছে না পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙ্গালী মুসলমানেরা

যত কলকারখানা গড়েছে বৃটিশ তাদের ১৯০ বছরের শাসনে হাজার ভাগের এক ভাগও করেনি। পাকিস্তানের ২৩ বছরে সেটি এমনকি বাঙ্গালী পুজিপতিরাও করেনি। অপরদিকে ভারত ও পাকিস্তানের অবাঙ্গালীদেরকে বুঝাচ্ছে বাঙ্গালীরা কতটা দূর্নীতিপরায়ন,কলহপ্রবন ও অবাঙ্গালীবিদ্বেষী সেটি। ফলে বাংলাদেশের মানুষদের বন্ধুরূপে গ্রহন করতে পারছে না পাকিস্তান ও ভারতের অবাঙ্গালী মুসলমানরা। এ প্রচার পৌঁছে গেছে মধ্যপ্রাচ্যেও। ফলে আছড় পড়ছে বাংলাদেশের শ্রম বাজারেও। ভাষা, গোত্র, অঞ্চল, জেলা বা পরিবারের ভিত্তিতে যে বন্ধন গড়ে উঠে সেটি নিরেট জাহেলিয়াত। ইসলামের আগমন ঘটেছে এমন জাহিলিয়াতকে নির্মূল করতে,পরিচর্যা দিতে নয়। মুসলিম চেতনায় ইসলাম যে কতবড় বিপ্লব এনেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উক্তি থেকে। ইসলাম গ্রহণের পর একবার হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পুত্র তাঁকে বলেছিলেন, "আব্বাজান,বদরের যুদ্ধে আমি তিন বার আপনাকে আমার তরবারির সামনে পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। শৈশবে আপনার কত স্নেহ- আদর পেয়েছি। সেটি প্রতিবার মনে পড়ায় আঘাত না করে প্রতিবারই সরে দাঁড়িয়েছি।" শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "পুত্র, যদি তোমাকে আমি একটি বার তরবারির সামনে পেতাম,নিশ্চিত দুই টুকরা করে ফেলতাম।"

হযরত আবু বকর (রাঃ) যা বলেছেন তা হল নিরেট ঈমানদারির কথা। আর তাঁর পুত্র যা বলেছেন সেটি জাহেলিয়াত। জাহেল ব্যক্তি ভাষা, বর্ণ, ভৌগোলিকতা, পরিবার বা গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজে। জাতিয়তাবাদ তাই আধুনিক নয়,বরং সনাতন জাহেলিয়াত। প্যান- ইসলামিক চেতনার বিরুদ্ধে এটি ব্যধি। মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে বিভেদ ও ভাঙ্গন ছাড়া এটি আর কোন কল্যাণটি করেছে? যেখানে এ জাহেলিয়াতের বিকাশ ঘটেছে সেখানে আত্মঘাতি রক্তপাতও ঘটেছে। এক রাষ্ট্র ভেঙ্গে জন্ম নিয়েছে বহু রাষ্ট্রে। এ ভাবে বেড়েছে ক্ষুদ্রতা এবং ক্ষীণতর হয়েছে বিশ্বশক্তি রূপে মুসলমান উম্মাহর উত্থানের সম্ভাবনা। অপর দিকে যেখানেই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে সেখানেই বেড়েছে প্যান- ইসলামিক চেতনা। তখন নানা ভাষাভাষী মুসলমানের মাঝে একতাও গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ পূর্ব ভারতের মুসলমানের মাঝে সেটিই হয়েছিল। ফলে বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান সবাই কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এক রাষ্ট্রের নির্মাণও করেছে। বাঙ্গালী মুসলমানগণ সেদিন

ভারত থেকে আসা তাদের ভাইদের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে। এমন ভ্রাতৃত্বে জুটে মহান আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত সাহায্য। আল্লাহর সে নেয়ামতের বরকতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের যৌথ বিরোধীতার মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। নইলে নিরস্ত্র ও পশ্চাদপদ মুসলমানদের পক্ষ্যে কি সম্ভব হত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের নির্মাণ? সুলতান মুহম্মদ ঘোরির হাতে দিল্লি বিজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে এটিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সবচেয়ে বড় বিজয়। অথচ একাত্তরের ইতিহাসে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোন উল্লেখই নেই। বরং পাকিস্তানকে বলা হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির এক সামপ্রদায়ীক সৃষ্টি। বলা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। অথচ যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান গড়লো তার জন্ম ও পরিচর্যা দিয়েছিল বাংলার মুসলামানেরা। সে প্রতিষ্ঠানটি জন্মে ঢাকায়। এবং সেটি ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ নেতৃত্বে। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে যিনি পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন তিনিও ছিলেন বাঙালী মুসলমান শেরে বাংলা ফজলুল হক। নানা ব্যর্থতার মাঝে বাংলার মুসলমানেরা অন্ততঃ এ বিষয়টিকে নিয়ে গর্ব করতো পারতো। কিন্তু বিকৃত ইতিহাস রচনার নায়কগণ সে গর্বের বিষয়টিকেও ভূলিয়ে দিয়েছে। গর্বের বিষয় রূপে পেশ করেছ ক্ষুদিরাম, সূর্যসেনদেরকে। অথচ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি তাদের কোন অঙ্গিকারই ছিল না। বরং ছিল প্রচন্ড অন্ধ বিদ্বেষ।

পাকিস্তান গড়া হয়েছিল শুধু উপমহাদেশের মুসলমানদের কল্যাণে নয়, বরং সেখানে গুরুত্ব পেয়েছিল বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে শক্তিশালী ভূমিকা নেওয়ার বিষয়টিও। পাকিস্তান সে কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদের কি সাহায্য করবে,দেশটি নিজেই টিকে থাকতে পারেনি। কিন্তু সে ব্যর্থতার জন্য শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে দায়ী করা যায়? পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানী হওয়ার কারণে সে ব্যর্থতার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী হল পূর্ব পাকিস্তানীরা। সংখ্যাগরিষ্ট হওয়ার কারণে অনেকে ক্রিকেট,হকির টিমেও সংখ্যানুপাতিক খেলোয়াড় নেওয়ার দাবী তুলেছে। কিন্তু সে জন্য যে ভাল খেলারও প্রয়োজন রয়েছে সে গুরুত্ব অনুভব করেনি। এবং সেটি প্রায় সর্বক্ষেত্রে। ঠিকমত খেলেনি কোন খেলাই। রাজনীতির খেলায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সদস্যগণ তো সংসদ

খুনোখুনিও করে ফেললো। বিভক্তির সূত্র গুলো খুঁজে খুঁজে দাঙ্গা ও লুটপাটের সুযোগ খুঁজেছে। তাই বাঙ্গালী- বিহারী দাঙ্গার জন্ম দেওয়া হয়েছে আদমজী জুটমিলে। অথচ দাঙ্গার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র ছিল করাচী। সেখানে সিন্ধি,মোহাজির,পাঠান,পাঞ্জাবী ও গুজরাতি ভাষাভাষি বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাস। এ শহরটিতে বাস করে কয়েক লক্ষ বাঙালীও।মুসলিম বিশ্বের আর কোন শহরে এত ভিন্নতা ও এত বৈচিত্র নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী,সিন্ধি,পাঠান,বেলুচ ও মোহাজির মুসলমানেরা তাদের ভাষা,পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতা সত্ত্বেও এখনও এক অখন্ড রাষ্ট্রের মাঝে বসবাস করছে। নিজেদের মাতৃভাষা নয় এমন একটি ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্র ভাষা রূপে বরণ করে নিয়েছে। ইসলামের গৌরব যুগেও মুসলমানেরা সেটিই করেছিল। বিশ্বে যারা প্রথম কাগজ আবিস্কার করলো,নবীজীর (সাঃ) জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে যারা ভাষা ও ভাষালিপির জন্ম দিল, সাম্রাজ্য গড়লো, পিরামিডের ন্যায় বিস্ময়কর ইমারত গড়লো তারাও নিজ ভাষা ছেড়ে দিয়ে আরবী ভাষাকে বরণ করে নিয়েছিল। একটি জনগোষ্ঠি বিশ্বশক্তি ও বিশ্বসভ্যতা রূপে প্রতিষ্ঠা পায় তো এভাবেই। শত শত নদী যেমন সাগরে মিশে তাকে বিশালতা দেয়, তেমনি একটি জাতিও। ইসলামে উম্মাহর যে ধারণা তার মূল কথা তো এটিই। পাকিস্তান তার জন্ম থেকেই ভারতীয়, বার্মীজ, আফগানসহ নানা দেশের মুসলমানদেরকে আপন নাগরিক রূপে বরণ করে নিয়েছে। মুসলিম বিশ্বের ৫৭টি দেশের মাঝে পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যেখানে চারটি রাজ্যের বা প্রদেশের ভিন্নভাষি মানুষ এক অভিন্ন রাষ্ট্রের পতাকা তলে বাস করছে। অথচ বিভক্তি ও ভাতৃঘাতী সংঘাতই আজকের মুসলমানের প্রধানতম নৈতিক রোগ।

আরবরা একই ভাষা ও একই ধর্মের হয়েও আজ ২২ টুকরায় বিভক্ত। ফলে প্যান- ইসলামি চেতনার দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে পাকিস্তান আজও অনন্য। বাংলাদেশে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা ও বিহারী মোহাজির নিদারুন অবহেলা ও দুর্দশার শিকার। অথচ পাকিস্তানে আশ্রয় দিয়ে আছে ৩০ লাখ আফগান মোহাজিরকে বিগত ৩০ বছরেরও বেশীকাল ধরে। আফগানিস্তানে আগ্রাসী সোভিয়েত হামলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছরের রক্তাক্ষয়ী লড়াইয়ে পাকিস্তানের নাগরিকগণ সে লড়ায়ে বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছে। হাজার হাজার পাকিস্তানী মোজাহিদ আফগানদের সাথে কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে লড়েছে। এমনকি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে প্রাণও দিতে হয়েছে,এবং সেটি সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধী তাঁর লড়াকু ভূমিকার কারণে। আজও ভারতীয় জবরদখলের বিরুদ্ধে মজলুম কাশ্মিরীদের লড়ায়ে যে দেশটির নাগরিকগণ নানরূপ সহায়তা দিয়ে যাচেছ তা হল পাকিস্তান। শত ব্যর্থতার পরও এটি কি পাকিস্তানের জন্য কম অর্জন? একমাত্র এদেশটির মুসলিম বিজ্ঞানীরাই সফল হয়েছে আনবিক বোমা আবিস্কারে।এসব কারণে বিশ্বের মুসলমানদের কাছে এ দেশটির যে বিশেষ সন্মান রয়েছে তা কি অস্বীকার করা যায়?

সে তুলনায় বাংলাদেশের অর্জন কতটুকু? বাংলাদেশের সরকার কাশ্মিরে ভারতীয় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়। সেখানে শত শত মুসলমান মহিলা ধর্ষিতা এবং ধর্ষণের পর আগুণে নিক্ষিপ্ত হলেও নীরব থাকে বাংলাদেশের সরকার।মিয়ানমারের সামরিক জান্তাদের বর্বর হামলার শিকার সে দেশের রোহীংগা মুসলমানেরা।সরকার নীরব এক্ষেত্রেও।বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে প্রতিবেশী দেশের মজলুম মুসলমানদের প্রতি এটিই কি দায়িত্বপালনের নমুনা? অথচ ভারত থেকে ছিন্নমূল মজলুম মুসলমানদের সর্ববৃহৎ আশ্রয়স্থল হল পাকিস্তান। নানা ব্যর্থতার পরও সেখানে প্যান- ইসলামিক চেতনা যে এখনও বেঁচে আছে এ হল তার নজির। একাত্তরে বাঙ্গালী- অবাঙ্গালী রক্তাক্ষয়ী সংঘাতের পর আজও ১০ লাখেরও বেশী বাংলাদেশী বসবাস করছে পাকিস্তানে। এসব বাঙালীদের অধিকাংশই গেছে একাত্তরের পর। এটি কি প্যান ইসলামিক চেতনার কারণে নয়? ফলে একাত্তরে পাকিস্তানী সৈন্যদের লক্ষ্য ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙ্গালীর নির্মূল - আওয়ামী বাকশালীদের এ প্রচারণা কি বিশ্বাস করা যায়? অথচ আওয়ামী সেকুলারদের রচিত ইতিহাসে সেটিই অতি জোরেসোরে বলা হয়েছে। তাদের রচিত ইতিহাসে তুলে ধরা হয়নি বাঙালীর ব্যর্থতা ও অযোগ্যতাগুলো। এ হিসাব কখনই নেওয়া হয় না,বাঙালী মুসলমানরা যতটা হাত পেতে বিশ্ব থেকে নিয়েছে ততটা দিয়েছে কি? দিয়েছে কি এক কালের নিজ দেশ পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার উন্নয়নে? এমন কি খেলাধুলায়? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সুবাধে তাদের কাছ থেকে সেটিই কি পাকিস্তানের ন্যয্য পাওনা ছিল না? আদমজী,বাওয়ানী,দাউদ,ইস্পাহানী এসে কেনে পূর্ব পাকিস্তানে এসে

শিল্পায়ন করবে? তারা তো ছিল সংখ্যালঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বপাকিস্তানীদের কি পূজিঁ, যোগ্যতা ও কারগরি দক্ষতা নিয়ে পশ্চিম- পাকিস্তানী ভাইদের শিল্পায়নে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল না? পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকেরা এসে কেন চোরকারিবারীদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা পাহারা দিবে? অথচ ২৩ বছরের পাকিস্তানী আমলে সেটাই হয়েছে। এমনকি ১৯৫৬- এ পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সীমাহীন ব্যর্থতার দেখে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন জিওসি জেনারেল ওমরাহ খানের কাছে সীমান্ত পাহারায় সেনাবাহিনী নিয়োগের অনুরোধ করেছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান।- (আতাউর রহমান খান,২০০০)। এসব ব্যর্থতা নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা কি বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনে কখনও উদয় হয়েছে? তারা নিজেদের ব্যর্থতার কারণ ও তার প্রতিকারের চেষ্টা না করে দোষ অন্বেষণ করেছে অন্যদের। আর এটিই হল সকল ব্যর্থ ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর চিরাচরিত খাসলত। প্রো- এ্যাকটিভ না হয়ে তারা হয় রিয়াকটিভ। বাংলাদেশে সেকুলার মহলটি তেমন একটি অভ্যাসেরই পরিচর্যা দিয়েছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের বড় অপরাধ,এটি প্যান- ইসলামিক মিশন থেকে জনগণকে হঠিয়ে নেয়। অঙ্গিকার শূণ্য করে বিশ্বমুসলিমের কল্যাণে কিছু করায়। এজন্যই কাশ্মীরের মুসলমানদের পরাধীনতার বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন ইস্যুই নয়। ইস্যু নয় প্রতিবেশি মায়ানমারে নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানের স্বাধীনতার বিষয়টি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৪৭এর পরপরই এমন জাতীয়তাবাদী চেতনার খপ্পরে পরে। এমন কি নেতারাও জনগণের সামনে দেওয়া নিজেদের ওয়াদার কথা ভূলে যায়। সে ওয়াদার কথা শেরে বাংলা ফজলুল হকের মত ব্যক্তি ভূলে গিয়েছিলেন সাতচল্লিশের আগেই। তিনি ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগকে ঠেকাতে চরম সামপ্রদায়িক দল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির হিন্দু মহাসভার সাথে কোয়ালিশন করেছিলেন। অথচ ১৯৪০এ তিনিই লাহোরের মিন্টো পার্কে মুসলিম লীগের সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব উথাপণ করেছিলেন। যে মাওলানা ভাষানী আসাম মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি ১৯৫৪ সালে কাগমারি সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানকে শেষ বিদায় জানিয়ে দিলেন। অপর দিকে শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজ শুরু করেন ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সাথে ৪৭এর পর থেকেই। রাজনীতিবিদদের

থেকে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও ভিন্নতর ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব ডঃ শহিদুল্লাহ বলা শুরু করলেন, "আমরা প্রথমে বাঙ্গালী, তারপর মুসলমান"। অথচ ব্যক্তির বর্ণ ও ভাষাভিত্তিক পরিচয়টি মহান আল্লাহর দরবারে গুরুত্বহীন। রোজহাশরের দিন গুরুত্ব পাবে,সে কতটুকু সাচ্চা মুসলমান সেটি। কোন ভাষার কোন দেশের বা কোন বর্ণের সেটি নয়।কথা হল,আখেরাতে যার মূল্য নেই সেটি ইহকালেই বা গুরুত্ব পায় কি করে? সেটির পিছনে মুসলমান কেন তার অমূল্য সময় ও সম্পদ খরচ করবে? মুসলমানের কাছে ভাষা বা বর্ণের পরিচয়টি তাই গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম হয় কী করে? মুসলমানের কাছে তো সেটিই গুরুত্ব পায় যা মহান আল্লাহর কাছে গুরুত্ব রাখে, এবং পরকালের মুক্তিতে যা অপরিহার্য।ঈমানের অর্থ তো এই পরকাল সচেতনতা। আর এ বিপরীতে যেটি, সেটি হল ইহজাগতিকতা বা সেকুলারিজম। সেকুলারিজমে তাই ভাষা ও বর্ণ গুরুত্ব পায়। বাংলার মুসলমান রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ যে কতটা বিভ্রান্ত ছিলেন এ হল তার নমুনা। কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষা, বর্ণ, মাজহাব ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে যে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন বাঙ্গালী মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবীগণ তা পারেননি। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার বৃহত্তর দায়িত্ব ছিল তাদের উপরই। অথচ তারা আত্মসমর্পণ করেছেন ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্নতার কাছে। এমন ভাষাভিত্তিক সংকীর্নতা নিয়ে ১২ শত মাইলের শত্রুভূমি দিয়ে বিভক্ত একটি দেশ কি টিকে থাকতে পারে?

পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার মূল কারণ হলো মূলতঃ এই চেতনাগত ব্যর্থতা।ভৌগলিক ব্যবধান নয়। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তের দ্বীপটি থেকে পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপের দূরত্ব ঢাকা- লাহোরের দূরত্বের চেয়েও অধিক।পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশের দূরত্বের চেয়েও অধিক হল ভারতের পূর্ব সীমান্তের অরুনাচল প্রদেশ থেকে গুজরাটের দূরত্ব।বিস্তর ব্যবধান রয়েছে ভাষার ক্ষেত্রেও।কিন্তু সে জন্য কি প্রশাসনে কোন অসুবিধা হচ্ছে? অথচ বাংলাদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে নিজেদের ব্যর্থতা নিয়ে সমান্যতম আত্মসমালোচনাও নেই। আছে শুধু অন্যদের উপর দোষারোপ। হল,নিছক অবাঙ্গালী হওয়ার কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তি কি মুসলমানের দুষমন হতে পারে? একজন স্বভাষী, স্বদেশী,এমনকি প্রতিবেশীও তো তার পরম দুষমণ হতে পারে। নবীজীকে (সাঃ)কে যারা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল

তারা শুধু আরবই ছিল না,আত্মীয় এবং স্বগোত্রীয়ও ছিল। কিন্তু তাঁর সাহায্যে অর্থ ও প্রাণ দানে এগিয়ে এসেছিলেন দূরবর্তী মদিনার মানুষ। সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন রোমের শোহাইব, আফ্রিকার বেলাল এবং ইরানের সালমান। এটিই ইসলামের বিশ্বভাতৃত্ব। পাকিস্তানে অনাচার ছিল, অবিচার ছিল, বৈষম্য এবং দূর্নীতিও ছিল। এটি কোন মুসলিম দেশে নেই? খোদ বাংলাদেশে সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য কি কম? উত্তর বঙ্গের সাথে রয়েছে দেশের পূর্বাংশের বিস্তর বৈষম্য। এবং সেটি চাকুরি- বাকরি, কলকারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, সেনানিবাস, বিমানবন্দর, রেল যোগাযোগসহ সর্ব ক্ষেত্রে। দূর্নীতিতে দেশটিতো রেকর্ড করেছে। কিন্তু এর জন্য কি দেশ ধ্বংস করতে হবে? অথচ আওয়াম লীগ ও তার মিত্ররা পাকিস্তানের সাথে তাই করেছে। কিন্ত দেশ বিনাশের সে কাজে সমর্থন দেয়নি কোন ইসলামি ব্যক্তিত্ব। সাহায্য বা সমর্থণে এগিয়ে আসেনি একটি মুসলিম দেশও। সামরিক, রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক ভাবে সমর্থন করছিল ভারত ও রাশিয়ার ন্যায় কিছু অমুসলিম দেশ। একজন আলেমকেও তারা স্বপক্ষে পায়নি। কোলকাতা থেকে যখন জয়বাংলা রেডিও সমপ্রচার শুরু করে তখন সে প্রচার কাজে আলেমের কাজটি চালিয়ে নিতে হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক সৈয়দ আলি আহসানকে দিয়ে।

মুসলমানের প্রতিটি খাদ্যকে যেমন হালাল হতে হয় তেমনি প্রতিটি যুদ্ধকেও জ্বিহাদ হতে হয়। নইলে সে যুদ্ধে প্রাণ দূরে থাক একটি পয়সা বা একটি মুহুর্তই বা সে বিণিয়োগ করবে কেন? মুসলমানের প্রতিটি সামর্থই মহান আল্লাহর নিয়ামত। ঈমানদার হওয়ার অর্থ,আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতকে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার কাজে ব্যয় করা। নইলে সেটি পরিণত হয় খেয়ানতে। এমন প্রতিটি খেয়ানতের জন্য সে তখন দায়বদ্ধ হয় মহান আল্লাহর কাছে। ইসলামে এটি গোনাহ। প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমান ও ইসলামের কল্যাণের বিষয়টিকে এজন্যই সবার শীর্ষে রাখতে হয়। এমন এক মহৎ লক্ষ্যের কারণেই প্রতিটি মুসলিম যোদ্ধাই মোজাহিদ এবং যুদ্ধে নিহত হলে সে হয় শহিদ। অথচ আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেরাও একাত্তরের যুদ্ধকে জ্বিহাদ বলে দাবী করেনি। যারা নিজেদেরকে একাত্তরের চেতনার ঝান্ডাবাহি মনে করে তারা আজও সেটি বলে না। বরং তাদের ভাষায় এ যুদ্ধ ছিল ইসলাম চেতনা ও সে চেতনা- নির্ভর পাকিস্তানের ধ্বংসে এবং একটি সেকুলার

বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে। এমন এক সেকুলার যুদ্ধে একজন মুসলমান অংশ নেয় কি করে? কেনই বা বিণিয়োগ করবে তার মহামূল্য জীবন। কারণ মুসলমান তো তার আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আমানত – তাঁর জীবনকে যুদ্ধে তখনই বিণিয়োগ করবে যখন সে যুদ্ধটিকে শতকরা শতভাগ জ্বিহাদ বলে প্রমাণিত হবে।একজন কাফের থেকে প্রকৃত মুসলমানের পার্থক্য তো এখানেই।নইলে তার জীবন দান তো আল্লাহর কাছে প্রচন্ড খেয়ানত হিসাবে চিত্রিত হবে।আওয়ামী লীগ কি নিছক নিজেদের গদীর স্বার্থে এবং সে সাথে ভারতকে খুশি করতে জাতিকে তেমন একটি প্রচন্ড খেয়ানতের দিকেই জনগণকে ধাবিত করেনি? কথা হল, মহান আল্লাহর কাছে তাদের জবাব টা কি হবে?

অধ্যায় ৪: পাকিস্তানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীরা?

এ নিয়ে দ্বিমত নেই, পাকিস্তান বহু ক্ষেত্রেই চরম ভাবে ব্যর্থ হয়ছে। কিন্তু সে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীরা? সে ব্যর্থতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের কি কোন দায়ভারই নাই? অথচ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। ফলে সকল ব্যর্থতা থেকে দেশকে বাঁচানোর বড় দায়িত্ব ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের। সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যের অগ্রগতিতে অংশ নেওয়া দূরে এমনকি নিজ প্রদেশের নিজস্ব রাজনীতিতেও তারা ক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানে চারটি প্রদেশ ছিল না। নানা ভাষাভাষির বিভক্তিও ছিল না। কিন্তু আত্মঘাতি রাজনীতির কারণে নিজের ঘর গোছাতেই তারা চরম ভাবে ব্যর্থ হয়। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধী আওয়ীম লীগ, শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রি দল ও খেলাফতে রাব্বানী পার্টি ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্ত ভাবে নির্বাচন করে। নির্বাচনে তারা বিপুল ভাবে বিজয় লাভ করে। ২৩৭টি আসনের মধ্যে তারা ২২৮টি আসন তারা লাভ করে। কিন্তু বিজয়ের পর পরই তারা লিপ্ত হয় আত্মঘাতি লড়াইয়ে।

অঙ্গদলগুলি একে অপরকে শত্রু মনে করতে থাকে। চেষ্টা করে অপরদলকে কিভাবে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে দূরে রাখা যায়। যুক্তফন্টের পার্লামেন্টারী নেতা ছিলেন শেরে বাংলা। তাকেই সরকার গঠন করতে বলা হয়। ১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল তিনি প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন মাত্র তিনজন মন্ত্রি নিয়ে। বাদ দিয়েছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগকে। তিনজন মন্ত্রীর একজন ছিল তার ভাগিনেয় সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া। এটি কি কম স্বজনপ্রীতি? সরকার গঠনের প্রায় দেড় মাস পর ১৫ই মে তিনি মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগের সদস্যদের শামীল করেন। এরপর শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে আওয়ামী লীগ। এরপর শেরে বাংলাকেও সরতে হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলার দল থেকেই জনাব আবু হোসেন সরকার। ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁকেও যেতে হয়। ক্ষমতায় আসেন আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান। তার ভাগ্যেও সরকারে থাকা বেশী দিন সম্ভব হয়নি। তাকে সরিয়ে ১৯৫৮ সালের ১৯শে জুন আবার ক্ষমতায় আসেন আবুল হোসেন সরকার। এবার তিন দিন পর ২২ জুন তারিখে আবার তাকে সরতে হয়। (সা'দ আহম্মদ,২০০৬)

এভাবে তারা সমগ্র পাকিস্তানের কি নেতৃত্ব দিবে, দারুন ভাবে ব্যর্থ হয় নিজ প্রদেশ শাসনে। ঘন ঘন সরকার গঠন ও ভাঙ্গা দেখে ভারতীয় নেতারা তখন ব্যঙ্গ করে বলত, ভারতীয় রমনীরা যেরূপ শাড়ী বদল করে ঢাকায় তেমন সরকার বদল হয়। যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদলগুলির মাঝে সংঘাত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে প্রাদেশিক পরিষদের মধ্যেই তারা খুনোখুনী করে। পরিষদের ডিপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীর মাথায় গুরুতর ভাবে আঘাত করে। পরে তিনি হাসপাতালে মারা যান। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে সেদিন তিনিই সভাপতিত্ব করছিলেন। উল্লেখ্য, সেদিন প্রাদেশিক সংসদের সে খুনোখুনির জলসায় কোন অবাঙ্গালী ছিল না, কোন পশ্চিম পাকিস্তানী বা পাঞ্জাবী আমলা বা সেনাকর্মকর্তাও ছিল না। এ খুনোখুনির কান্ডটি ঘটেছিল প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ বাঙালী সদস্যদের হাতে।যেহেতু বাঙালীর সকল দূর্ভোগের জন্য পাঞ্জাবীদের দায়ী করা হয়,এ বিষয়টিও এজন্য লক্ষ্য করার মত। আরো দুঃখজনক হল, এ হত্যকান্ডটি ঘটেছিল প্রকাশ্য দীবালোকে, অথচ তার কোন বিচার বিভাগীয় তদন্তও তারা করেনি। ফলে এ গুরুতর অপরাধের জন্য কারো শাস্তি হয়নি, কাউকে গ্রেফতারও করা হয়নি। আওয়ামী

লীগ ও তার মিত্ররা দেশটিকে যে কতটা মগের মুল্লুকে পরিণত করেছিল এ হল তার নমুনা।আর লজ্জাজনক কথা, একবার তো তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে স্পীকারকে পাগল রূপে ঘোষণা দিয়েছিল।যেন ভোট দিয়ে একজন মানুষকে পাগলও বানানো যায়! পাকিস্তানের গণতন্ত্র চর্চা তাদের কাছে যে কতটা তামাশায় পরিণত হয়েছিল এ হল প্রমাণ। সত্তরের দশকে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা যেমন বাংলাদেশের মুখে কালিমা লেপন করেছিল– অর্জন করেছিল তলাহীন ভিক্ষার ঝুলির খেতাব, তারা কালিমা লেপন করেছিল পাকিস্তানের মুখেও। সেটি সংসদে ডিপুটি স্পীকার হত্যা ও গণতন্ত্র চর্চায় নিদারুন ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬%) বাঙালী নাগরিকগণ পূর্ব পাকিস্তানে অনেক অবাঙ্গালীর পূজি ও মেধা বিণিয়োগ করতে দেখেছে। কিন্তু নিজেরা পশ্চিম পাকিস্তানে একখানি কারখানাও নির্মাণ করেনি। নিজেরা নিজেদের সীমানাও যথাযত পাহারা দিতে পারেনি, সে ব্যর্থতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পরিণত হয়েছিল চোরাকারকারীদের স্বর্গরাজ্য। কি প্রশাসন, কি রাজনীতি, কি পার্লামেন্টারী বিতর্ক, কি সীমান্ত প্রতিরক্ষা, কি শিল্পায়ন - সব কিছুতে বাঙালীর ব্যর্থতা শুধু একাত্তর- পরবর্তী বিষয়ই নয়, ষোল কলায় বিকশিত হয়েছিল পাকিস্তানী আমলেও। আরো দুঃখজনক হলো, এত ব্যর্থতার পরও নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে কোন আত্মসমালোচনা নাই। বরং সব সময়ই সকল ব্যর্থতার দায়ভার অন্যদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্ঠা হয়েছে সর্বাত্মক ভাবে। প্রচন্ড অহংকার চেপেছিল এ নিয়ে যে, সমগ্র পাকিস্তানে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগের আত্মঘাতী রাজনীতির আরো উদাহরণ দেয়া যাক। শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে ব্যর্থতাটি প্রকট ভাবে দেখা দেয় তা হল, একটি শাসনতন্ত্র তৈরীর ব্যর্থতা। অবশেষে সে কাজে সফলতা আসে ১৯৫৬ সালে। এবং সেটি অবাঙালী প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে। অথচ সে সময়ও আওয়ামী লীগের ভূমিকা আদৌ সহায়ক ছিল না। সে সময়ের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব অলি আহাদ তার বই "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫" লিখেছেনঃ

"১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরি মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তান মুসলিম লীগ, শেরে বংলা এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টভূক্ত কৃষক শ্রমিক পর্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

(আব্দুস সালাম খান পরিচালিত), সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন, পাকিস্তান কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রোগেসিভ পার্টি ও গণতন্ত্রী দলভূক্ত সদস্যবৃন্দের সমবেত ভোটে সংবিধান গৃহীত হয়। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ প্রতিবাদে গণ- পরিষদ হল হইতে "ওয়াক আউট করে ও চুড়ান্তভাবে গৃহীত শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষরদানে বিরত থাকে।" -(অলি আহাদ)।

স্বাক্ষর না করার কারণ, পূর্ব পাকিস্তানকে পর্যাপ্ত স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়নি। অথচ এই সোহরাওয়ার্দীই যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন সে কথা সম্পূর্ণ ভূলে যান। ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুন ঢাকার পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় দৃপ্তকন্ঠে ঘোষণা করেন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর গণতান্ত্রিক মানসিকতার কথা? আওয়ামী লীগে তখন চরমঅভ্যন্তরীণ বিরোধ। জনাব সোহরাওয়ার্দী তখনও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব ভাষানীর সাথে তাঁর বিরোধ তখন তুঙ্গে। বিষয়, পররাষ্ট্র নীতিসহ আরো বেশ কিছু বিষয়। মন্ত্রীত্ব বনাম এসব সাংগাঠনিক মনবিরোধ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন,

"আওয়ামী লীগ আবার কি? আমিই আওয়ামী লীগ।" অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বিস্ময়করভাবে অবলীলাক্রমে বলেন, "আমিই আওয়ামী লীগের মনিফেস্টো।"-(অলি আহাদ)।

১৯৪৭ সালের ৫ই আগষ্ট পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী পার্টি বৈঠকে খাজা নাজিমুদ্দীন ৭৫- ৩৯ ভোটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী এ পরাজয় সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়, এটি নাকি ষড়যন্ত্র। তিনি ও তাঁর সদস্যগণ নিজ দলের গণতান্ত্রিক রায়ের প্রতিও যে কতটা গোস্বা হয়েছিল এ হল তার নমুনা। মনের দুঃখে প্রথমে তিনি ভারতে থেকে যাওয়ার মনস্থ্য করেন। পরে পাকিস্তানে আসেন, তবে ঢাকাতে নয়। তিনি কোলকাতা থেকে লাহোর অভিমুখে রওনা দেন। কথা হল, গণতান্ত্রিক রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এমন নেতাদের হাতে কি গণতন্ত্র চর্চা নিরাপদ হয়? গণতন্ত্রের রায়কে

তারা তখনই মানতে রাজী যখন সেটি নিজেদের পক্ষে যায়। এ এমন অসুস্থ্য চেতনার কারণেই, ১৯৫৩ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ যখন জনাব নাজিম উদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করেন তখন তার সে অগণতান্ত্রিক, অন্যায় ও অবৈধ পদক্ষেপকে জনাব সোহরাওয়ার্দী পল্টনের জনসভায় সমর্থন জানান। অথচ তখন দেশের গণপরিষদে জনাব নাজিম উদ্দিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থণ ছিল। বরখাস্ত করার আগে জনাব গোলাম মুহম্মদ প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিম উদ্দিনকে সংসদে সেটি প্রমাণেরও সুযোগ দেননি। লক্ষ্যনীয় হল, জনাব সোহরাওয়ার্দীই পাকিস্তানের রাজনীতিতে মুজিবের ন্যায় পাকিস্তানের শত্রুদের পুনর্বাসিত করেন।

দেখা যাক শেখ মুজিবের গণতন্ত্র চর্চার নমুনা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের শরীক দল দিল। ১৯৫৬ য়ের সেপ্টম্বরে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রী সভার মন্ত্রি হন। তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান খান। শেখ মুজিব তখন আওয়ামী লীগেরও সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অধিবেশনে গৃহীত গঠনতন্ত্রের ৬৬ ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবের উপর অবশ্য পালনীয় ছিল যে মন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে দলীয় পদ থেকে ইস্তাফা দিবেন। উক্ত ধারায় সুস্পষ্ট ছিল যে, অন্যথায় এক মাস পরে উক্ত কর্মকর্তার পদ শূণ্য বলে গণ্য হবে। দলের অন্য মন্ত্রী যেমন আতাউর রহমান খান,আবুল মনসুর আহম্মদ ও খয়রাত হোসেন দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করলেও তিনি তা করেননি। - (অলি আহাদ)

মানুষের আসল চরিত্র ধরা পড়ে ক্ষুদ্র বিষয়ে তার আচরণে। এমন কি অতিশয় দুর্বৃত্তও দুর্বৃত্তির বিশাল কান্ডটি জনসম্মুখে ঘটায় না। কারো বাড়ীতে আগুন লাগা দেখে অতি ডাকাত প্রকৃতির ব্যক্তিও মহল্লার অন্যদের সাথে মিলে সেটি নেভাতে যায়। কারণ এটি বিশাল ব্যাপার। এ কাজে এগিয়ে না আসলে তার বিবেকহীন পশু চরিত্রটি জনসম্মুখে প্রকাশ পায়। সমাজে কেউ কি এরূপ বিবেকহীন রূপে চিত্রিত হতে চায়? এমন কি অতিশয় দূর্বৃত্তও নয়। কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন দুর্বৃত্তরা ততটা সতর্ক থাকে না বলেই তাদের আসল চরিত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বেরিয়ে আসে। তাই ব্যক্তির গুণাগুণ যাচায়ে উত্তম উপায় হল মামূলী বিষয়ে তার আচরনটি দেখা। মহান নেতাদের মাঠ পর্যায়ে নেমে কর্মীদেরকে নিজের নামে প্লাকার্ড লিখতে বলার সময় হয় না।এমন

কাজে রুচীও বোধ করেন না। কিন্তু শেখ মুজিব এমন তুচ্ছ কাজেও ময়দানে নেমেছেন। ঢাকা থেকে ভৈরবের ন্যায় মফস্বলের শহরে ছুটে গেছেন। তার উদাহরণ দেওয়া যাক। আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও শেখ মুজিবের অতি ভক্ত আব্দুর রউফ তার বইতে লিখেছেন,

“১৯৫০ সালে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ভৈরবে। আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আওয়ামী লীগের জনসভা উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি ছলছে তখন ভৈরবে। ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় নেতার আসবেন। তাই আমরা সবাই একই সাথে প্রচুর উৎসাহ আর দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাজ করে চলেছি। কলেজ হোষ্টেলে হল আমাদের কাজের প্রধান কেন্দ্র। একদিন পোষ্টার লেখা,প্লাকার্ড বানানো আর অন্যান্য প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার মুহুর্তে এক দীর্ঘাদেহী সুদর্শন যুবক ঢুকলেন রুমে। ... মুজিব ভাইকে কাছে পেয়ে আমাদের সকলের কাজের উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ..যাওয়ার সময় ছাত্রকর্মী হায়দারের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, “তোরা কিছু খেয়ে নিস”। ..যেতে যেতে তিনি হেসে আমাদেরকে বললেন, “তোরা এত পোষ্টার- প্লাকার্ড বানাচ্ছিস,তোদের মুজিব ভাইয়ের নামে কি একটাও করবি না”। ইঙ্গিতেই কাজ হয়েছিল। জনসভার দিন দেখা গেল মওলানা ভাষানীর নামে প্লাকার্ড ছিল,শেখ মুজিবের নামে তার থেকে কম ছিল না,জিন্দাবাদ ধ্বনিও তার নামে কম দেয়া হয়নি।”- (আব্দুর রউফ, ১৯৯২)

এই হল মুজিবের চরিত্র। নিজের ইমেজ তৈরীতে মেধা নয়, এরূপ নীচু মানের সহজ পথ বেছে নিয়েছিলেন। শেখ মুজিব ও ভাষানীর ন্যায় ব্যক্তিদের আত্মঘাতী রাজনীতিই সামরিক শাসন ডেকে এনেছিল ১৯৬৯ সালে। সে সময় শাসন ক্ষমতায় ছিল আইয়ুব খান। তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে শুরু হয় চরম গণ- আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকে। তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ভোটে। আইয়ুব খান একে নাম দিয়েছিলেন মৌলিক গনতন্ত্র। সম্মিলিত বিরোধী দলের দাবী ছিলঃ সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসন। আইয়ুব খান এদুটি দাবী মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব দাবী করে বসলেন, ৬ দফাও মেনে নিতে হবে। নির্বাচনে যাওয়ার ধৈয্য তার ছিল না। অথচ ৬ দফা নিয়ে বিরোধী

দলগুলি মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। ফলে আইয়ুব খানেরও সেটি মেনে নেওয়ায় আগ্রহ ছিল না। সৃষ্টি হলো চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থা। অথচ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেলেন এবং তার বিরুদ্ধে আনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেওয়া হয়েছিল সম্মিলিত বিরোধীদলের জোট PDM এবং DAC আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। নইলে শেখ মুজিবসহ বহু আওয়ামী নেতা তখন জেলে ছিল। তখন আওয়ামী লীগের একার পক্ষে তেমন জোরদার অন্দোলন গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। অথচ আওয়ামী লীগ সম্মিলিত বিরোধী দলের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পিছন থেকে চাকু ডুকিয়ে দেয়। পরের বছরেই প্রমাণ হলো,পাকিস্তানের জন্য এটিই ছিল গনতন্ত্রের শেষ ট্রেন। মুজিবের কারণে সেটিও হাতছাড়া হয়ে যায়। দেশ আবার নিক্ষিপ্ত হলো অস্থিতিশীল অবস্থায়। এমন অবস্থায় একমাত্র বিদেশী শত্রুরাই খুশি হয়। আর পাকিস্তানের জন্য এমন শত্রুর অভাব ছিল না। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এবং ইসরাইল তেমন এক অবস্থার জন্য পূর্ব থেকেই অপেক্ষায় ছিল। আইয়ুব চলে গেলেন কিন্তু জাতি ব্যর্থ হলো শান্তিপূর্ণ ভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে। ক্ষমতায় এল আরেক সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ফলে পরের দিনগুলি আরো রক্তাত্ব হলো। তাই এ করুণ পরিণতির জন্য শুধু কি সামরিক বাহিনীকে দায়ী করা যায়? দেখা যাক নেতাদের নীতি ভ্রষ্টতার বিষয়টি। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক পুর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ১৯৫৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কলকাতায় এক সংবর্ধনা সভায় অত্যন্ত আবেগজড়িত বলেন,"রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোন শক্তিই কোনদিন ভাগ করতে পারবে না।"-(সা'দ আহম্মদ, ২০০৬)

তিনিই ভূলেই গেলেন, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরের মিন্টো পার্কে মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনিই পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তখন পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে মূল যুক্তিটি হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিবাদ ছিল না, বরং সেটি ছিল দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, আদর্শিক, শিক্ষাগত ও জীবনলক্ষ্যের ভিন্নতা। বাঙালী রূপে বেড়ে উঠার বিষয়টিই মুসলমানদের জীবনে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, বরং তাদের রাজনীতির মূল এজেন্ডা হল নিজ দেশে মুসলমান রূপে বেড়ে উঠার বিষয়টি নিশ্চিত করা। আম গাছের জলবায়ু বা আবহাওয়াগত প্রয়োজনটি যেমন আঙ্গুর

গাছ থেকে ভিন্নতর, তেমনি একজন মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত পরিবেশটি একজন অমুসলিম থেকে ভিন্নতর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনটি দেখা দিয়েছিল এ ভিন্নতর প্রয়োজন মেটাতে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পিছনে এটিই ছিল মূল দর্শন বা ফিলোসফিকাল কনসেপ্ট। মুসলমানগণ তাই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। শেরে বাংলার মত একজন প্রথম সারির নেতার সেটি বুঝা উচিত ছিল। এমন বিভ্রান্তিকর চেতনা নিয়ে তিনি কি ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের ন্যায় বিশ্বের সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের নেতা হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন? এমন বক্তব্যর জন্যই পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ন হয়ে যায়। কলিকাতায় দেওয়া তাঁর ভাষণের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলী বগুরা পর্যন্ত তাঁকে ভারতের দালাল বলেছেন। এ বিভ্রান্ত চেতনার কারণে তাঁকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো এমনকি অনেক বাঙালী মুসলিম নেতাও বিপদজনক মনে করেন। ফল দাঁড়ালো, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল তাঁকে মুখ্যমন্ত্রির পদ থেকেই বরখাস্ত করলেন। এর পূর্বেও তিনি সে বিভ্রান্তিকর চেতনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন মুসলিম বিদ্বেষী চরম হিন্দু সাম্প্রদায়ীক দল হিন্দু মহাসভার সাথে স্বাধীনতা- উত্তর অবিভক্ত বাংলার কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। তখন তিনি কোমর বেঁধে লেগেছিলেন, মুসলিম লীগ যাতে ক্ষমতায় যেতে না পারে।

দেখা যাক আওয়ামী লীগের মুসলিম প্রীতির নমুনা। ১৯৫৬ সালে যখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তখন ইসরাইল, বৃটেন ও ফ্রান্স একযোগে মিশরের উপর হামালা করে। হামলার কারণ, মিশর সরকার সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেছিল। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব সে হামলার নিন্দা করে। নিন্দা করে এমনকি তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। প্রবল ভাবে নিন্দা করে ভারত। এমনকি সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনীদের চাপেই অবশেষে সে যুদ্ধ থেমে যায়। হামলাকারি ইসরাইল, বৃটেন ও ফ্রান্স তখন লেজগুটিয়ে সুয়েজ খাল এলাকা থেকে পালাতে বাধ্য হয়। অথচ সে সময় আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীর সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পূর্ণ কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত। তিনি সে আগ্রাসনের নিন্দা না করে বলেছিলেন, ইসরাইল, বৃটেন ও ফ্রান্সের মোকাবেলার শক্তি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নাই। তখন তিনি অভিনব সূত্র শুনান, "শূন্যের সাথে শূন্যের যোগে শূন্যই হয়।"

এভাবে তিনি রাজনীতিতে পাটিগণিতের যোগবিয়োগের অংক নিয়ে আসেন। অথচ মুসলমান যত দূর্বলই হোক তাদের মধ্যে একতা গড়া ও একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া নিছক রাজনীতি নয়, পাটি গণিতের অংকও নয়, এটি পবিত্র ইবাদত। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর চেতনায় তার লেশ মাত্র ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীদের হামলার নিন্দা করার জন্য যে ণ্যূনতম মূল্যবোধ দরকার তিনি সেটুকুও দেখানে পারেননি। তাঁর এ নীতির ফলেই আরব বিশ্বের সাথে বিশেষ করে মিশরের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের দারুন অবনতি ঘটে। আওয়ামী লীগের আত্মঘাতি রাজনীতির এ হল এক নমুনা।

ইসলামী চেতনার কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু যে গণতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে আওয়ামী লীগের আজও অহংকার সে চেতনাই বা তাদের কতটা ছিল? সে উদাহরণও দেওয়া যাক। ১৯৫৪ সালের কথা । মোহাম্মদ আলী বগুড়া তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানকে প্রেসিডেন্ট না বলে ব্রিটিশ আমলের খেতাব অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল বা বড় লাট বলা হত। পার্লামেন্টকে বলা হত গণপরিষদ। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ছিল তিনি ইচ্ছা করলে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী গভর্নর জেনারেলের এ ক্ষমতা রহিত করে গণপরিষদে একটি বিল আনেন। বিল চুড়ান্ত বিবেচনার জন্য গণপরিষদে পেশ করার পর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে গণপরিষদে সেটি পাশও হতে যাচ্ছিল। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন প্রাক্তন আমলা জনাব গোলাম মোহম্মদ। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে গভর্নর জেনারেল এ বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগেই ২৩শে অক্টোবর গণপরিষদই ভেঙ্গে দেন। তখন তাকে সহয়তা দেন সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খান। পাকিস্তানী গণতন্ত্র চর্চার বিরুদ্ধে এটি ছিল গুরুতর ছুরিকাঘাত। এর পর আর গণতন্ত্রচর্চা তার হৃত স্বাস্থ্য আর ফিরে পায়নি। সে সময় গণপরিষদের মূল দায়িত্ব ছিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। এটিই ছিল পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ। কিন্তু সে কাজটি সমাধা করার সময় পায়নি। তখন গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন ফরিদপুরের মৌলবী তমিজ উদ্দীন খান। তিনি আদালতে গভর্নর জেনারেলের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সিন্ধুর হাইকোর্টে জিতলেও তিনি সুপ্রিম কোর্টে হেরে যান। সুপ্রিম কোর্টের এ

রায়টি পাকিস্তানের বিচার- ইতিহাসে আজ বিতর্কিত। কিন্তু গভর্নরের সে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের প্রতি অতি দ্রুত সমর্থণ নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। তখন দলটির নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। “দলের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী করাচী থেকে এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখার সহ- সভাপতি আতাউর রহমান খান ঢাকা হতে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে গভর্নর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক কাজকে সমর্থণ করেন। শেখ মুজিব তখন জেলে, তিনি তখন দলের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারি। ঢাকার সেন্ট্রাল জেল থেকে শেখ মুজিব টেলিগ্রাম যোগে পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যায় ও অবৈধ বিলুপ্তিকে স্বাগত জানান। এমনকি গোলাম মোহাম্মদের এই বিধি বহির্ভূত অন্যায় ফরমানের পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষে আতাউর রহমান ঢাকা থেকে এবং মাহমুদুল হক ওসমানি করাচী থেকে বিদেশে অবস্থানরত শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও লন্ডনে অবস্থানরত মাওলানা ভাসানীর সমীপে গমন করেন।.. ১৪ই নভেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন উপলক্ষে পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণের সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও জনাব আতাউর রহমান খান ঢাকা বিমান বন্দরে স্বৈরাচারী গভর্নর জেনারেলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হলেন। বিমান বন্দরে তাঁহাকে কে মাল্যভূষিত করবেন এই সমস্যায় জর্জরিত দুই নেতাকে উদ্ধার করলেন গভর্নর জেনারেল স্বয়ং। অর্থাৎ তিনি শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খানের দুই হাত একত্রিত করিয়া যুগপাৎ মাল্যদানের সুযোগ করিয়া দিয়া উভয়েরই ধন্যবাদার্হ হইলেন।”-(অলি আহাদ)

অধ্যায় ৫: পাকিস্তান সৃষ্টিতে বেশী লাভবান হয়েছিল বাঙ্গালী মুসলমান

সমগ্র উপমহাদেশে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বুদ্ধিবৃত্তি সর্বক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল বাঙালী মুসলমানেরা। বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এসব প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগের বেশী ছিল না কিন্তু তারা শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে অগ্রসর ছিল। বাংলায় মুষ্টিমেয় যে ক'জন লেখাপড়া শিখছিল তাদের পক্ষে প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগীতা করে চাকুরিতে ঢুকা সহজ ছিল না। সহজ ছিল না ব্যবসা-বাণিজ্যে সামনে এগুনো। পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত অগ্রসর হিন্দুরা তাদের জন্য সামান্যতম স্থানও ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাশ একবার চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য সংখ্যানুপাতে বরাদ্দের কথা বলেছিলেন, কিন্তু বর্ণহিন্দুরা তার সে প্রস্তাব তৎক্ষনাৎ নাকোচ করে দেয়। আজকের ভারতে আজও তারা দিচ্ছে না। ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ হলে কি হবে, সরকারি চাকুরিতে শতকরা ২ ভাগও তারা নয়। ফলে ভারতের মুসলমানগণ আজ সেদেশের নমশুদ্র বা হরিজনদের থেকেও পশ্চাদপদ। এবং সে ঘোষণাটি এসেছে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কর্তৃক স্থাপিত এক তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে।

অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে পূর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষক-সন্তানেরা প্রতিযোগিতমূক্ত বিশাল জায়গা খালী পেয়েছিল সামনে এগুনোর জন্য। বড় গাছের পাশে চারা গাছ বাড়তে পারে না। এ জন্য আলাদা পরিচর্যা দরকার। পূর্ব বাংলার পশ্চাতপদ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সে মহাসুযোগটি এনে দেয়। ফলে পাকিস্তান আমলের মাত্র ২৩ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, উকিল ও অন্যান্য পেশাদার সৃষ্টি হয় ভারতের ১০ কোটি মুসলমান তার সিকিভাগও সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ কি বিস্ময়! আওয়ামী বাকশালী চক্রের কাছে এ সময়টি সবচেয়ে শোষণমূলক যুগ রূপে চিত্রিত হয়। এ সময়টাকে তারা চিত্রিত করে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসনের যুগ রূপে, যদিও সে শাসকদের মাঝে তাদের নিজ দলের নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দীও ছিলেন।

আওয়ামী বাকশালী চক্র এতটাই বিবেকবর্জিত যে, পার্শ্ববর্তী ভারতীয় মুসলমানদের সাথে তুলনামূলক বিচারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলানেরা যে অনেক খানি দ্রুত এগিয়ে গেল সে কথা তারা বিবেচনায় আনতে রাজী নয়। ভারতে হাজার হাজার মুসলমান যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ডিগ্রি নিয়েও আজ বেকার। সেদেশে মুসলমানদের চাকুরি পাওয়াই কঠিন। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দাঁড়াতে গেলেই উগ্র হিন্দুদের সন্ত্রাসের কবলে পড়তে হয়। তখন জান নিয়ে বাঁচাই দায় হয়ে যায়। অথচ পাকিস্তানে যোগ দানের ফলে বাঙালী মুসলমানদের ভাগ্য খুলে যায়। এর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের স্মৃতীচারণ থেকে। তিনি লিখেছেন,

"হোসেন আলীকে চিনতাম ১৯৪৭ সাল থেকে। ১৯৪৭ সালে আমরা যে কজন তরুণ শিক্ষক পূর্ববঙ্গ অঞ্চল থেকে সিলেটের এম,সি, কলেজে যোগ দিয়েছিলাম হোসেন আলী তাদের অন্যতম। তার ডিগ্রি ছিল কেমিষ্ট্রিতে। সিলেটের আম্বরখানায় আমি যে বাসা ভাড়া করেছিলাম প্রথম কয়েকদিনের জন্য তিনি সেখানে উঠে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে আরো ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক মঈদুল ইসলাম। তিনি বাসায় রয়ে গেলেন। হোসেন আলী এক রিক্সাওয়ালার সাথে মেস করেন। এ সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেন্ট্রাল সার্ভিসের জন্য অনেক অফিসার রিক্রুট করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ছিল না কারণ তখনই কিছু লোক ট্রেনিং এর জন্য নিয়াগ করার প্রয়োজন দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালী আই সি এস অফিসার একজনও ছিল না। সুতরাং শুধু ইন্টারভিউ করে কাউকে ফরেন সার্ভিস, কাউকে এডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিস, কাউকে অডিট সার্ভিসে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কলেজে কলেজে রিক্রুটমেন্ট টিম ঘুরে বেড়িয়ে লোক সংগ্রহ করে। এইভাবে হোসেন আলী পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন।... সেই হোসেন আলী নাটকীয় ভাবে (একাত্তরে) পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করলেন।- (ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)

উল্লেখ্য, ১৯৭১-এ হোসেন আলী কোলকাতায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ডিপুটি হাই কমিশনার রূপে অবস্থান করছিলেন। তিনি সে পদ ছেড়ে মুজিব নগর সরকারে যোগ দেন। আওয়ামী সব সময়ই প্রচার চালিয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে যে বৈষম্য তা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি। তারা একটি বারের জন্যও বলেনি, এ বৈষম্য বিদ্যমান ছিল ১৯৪৭এ পাকিস্তান সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই। বাংলার মুসলমানেরা ছিল সমগ্র ভারতে সবচেয়ে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠি। অথচ ষাটের দশকে এসে তারা করাচী ও লাহোরের সাথে ঢাকার তুলনা করে। কিন্তু ১৯৪৭যে করাচী ও লাহোরের তুলনায় ঢাকার অবস্থাটি আদৌ তুলনা করার মত ছিল। ৪৭-এ ঢাকা ছিল একটি অনুন্নত জেলা শহর। আর করাচী ও লাহোর ছিল বহু বছরের পুরোন রাজধানী শহর। লাহোর বিখ্যাত ছিল মোগল আমল থেকেই। লাহোরের বিখ্যাত বাদশাহী মসজিদ, শালিমার গার্ডেন, বিশাল কেল্লা বা দূর্গ নগরী, সম্রাট আওরোঙ্গজেবের মাজার, নূরজাহানের মাজার- মোগল আমলে এ শহরটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে স্বাক্ষর বহন করে। ১৯৪৭এ লাহোর ও করাচীতে টিনের চালার নীচে সেক্রেটারিয়েটে দফতর খুলতে হয়নি। অথচ আওয়ামী লীগের সমর্থকগণ করাচী ও লাহোরে গিয়েই পাটের গন্ধ আবিস্কার করতো। যেন পশ্চিম পাকিস্তানের শহরগুলো গড়ে উঠেছে পাটের অর্থে। পাকিস্তান হওয়ার আগে কি তারা টিনশেডে অফিস বসাতো?

ষাটের দশকে এসে বলা হয় সেনা বাহিনীতে বৈষম্যের কথা। অথচ ১৯৪৭ সালে যে হিমালয় তুল্য বৈষম্য ছিল সে কথা বলে না। এবং সে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। অথচ সে ব্রিটিশ আমলকে দোষারপ না করে আওয়ামী বাকশালী দায়ভার চাপায় পাকিস্তানের উপর। ১৯৪৭-এ মেজর পদমর্যদার উপরে কোন বাঙ্গালী অফিসার ছিল না। সেটিও মাত্র এক জন। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে ছিল জেনারেল। তাদের ছিল বহু ব্রিগেডিয়ার ও কর্ণেল। বলা হয় প্রশাসনে উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাঝে বৈষম্যের কথা। অথচ সেটিও ছিল আকাশচুম্বি, ১৯৪৭-এর পূর্ব থেকেই। ৪৭-এ হিন্দু অফিসারদের দেশ ত্যাগের মহা সংকটে পড়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার। রেলগাড়ী চালানোর ড্রাইভারও ছিল না। তখন ভারত থেকে আগত মোহাজির দিয়ে অফিস আদালত, রেল, পোষ্ট অফিসসহ নানা সরকারি দফতর চালাতে হয়েছে। তারা একটি বারের জন্যও এ কথা বলে না,

১৯৪৭এ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বিশাল বৈষম্য নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করেছিল।

১৯৪৭এ অধিকাংশ ডিসি, পুলিশ কর্মকর্তা, রেলকর্মচারী অবাঙ্গালী হলেও ১৯৭০এ চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। প্রায় সবগুলো জেলাতেই তখন বাঙালী অফিসার। এমন কি ১৯৭১এ ইসলামাদে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারিয়েটে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ কর্মচারিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানী। ১৯৭১ ঢাকার পতনের পর যে প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়েছিল তারা নিশ্চয়ই সেখানে হকারি বা দিনমুজুরি করত না। তাদের বেশীর ভাগই ছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারি বা সামরিক বিভাগের লোক। এমন কি লন্ডন ও নিউয়র্কের পাকিস্তানের দূতাবাদগুলোতে প্রায় অর্ধেক কর্মচারী ছিল বাঙালী। সে চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন ড. সাজ্জাদ হোসেন। তিনি লিখেছেন,

“লন্ডনে যেমন দেখছিলাম দূতাবাসের কর্মচারী প্রায় অর্ধেক বাঙালী, নিউয়র্কে তাই এবং সম্ভবতঃ বাঙালী কর্মচারীদের অনুপাত এখানে আরেকটু বেশী ছিল। --অনেক বাঙালী শিক্ষকও এ্যাডহক এ্যাপয়েন্ট পেয়ে রাতারাতি ডিপলোমেট পদে উন্নীত হন। বার্মায় পাকিস্তানের প্রথম এ্যামবেসেডর ছিলেন বগুড়ার সৈয়দ মোহম্মদ আলী। তিনি পরে ওয়াশিংটনে এ্যামবেসেডর নিযুক্ত হন। (ইনিই পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন।) বার্মায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত যিনি হন তিনি ঢাকার আর্মানিটোলা হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক কমর উদ্দিন আহম্মদ। পরে এই কমর উদ্দিন আওয়ামী লীগে যোগ দেন। এবং লিখেন, পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের সামাজিক ইতিহাসে ইসলামের বিশেষ স্থান নেই।”- (ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)

বৃটিশ শাসনের ১৯০ বছরে পূর্ব বাংলায় আন্তর্জাতিক মানের কোন বড় শহরই ছিল না। ছিল কিছু মফস্বলের জেলা শহর। একটি জুটমিলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৪টি বস্ত্রকল ছিল। সেগুলো হল ঢাকা জেলার চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, লক্ষীনারায়ন কটন মিলস, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস এবং কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস। ছিল ৪টি চিনি কল। এগুলো হল, কুষ্টিয়া জেলার দর্শনার কেরু কোম্পানী, রাজশাহী জেলার গোপালপুরের উত্তরবঙ্গ সুগার মিলস, রংপুরের মহিমগঞ্জ সুগার মিলস এবং সেতাবগঞ্জের

ইষ্টবেঙ্গল সুগার মিলস। সবে ধন নীলমণি এই ক'টি মাত্র মিল ছাড়া এ অঞ্চলে আর কোন শিল্পকারখানাই ছিল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাত্র ২৩ বছরে এ এলাকায় ৭৬টি জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। আদমজী জুটমিল ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাটকল। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৯টি। এগুলোর সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হয় অনেক গুলো ইস্পাত কারখানা, ঔষধের কারখানা, রাসায়নিক শিল্প ও চামড়া ও জুতার কারখানা। ..১৯৭০ সালে যে শিল্পোৎপাদন ছিল সেটি বাংলাদেশ আমলে ১৯৮০ সালেও অর্জিত হয়নি। - (এস. মুজিবুল্লাহ, ইত্তেফাক ৩/০৯/৮০)

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে তুলনা করলে শিল্পোন্নয়নের এ হার অন্যদের চেয়ে খুব একটা খারাপ ছিল না। বরং কোরিয়ার মত দেশের সাথে তখন পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছিল পাকিস্তান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শিল্প খাতে উন্নয়নের স্থলে এসেছে প্রচন্ড ধ্বস। আদমজী জুটমিলসহ বহু বড় বড় মিল ধ্বংস হয়ে গেছে। মোহিনী মিলসহ বহু কাপড়ের মিলগুলিতে লেগেছে তালা। ১৯৪৭-এর আগে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনে পূর্ব পাকিস্তানী এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র একটি। সেটি ঢাকায় এবং অতি ছোট আকারের। ছিল না কোন সামুদ্রিক বন্দর। ছিল না কোন মেডিকেল কলেজ, কৃষি ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়। ছিল না কোন আলিয়া মাদ্রাসা। ছিল না কোন উন্নত মানের ক্যান্টনমেন্ট। পাকিস্তান আমলের মাত্র ২০ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৭টি বিশাল আকারের বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ একাত্তরের পর, বাংলাদেশের বিগত ৩৭ বছরের ইতিহাসে সে মাপের বিশ্বাবিদ্যালয় একটিও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যা হয়েছে অতি ছোট মাপের; খুলনা, কুষ্টিয়া ও সিলেটে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি তার উদাহরণ। পাকিস্তান আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানের বিশাল আকারের ৭টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। প্রতিষ্ঠিত হয় বড় বড় ক্যাডেট কলেজ ও রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেকগুলি ক্যান্টনমেন্ট। নির্মিত হয়েছে দুটি সামুদ্রিক বন্দর। ঢাকা শহরে কোন বড় আকারের বিল্ডিং ছিল না। ছিল না কোন আন্তর্জাতিক মানের হোটেল। বড় আকারের কোন মসজিদও ছিল না। জাতীয় সংসদ, কমলাপুর স্টেশন, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, শাহবাগ হোটেল, শেরাটন হোটেল, হাইকোর্ট বিল্ডিংসহ শহরের বড় বড় এমারতগুলো গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান আমলেই। অথচ করাচী, লাহোর, এমনকি

পেশাওয়ারও ছিল ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকেই ছিল প্রাদেশিক রাজধানি। পাঞ্জাব ও করাচী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যে বৈষম্য ছিল সেটি পাকিস্তান আমলের সৃষ্ট ছিল নয়- এ কথা বলার জন্য কি তাই গবেষণার প্রয়োজন আছে? সে বৈষম্য ছিল বহু শত বছরের পুরনো। অথচ আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা এ বৈষম্যের জন্য ষোল আনা দায়ী করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে। তবে সে সত্য তারা নিজেরা না বললে কি হবে, সেটি বেরিয়ে এসেছে এমনকি বহু ভারতীয় হিন্দু সাংবাদিকের মুখ থেকে। সে উদাহরণ দেওয়া যাক। একাত্তরের পর আব্দুল গাফফার চৌধুরি ঢাকা থেকে নব্য প্রকাশিত "দৈনিক জনপদ" নামের একটি পত্রিকায় কলাম লিখতেন। তিনি লিখেছিলেন,

১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর কোলকাতা থেকে কিছু সাংবাদিককে হেলিকপ্টারে তাড়াহুড়া করে ঢাকায় পাঠানো হয়। কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিকের সাথে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরিও ছিলেন। তাঁর সাথের ভারতীয় সাংবাদিকগণ ঢাকায় নেমে অবাক। তারা আব্দুল গাফফার চৌধুরি জিজ্ঞেস করেছিলেন,

"দাদা, আপনি আপনাদের কোলকাতাকে দেখেছেন। কোলকাতায় যা কিছু গড়া হয়েছে সেগুলি ১৯৪৭ এর আগে। ১৯৪৭ য়ের পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার খুব কমই যোগ করেছে। আপনাদের ঢাকায় তো অনেক কিছু হয়েছে। এরপরও আপনারা কেন স্বাধীন হলেন?"

অধ্যাপক আবু জাফর লিখেছেনঃ

"দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হল আমি কোলকাতা চলে যাই।.. আমরা গেলাম কোলকাতা বেতারে। দেবদুলাল বন্দোপ্যাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন থেকে পত্র- যোগাযোগ ছিল। .. বেতার থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম কবি বুদ্ধদেব বসুর বাসাতে। .. বুদ্ধদেব এবং প্রতিভা বসু দু'জনার কাছে আমরা আশাতীত ভাবে সমাদৃত ও আপ্যায়ীত হলাম। ..বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহল খুব স্বাভাবিক কারণেই সীমাহীন। আর আমরা এরকম দু'জন উন্মুখ ও উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আমরা দুইজন সহযাত্রী অবিরল ভাবে স্বাধীনতা- যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে চলেছি। কিন্তু হঠাৎ একটু ছন্দপতন

ঘটলো। কথার ফাঁকে বুদ্ধদেব বললেন, কী এমন হল যে তোমরা হঠাৎ পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাইছো। তোমাদের কত দিকে কত উন্নতি হচ্ছিল, ভালোই তো ছিলে। আমরাও তে দিল্লীর অনেক অন্যায়- অবিচারের শিকার, তাই বলে কি আলাদা হয়ে যাবো?- (আমার দেশঃ আমার স্বাধীনতা, পাক্ষিক পালাবদল)

বাংলাদেশের শিল্পায়নের তিনটি যুগঃ ব্রিটিশ, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী। কথা হল, যদি খোদ শেখ মুজিবকে বা অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতাকে জিজ্ঞেস করা হত, বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসে কোন আমলে সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে দ্রুত শিল্পায়ন হয়েছে? যদি এ প্রশ্নও করা হত, কোন আমলে সবচেয়ে বেশী কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সেটি বাংলাদেশী বা ব্রিটিশ আমলে এ কথা বললে তাঁকে কি কেউ মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ বলত? অথচ আওয়ামী লীগ মহলটি বাংলাদেশের এ যুগটিকেই চিত্রিত করছে পাঞ্জাবের ঔপনিবেশিক শাসনামল রূপে।

অধ্যায় ৬: পাকিস্তানপন্থিদের আত্মঘাতি ভূমিকা

পাকিস্তানের ব্যর্থতার জন্য শুধু দেশটির শত্রুরাই দায়ী নয়, দায়ী মিত্র বা শুভাকাঙ্খীরাও। পাকিস্তানপন্থি ও ইসলামপন্থিদের রাজনীতিও কি কম আত্মঘাতি? রোগী অনেক সময় মারা যায় রোগের কারণে নয়, চিকিৎস্যকের ভূল চিকিৎসার কারণে। পাকিস্তানের ক্ষতিটা হয়েছে দুই পক্ষ থেকেই। পাকিস্তানের মূলে সর্ব প্রথম যে কুড়ালটি আঘাত হানে তা হল ভাষা আন্দোলন। আন্দোলন শুরু করে তমুদ্দন মজলিসের মত একটি সংগঠন যা দেশে মুসলিম তাহজিব ও তামুদ্দনের কথা বলে। ইসলামি চেতনার কথাও বলে।কথা হল,আন্দোলনের জন্য দিন- ক্ষণ কি যথার্থ ছিল? শত্রুর ষড়যন্ত্রের শিকার পাকিস্তান তার ক্ষতবিক্ষত- জিন্নাহর ভাষায় পোকায় খাওয়া- দেহ নিয়ে সবে মাত্র যাত্রা শুরু করেছে, তখনও দেশটি নিজের ঘর গুছিয়ে নিতে পারেনি। সমাধান হয়নি দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার। ওদিকে মরণ কামড় দিতে ওঁত পেতে বসে ছিল প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্রটি। আর তখনই শুরু হল এ বিশাল আন্দোলন। রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি গুরুতর, বিশ্বের বহু দেশে এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বছরের পর বছর ধরে চিন্তাভাবনা হয়। রাজপথ উত্তপ্ত না করে এক উত্তেজনামূক্ত পরিবেশে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করেন, নিজেদের মাঝে মতের আদান প্রদানও করেন।

অথচ তমুদ্দন মজলিশ ও তার সেকুলার মিত্ররা এ নিয়ে সময় দিতে রাজী হয়নি। চিন্তাভাবনার চেয়ে তারা রাজপথে গোলযোগ সৃষ্টির পথ বেছে নেয়। গুরুত্ব পায় লাশের রাজনীতি। এবং সে সুযোগও তারা পেয়ে যায়, তৎকালীন সরকারের ভূল পলিসির কারণে। অথচ সংসদে বা আলাপ-আলোচনার টেবিলে সহজেই এ সমস্যার সমাধান বের করা যেত। পাকিস্তান যদি চিহ্নিত শত্রুর সাথে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে, তবে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি কেন নিজেদের মাঝে আলাপ- আলোচনায় সমাধান করা যাবে না? আসলে ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য যে নিছক বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া ছিল না, বরং তা ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এবং সেটি পরে প্রমাণিতও হয়। ফলে এ আন্দোলনের সাথে অতি সক্রিয় হয়ে পড়ে সেসব বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা, যারা ১৯৪৭- এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচন্ড বিরোধীতা করেছিল। বাংলাদেশে

সেকুলার পক্ষটির এখন স্বীকার করে,ভাষা আন্দোলন থেকেই পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজের শুরু। অর্থাৎ সে সময়ে পাকিস্তানের শাসকবর্গের যে আশংকা ছিল সেটিই সঠিক ছিল। ভাষা আন্দেলনটি ছিল রুগ্নদেহে খোঁড়ায়ে চলা পাকিস্তানের গায়ে এক প্রচন্ড ধাক্কা যা পরবর্তীতে দেশটির জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।ভাষা আন্দোলনের শুরু তমুদ্দন মজলিসের দ্বারা হলেও তারা সে আন্দোলনের নেতৃত্ব পাকিস্তানের শত্রুদের হাতে তুলে দেয়। মুসলিম উম্মাহর জীবনে ফিতনা তথা গোলযোগ যে মানবহত্যার চেয়েও জঘন্য সেটি আবারো প্রমাণিত হল। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

“ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতল” অর্থঃ গোলযোগ হল হত্যার চেয়েও গুরুতর।”– (সুরা বাকারা, আয়াত ১৯১)

মহান আল্লাহ তাই গোলযোগের নির্মূলে অতি কঠোর হতে বলেছেন, এমনকি গোলযোগ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন। ঘূর্ণিঝড়ে বা মহামারীতে কয়েখ লাখ লোকের মৃত্যু হলেও মুসলিম উম্মাহর এতবড় ক্ষতি হয় না। অথচ ফেতনা বা গোলযোগের মধ্য দিয়ে রচিত হয় একটি দেশের মৃত্যু। ভূলুন্ঠিত হয় মুসলিম উম্মাহর স্বপ্নসাধ। আর পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটিই হয়েছিল। এবং সে গোলযোগ সৃষ্টিতে বরাবরই অতি পারদর্শীতা দেখিয়েছে আওয়ামী- বাকশালী চক্র। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানে যে আত্মঘাতি রূপ নেয়, ভারতে তেমনটি ঘটেনি। অথচ সে সমস্যাটি আরো জটিল ছিল ভারতে। কিন্তু সেটি নিয়ে সমস্যা দানা বাঁধে আর দেরীতে। ভাষার প্রশ্নিটি সেদেশে যখন তুমুল আকার ধারণা করে, ভারত তখন তার মেরুদন্ড শক্ত করে নিয়েছে। এবং সেটির সহনশীল উপায়ে একটি সমাধানও বের করে। ভাষা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা শুরুর সাথে সাথে সেখানকার নেতারা ভাষা আন্দোলনের নামে স্বাধীনতা- পরবর্তী দূর্বল সরকারকে লাল কার্ড দেখায় নি। দেশ জুড়ে হরতাল ও ধর্মঘটের ন্যায় অরাজকতাও সৃষ্টি করেনি। যেটি পূর্ব পাকিস্তানে হয়েছে। যেন পাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষার বিষয়টি ছাড়া আর কোন জটিল সমস্যাই ছিল না। অথচ দেশে তখন সরকারের ঠিকমত বসার জায়গাই ছিল না। সারা ভারতের জনগণ হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে মেনে নেয়। মেনে নিয়েছে পশ্চিম বাংলার বাঙালীরাও। মেনে নিয়েছে দক্ষিণ ভারতের লোকেরা। অথচ এ ভাষার সাথে দক্ষিণ ভারতের লোকদের সম্পর্ক নাই বল্লেই চলে। প্রথমে তারা হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে মেনে নেওয়ার বিরোধীতা করলেও

অবশেষে এ নিয়ে কোন লংকা কান্ড বাধায়নি, যা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটেছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটি ছিল ভারতীয় ছাত্র- জনতা- বুদ্ধিজীবীর অতি ঐতিহাসিক বিচক্ষনতা, যা পাকিস্তানের কপালে জোটেনি। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত। নইলে ভাষার সমস্যা নিয়ে যেমন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেল সেটি ভারতের কপালেও হতে পারত। অনরূপ এক বিচাক্ষনতাই উত্তর আমেরিকায় জন্ম দিয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যা আজ বিশ্বের একমাত্র বিশ্ব শক্তি। অথচ সেখানে অনেক গর্বিত জনগণের বাস। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ডাচ, স্পেনীশসহ নানা ভাষাভাষির গর্বিত মানুষ তাদের নিজ নিজ ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী ছেড়ে ইংরাজীকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহন করে। অথচ প্রত্যেকটি ভাষারই রাষ্ট্র ভাষার হওয়ার যোগ্যতা ছিল। এতে তাদের নিজেদের ভাষা যে মারা গেছে তা নয়।

আজও পাকিস্তানের প্রায় ষাট ভাগ মানুষের ভাষা পাঞ্জাবী। কিন্তু সংখ্যার জোরে যদি পাঞ্জাবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা রূপে চাপিয়ে দেওয়া হত তবে আজকের অবিশিষ্ট পাকিস্তানও কি টিকে থাকত? তখন সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচরা কি সেটি মেনে নিত? পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার মধ্য দিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবীদের কল্যাণ, দেশটির ভাঙ্গার মধ্যে দিয়ে নয়। অথচ বাঙালীদের মনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার গর্ব এতটাই প্রবল ছিল যে সে আমলে অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ উর্দুর বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী তুলেছেন। এবং ভাষার গর্ব নিয়ে অবশেষে তারা পাকিস্তানকেই ভেঙ্গে ফেলল। ভাষার ইতিহাসে অতি প্রাচীনতম ঐতিহ্যের দেশ হল মিশর, এ ক্ষেত্রে তারা ইরানের চেয়েও ছিল অগ্রসর। কিন্তু নিজ ভাষাকে ছেড়ে আরবীকে গ্রহন করায় তারা আজ বিশাল আরব বিশ্বের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা। কিন্তু ভাষার গর্ব নিয়ে থাকায় ইরানীরা আজ সমগ্র মুসলিম জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হল, এ আন্দোলনের নামে প্রচুর মিথ্যাচার হয়েছে। দেশ জুড়ে প্রচুর ঘৃণা ও বিষ ছিটানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের মাঝে রটিয়ে দেওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীর মায়ের ভাষা ও মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে চায়। যেন উর্দু রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার কারণে পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচদের মায়ের ভাষাকে তাদের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যেন

ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি হওয়ার কারনে বাংলা ভাষা পশ্চিম বাংলায় আবর্জনার স্তুপে গিয়ে পড়েছে। অথচ এ কথা বলা হল না যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর এ অভিযোগ চাপানো হচ্ছে তাদেরও মাতৃভাষা উর্দু নয়। এরূপ নিরেট মিথ্যা নিয়ে বাংলায় কত গান, কত কবিতা, কত ছড়া ও গল্প লেখা হল। তৈরী হল সিনেমা। এত বিষ, এত ঘৃণা ও এত মিথ্যাচার নিয়ে একটি জাতি কি এক সুস্থ্য থাকতে পারে? এর পরিণাম কি পরস্পরের ভূল বুঝাবুঝি ও বিভেদ নয়? এরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের জোয়ারে ভেসে যায় বাঙালী-অবাঙালী মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃসুলভ শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা। দেওয়ালের সিমেন্ট খসে পড়লে দেওয়াল ভাঙ্গতে কি মেহনতের প্রয়োজন পড়ে? জনগণের মাঝে তেমনি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত হলে সে দেশ ভাঙ্গতে কি বেগ পেতে হয়? ভাষা আন্দোলন সে কাজটিই করেছে।

একটি দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের মূল দায়িত্ব হল, জনগণের মাঝে সিমেন্ট লাগানোর কাজ করা। একতা সৃষ্টির এমন কাজ ইসলামে পবিত্র ইবাদত। এবং বিভেদ সৃষ্টির যে কোন কাজই হারাম। অথচ ভাষা আন্দোলনের নামে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল সিমেন্ট সরানোর কাজে। ভাষা শুধু এ নয় যে, সে ভাষায় কেবল কথা বলা হবে। সাইনবোর্ড, রায় বা দলিল লেখা হবে। বরং প্রতিটি ভাষাকে এর চেয়ে আরো অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। নইলে সে ভাষার লোকদের ব্যর্থতা ও বিশ্বজুড়া অপমানের সীমা থাকে না।সে ব্যর্থতা মানুষ রূপে বেড়ে উঠায়। ভাষার সে বাড়তি ও অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল, জনগণের মনে পুষ্টি জোগানো। সভ্যতর ভাবে বাঁচবার লক্ষ্যে উচ্চতর দর্শন জোগানো। জাতিতে জাতিতে মন ও মননে যে দারুন তারতম্য সৃষ্টি হয় তা তো এ জীবন দর্শনের কারণেই। নবীজী (সাঃ) আরবের মানুষের খাদ্যতালিকা বা পোষাক- পরিচ্ছদে কোন পরিবর্তন আনেননি। তাঁর আগমনে আরবের আবহাওয়া বা জলবায়ুতেও কোন পরিবর্তন আসেনি। পরিবর্তন এনেছিলেন তাদের জীবন দর্শনে বা বাঁচবার ফিলোসফিতে। আর এতেই আরবদের ইতিহাস পাল্টে গেল। সে মরুভূমিতে জন্ম নিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, সভ্যতা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সে মূল উপাদান তথা ফিলোসফিটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং সে জীবন দর্শনটি ছিল ইসলাম। ভাতে- মাছে ও ফলে- মূলে একটি জাতির দৈহিক ভাবে বাঁচাটি নিশ্চিত হলেও সে বাঁচার মধ্য দিয়ে সভ্যতা নির্মিত হয়

না। উচ্চতর সংস্কৃতিও গড়ে উঠেনা। পাপুয়া নিউগিনির আদিবাসীদের অনেকেই দৈহিক বলে ইউরোপীয়দের চেয়েও শক্তিশালী। কারণ, সে দেশের বনে জঙ্গলে ফলমূল ও শিকারযোগ্য জন্তুর এখনও অভাব পড়েনি। কিন্তু মনের পুষ্টিতে তাদের দৈন্যদশা এতটাই প্রবল যে, এখনও রয়ে গেছে প্রাচীন প্রস্তর যুগে। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিগত হাজার হাজার বছরেও সামনে এগুয়নি।

একটি জাতির দৈহিক মান বুঝা যায় তাদের খাদ্য তালিকা দেখে, আর সভ্যতার মান বুঝা যায় ঘরের বই বা পাঠ্য তালিকা দেখে। পাঠ্যতালিকায় মহাজ্ঞানী আল্লাহর গ্রন্থ আল- কোরআন স্থান পেলে সভ্যতা যে মান নিয়ে বেড়ে উঠে সেটি কি পুথিঁ- পাঠে আর কবিতা বা গানের চর্চায় সম্ভব? ইসলামের আগমনে বিপ্লব এসেছিল আরবদের পাঠ্য তালিকায়। “হে বিধাতা, সাত কোটি প্রাণীরে রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করনি।” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালীর ব্যর্থতা নিয়ে যে খেদাক্তি করেছেন, সেটি বাঙালীর শারীরীক ভাবে বেড়ে উঠায় ব্যর্থতার কারণে নয়। সে আফসোস, মন ও মননে বেড়ে উঠার ব্যর্থতার কারণে। দ্রুত সভ্যরূপে বেড়ে হওয়ার গরজেই মিশরীয়রা তাদের পাঠ্যতালিকা থেকে তাদের নিজ দেশের প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্য ও ভাষা বাদ দিয়ে কোরআন ও তার ভাষাকে গ্রহণ করেছিল। এজন্য তাদেরকে কেউ বাধ্যও করেনি। অথচ তারা পিরামিড নির্মাণ, কাগজ আবিস্কার, উন্নত বস্ত্র নির্মাণ, ভাষার বর্ণ ও লিখন রীতি আবিস্কারে বিশ্বের অধিকাংশ জাতি থেকে বহু হাজার বছর এগিয়ে ছিল। একই পথ ধরেছিল সিরিয়ান, ইরাকী, আলজিরিয়ান, মরোক্কান, লিবিয়ান ও সূদানীরাও। পাকিস্তানের পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধি ও বেলুচরা উর্দুকে গ্রহণ করেছে তো একই কারণে। কারণ উর্দু ভাষা গড়ে উঠেছিল বহু শত বছর ধরে সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এ ভাষাটির উন্নয়নে হাজার হাজার বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও আলেম শতাধিক বছর ধরে কাজ করেছে। এজন্যই আরবী ভাষার পরেই ইসলামী জ্ঞানের দিক দিয়ে উর্দুর স্থান। কিন্তু বাংলা ভাষায় সে কাজটি হয়নি। পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন বাংলা ভাষায় কোন তফসির গ্রন্থই ছিল না। অনূদিত হয়নি কোন হাদীস গ্রন্থ। রচিত হয়নি মানসম্মত নবীজী(সাঃ)র জীবনী- গ্রন্থ। ইসলামী সাহিত্য বলতে যা বুঝাতো তা হল মীর মোশাররফ হোসেন রচিত বিষাদ সিন্ধু ও কিছু পুঁথি

সাহিত্য। কোরআন চর্চা বলতে যা হত, তা মূলতঃ অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত। এ দিয়ে কি একটি জাতি ইসলামি চেতনা পায়? পায় কি মনের পুষ্টি?

বাংলা সাহিত্য মূলতঃ গড়ে উঠেছিল হিন্দু সাহিত্যিকদের দ্বারা। মুসলমানদেরকে তারা বাঙালী রূপেও গণ্য করত না। যেমন শরৎ চন্দ্র চট্টপাধ্যায় লিখেছেন, "আমাদের স্কুলে আজ বাঙালী ও মুসলমানদের মাঝে খেলা"। তাঁর এই একটি মাত্র বাক্যেই ফুটে উঠেছে সে আমলে বাঙালী রূপে কাদেরকে বুঝানো হত তার এক বাস্তব চিত্র। হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত বই পড়ে নিছক বাঙালী রূপে বেড়ে উঠা যায়, কিন্তু তা দিয়ে পাকিস্তান বাঁচে না, মুসলমান রূপে বেড়ে উঠার কাজটিও হয় না। এ বিষয়টি অন্ততঃ সেদিন কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝেছিলেন। উর্দুকে তারাই রাষ্ট্র ভাষা বানাতে চেয়েছিলেন। তারা সে চিন্তাটি করেছিলেন বাঙ্গলী মুসলমানের মন ও মননকে ইসলামি চেতনায় সমৃদ্ধ করার প্রেরণা থেকে। অথচ হুজুগে- মাতা বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও তরুনেরা তাদের সে সদ্দিচ্ছার গভীরে যাওয়ারই কোন চেষ্টাই করেননি। তারা ভেসে গেছে আবেগের জলে। তাদেরকে তারা চিত্রিত করেছে বাংলা ভাষার শত্রু রূপে। এটি ছিল তাদের নিয়তের উপর হামলা।

অপর দিকে যারা শুরু থেকেই পাকিস্তান ও প্যান- ইসলামি চেতনার বিরোধী, তারা এটিকে এক মোক্ষম সুযোগ রূপে গ্রহণ করে। মুসলিম চেতনা একটি উন্নত ভাষা থেকে পুষ্টি পাক সেটি আদৌ তাদের কাম্য ছিল না। প্রবল প্লাবনের পানিতে শুধু শিকড়হীন কচুরিপানাই ভাসে না, ভাসে বহু অগভীর শিকড়ের গাছপালাও। তাই সেদিন সেকুলারিস্টদের সৃষ্ট ভাষা আন্দোলনের প্লাবনে ভেসে গেছেন বহু ইসলামী চেতনার মানুষও। মিশরের মানুষ যদি প্রাচীন ফিরাউনী সাহিত্য ও সে সময়ের ভাষাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেন তা হলে কি তারা কোরআনের সান্নিধ্যে আসতে পারতেন? আরবী ভাষা থেকে মিশরীয় যেমন লাভবান হয়েছে তেমনি আরবী ভাষাও লাভবান হয়েছে মিশরীয়দের থেকে। আধুনিক যুগে আরবী ভাষায় বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি আনার কাজে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের অধিকাংশই মিশরীয়। একসময় মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব ছিল ইরানীদের হাতে। বড় বড় বিজ্ঞানী ও মনিষীর জন্ম হয়েছিল ইরানে। তাদের অবদানের কথা স্বীকার করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খলদুন লিখেছিলেন, ইসলামের জন্ম আরবে, কিন্তু

ইসলামি সভ্যতার জন্ম ইরানে। তখন ইসলামি বিশ্বের সাথে তাদের সংযোগের মাধ্যম ছিল আরবী। ইবনে সিনা, আল রাযী, ফারাবী, তাবারী, গাজ্জালীর ন্যায় ইরানী মনিষীগণের লিখনীর ভাষা ছিল আরবী। ইমাম আল গাজ্জালী একমাত্র কিমিয়ায়ে সা'দাত ছাড়া সমুদয় বই লিখেছেন আরবীতে। ইরানের কবিরাও কবিতা লিখতেন আরবীতে। আরবী ভাষার কারণে ইরানীরাও সে সময় জ্ঞান- বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করেছিল। কারণ, তখন আরবী ছিল জ্ঞান- বিজ্ঞানের ভাষা। পরবর্তীতে সে সংযোগ ছিন্ন করা হয়। এবং এর কারণ ছিল নিছক রাজনৈতিক। সেটি ছিল আরব ও ইরানীদের মাঝে একটি স্থায়ী দেওয়াল খাড়া করার প্রয়োজনে। প্রখ্যাত ইরানী কবি রুদাকী আরবী ভাষায় কবিতা লিখতেন। তিনি ছিলেন সভাকবি। তাকে রাজা নির্দেশ দেন আরবীতে কবিতা না লিখতে। বলা যায়, মুসলিম বিশ্বে ইরানই সর্বপ্রথম জাতিয়তাবাদী দেশ। তাই মুসলিম বিশ্ব থেকে ইরানের আজ যে বিচ্ছিন্নদশা সেটির শুরু আজ নয়, সেদিন থেকেই। বাংলা ভাষা আন্দোলনের নেতারাও তেমনি উর্দু ও উর্দুভাষীদের বিরুদ্ধে একটি দেওয়াল খাড়া করতে চেয়েছিলেন এবং তাতে তারা সফলও হয়েছেন।

ভাষার কাজ শুধু কথা বলা বা মনের ভাব প্রকাশে সাহায্য করা নয়। তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও মিটাতে হয়। পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের সে প্রয়োজন মিটাতে বাংলার পাশাপাশি হিন্দি এবং ইংরেজীও শিখতে হয়। ইউরোপীয়দেরও শিখতে হয় কয়েকটি ভাষা। বিলেতের স্কুলগুলোতে তাই ইংরেজীর পাশাপাশী ফ্রেঞ্চ, স্পেনীশ, জার্মান, এমনকি উর্দু, আরবী, তুর্কী, হিন্দিসহ আরো অনেক ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। একই কারণে, বাংলাদেশের আনাচে কাঁনাচেও আজ ইংরাজী মিডিয়াম স্কুল খোলার এত হিড়িক। একই কারণে, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী সন্তান যারা বিদেশে অবস্থান করছে তারা বাংলা ভুলে বিদেশী ভাষায় রপ্ত হচ্ছে। তাই অখন্ড পাকিস্তানের বাংলার পাশাপাশি উর্দু শেখারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখন যুক্তি দেখানো হয়েছিল, বাঙালী কিশোর মনের এত সামর্থ নেই যে তারা আরেকটি নতুন ভাষা শিখবে। অথচ এ অভিমত আদৌ জ্ঞানভিত্তিক ছিল না, ছিল উর্দুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত। পাকিস্তানপন্থিদের ব্যর্থতা, তারা রাজনীতি করেছেন নিছক ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম রূপে। অথচ মুসলমানের রাজনীতি হল আল্লহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ইবাদত। এটি হল, নেক

আমলের বিশাল ক্ষেত্র। অথচ এ ইবাদতকে তারা পরিণত করেছিল নিছক একটি পেশায়। ছিল না দূরদৃষ্টি। রাজনীতির ময়দান তারা যতটা না সরগরম করেছেন, ততটা বুদ্ধিবৃত্তির ময়দান নয়। অথচ পাকিস্তান ছিল একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ফসল।

দেশের জনগণকে দৈহিক ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য চাই, তেমনি মনের সুস্থ্যতার লক্ষ্যেও লক্ষ লক্ষ বই চাই। মুসলমানদের মুসলমান রূপে টিকিয়ে রাখতেও প্রচুর বই চাই। ইসলামে জ্ঞানার্জন তাই ফরয করা হয়েছে। কোরআনের আগে আরবী ভাষায় কোন গ্রন্থ ছিল না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম মনিষিগণ প্রচুর বই লেখেন, গড়ে তুলেন জ্ঞানের বিশাল সমুদ্র। অথচ সে কাজ পাকিস্তানে তেমন হয়নি। যে হারে কল-কারখানা গড়া হয়েছে সে হারে পুস্তকের প্রকাশনা হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে কিছু কাজ হলেও পূর্ব-পাকিস্তানে সে তুলনায় কিছুই হয়নি। মুসলিম লীগের নেতারা পত্রিকা বের করেছেন, অথচ সে পত্রিকায় লেখালেখি করেছে ইসলাম ও পাকিস্তানের দুষমনেরা। তারা ব্যর্থ হয়েছেন একতার রাজনীতি করতে। একতা অন্যদের কাছে রাজনৈতিক কৌশল, কিন্তু মুসলমানের কাছে এটি ইবাদত। রাজনীতি হল, পরস্পরে আপোষ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালনার বিজ্ঞান। একতা ও সমঝোতার পথ বেয়েই আসে মহান আল্লাহর রহমত। ১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বিহার, আসাম, সীমান্ত প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশসহ সারা ভারতের মুসলমানেরা একতাবদ্ধ হয়েছিল বলেই আল্লাহপাকের রহমত নেমে এসেছিল। আল্লাহর সে রহমতের বরকতেই সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ মুসলিম রাষ্ট্রটি। সমাজতান্ত্রিক চেতনা ছাড়া কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচে না। রাজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও বাচেঁ না। তেমনি প্যান-ইসলামিক চেতনা ছাড়া পাকিস্তানের পক্ষে বেঁচে থাকাটিও অসম্ভব ছিল। কিন্তু সে হুশ মুসলিম লীগ নেতাদের ছিল না। যারা এদেশটির প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিল তারা সে অতি গুরত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়েও যথেষ্ট গাফলতি দেখিয়েছেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ১৯৪৬ সালের মতই আরেক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। পাকিস্তানের সমর্থকেরা সেটি বুঝতে না পারলেও শত্রুরা সেটি ঠিকই অনুধাবন করেছিল।ফলে এ নির্বাচনে পাকিস্তান বিরোধী সকল সেকুলার দলগুলি একতাবদ্ধ হয়েছিল। এবং আওয়ামী লীগ লড়েছিল

সবার পক্ষ থেকে। কিন্তু সেরূপ একতাবদ্ধ হতে পারিনি ইসলামপন্থি দলগুলি। সে দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মুসলিম লীগ বিভক্ত থেকেছে তিন টুকরায়। জামায়াতে ইসলামী, নিজামে ইসলামী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর মত ইসলামি দলগুলোও একত্রিত হতে পারেনি। সকল পাকিস্তানপন্থি দলগুলো একতাবদ্ধ হলে ৭০এর নির্বাচনের রায় হয়ত ভিন্নতর হত। বরং অনৈক্যের মধ্য দিয়ে তারা পা বাড়িয়েছেন আত্মঘাতের দিকে। এত বিভক্তিতে কি কোন কল্যাণ হয়? নেমে আসে কি আল্লাহর রহমত? আসে নি। বরং যেটি এসেছে সেটি অপমান।

অধ্যায় ৭: পাকিস্তানের ঘরের শত্রু

আওয়াম লীগের নেতৃত্বে যারা আসীন ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে পাকিস্তানকে শুরু থেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। যদিও তারা একসময় মুসলিমের লীগের নেতা ছিলেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন এবং মন্ত্রীরূপে পাকিস্তানের সংহতি বহাল রাখার জন্য পবিত্র কোরআন শরিফ ছুঁয়ে বা আল্লাহর নামে কসম খেয়েছেন। পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বরাবরই তীব্র ক্ষোভ ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তান হল ১৯৪০ সালের গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের সাথে গাদ্দারীর ফসল। এ ধরণের নেতাদের সেরূপ মানসিকার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এ গ্রুপের প্রধান বুদ্ধিজীবী জনাব আবুল মনসুর আহমদের লেখায়। তিনি লিখেছেনঃ "মুসলিম লীগ ৪৬ সালে নির্বাচনে ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভোট নিয়া নির্বাচনে জিতিবার পরে গুরুতর ওয়াদা খেলাফ করিলেনঃ লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত পূর্ব-পশ্চিমে দুই মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের বদলে পশ্চিম-ভিত্তিক এক পাকিস্তান বানাইলেন।" (আবুল মনসুর আহম্মদ, ১৯৮৯)

অর্থাৎ তার মতে অতি অপরাধ হয়েছে এক পাকিস্তান বানিয়ে। পাকিস্তানকে বলেছেন পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পাকিস্তান। পাকিস্তান-এর প্রতি এ গভীর বীতশ্রদ্ধা নিয়ে কেউ কি সে দেশের মঙ্গল করতে পারে। অথচ আবুল মনসুর আহম্মদ সাহেব নিজে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হয়েছেন।

কথা হল, তারা যে মন্ত্রী হয়েছেন সেটি কি নিছক ক্ষমতার মোহে ও আখের গুছানোর তাগিদে?

এটা ঠিক, লাহোর প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার পাকিস্তান ভূক্তির কথা ছিল না। কিন্তু তিনি ভূলে গেছেন, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানভূক্ত করা হয় অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম সদস্যদের ভোটে। কায়েদে আযম বা অন্য কোন অবাঙালী নেতা বাঙালী মুসলমানদের উপর সে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়নি। সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি সম্মেলনে।সেখানে বাংলার পাকিস্তান ভূক্তির পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী এবং সে প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হয়। পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসের জন্য যেটি অপরিহার্য ছিল সেটি প্যান-ইসলামিক চেতনা। মনের ভূবন এ চেতনায় সমৃদ্ধ না হলে তার কাছে অপর ভাষা ও অপর দেশের মুসলমান নিতান্তই বিদেশী গণ্য হয়। অথচ একজন মুসলমান অন্য এক মুসলমানকে ভাই জ্ঞান করবে সেটিই আল্লাহর প্রত্যাশা। আল্লাহতায়ালা তাঁর কোরআনে মুসলানদেরকে সেভাবেই চিত্রিত করেছেন। এ চেতনাটিই একজন মুসলমানকে বেঈমান থেকে পৃথক করে। এই চেতনাতেই বিশ্বে নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মুসলমানদের মধ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত দেওয়াল সৃষ্টি হয়। এই চেতনা নিয়ে তারা একত্রে রাষ্ট্র নির্মাণ করে,রাজনীতি করে এবং প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে। মুসলমানের এমন একতা যে মহান আল্লাহতায়ালার কাছে কত প্রিয় সেটি তিনি পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে,

“ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্লাযীনা ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি সাফফান কা আন্নাহুম বুনিয়ানুন মারসুস”।

অর্থঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা সে সব লোকদের ভালবাসেন যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে সীসা ঢাকা দেওয়ালের ন্যায় অটুট একতা নিয়ে”।

কিন্তু আওয়ামী লীগ গঠিত হয়েছিল এমন লোকদের দিয়ে যাদের অধিকাংশই ছিল সেকুলার চেতনার। সে সেকুলার চেতনায় প্যান- ইসলামী তথা বিশ্ব- মুসলিম ভাতৃত্বের চেতনা গণ্য হত সামপ্রাদায়ীকতা রূপে,ফলে দলটিতে তেমন চেতনা ছিল নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়। ফলে সে চেতনার চর্চায় বা

প্রসারে তাদের সামান্যতম আগ্রহও ছিল না। বরং তাদের সকল প্রয়াস ছিল এ চেতনার বিনাশে। তাদের রাজনীতিতে ভোটের চিন্তাটাই ছিল বড়,সে চিন্তাতে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে তারা মুসলিম শব্দটি কেটে দিয়েছিল। এতে হিন্দু ভোট পাওয়ার পথটি পরিস্কার হয়ে যায়। এভাবে দলটি শুধু হিন্দু ভোটের দিকেই শুধু ঝুঁকেনি, ঝুকেঁছে হিন্দুস্থানের দিকেও। অপরদিক পরিকল্পিত ভাবে ঘৃণা সৃষ্টি করেছে পাকিস্তানের নেতা ও জনগণের বিরুদ্ধে। কারণ হিন্দুদের ভোট ও হিন্দুস্থানের সাহায্য পাওয়ার জন্য তারা এটিকে জরুরী মনে করতো। নিজেদের ঘরোয়া মিটিংগুলোতেই শুধু নয়, আওয়ামী লীগের নেতা ও বুদ্ধিজীবীগণ সে ঘৃণা প্রকাশ করতেন নিজেদের লেখনীতেও। নিজেদের লেখণীতে বা বক্তৃতায় তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে ভাই না বলে স্রেফ পশ্চিমা বলে উল্লেখ করতেন, এভাবে জাহির হত নিজের মনের গভীরে লুকানো বিষপূর্ণ প্রছন্ন ঘৃণা। এটি যে সাধারণ কর্মীদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারাও।

আওয়ামী লীগ শিবিরে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানের গুরু ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। এমন ঘৃণা অহরহ প্রকাশ পেত তার লেখনিতে। অথচ মুসলমান হিসাবে অপর মুসলমানকে - তা তিনি যে ভাষা, যে বর্ণ বা ভূগোলেরই হোন না কেন - তাকে ভাই বলে সম্বোধন করা শুধু ইসলামি আদব কায়দাই নয়, ঈমানী দায়িত্ববোধও। সে সামান্য আদবটুকুও তারা দেখাতে পারেননি। বরং এরূপ ঘৃণাপূর্ণ আচরণের প্রকাশকে তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতেন। আবুল মনসুর আহমেদের রচিত “আমাদের দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর”-এ এমন ঘৃণাবোধের প্রকাশ ঘটেছে অসংখ্য বার। আওয়ামীকর্মীরা যেমন অবাঙালীদের ছাতু বলেছেন,আর আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন পশ্চিমা। এটিই হল স্বভাবসুলভ আওয়ামী শালীনতা বা ভদ্রতা। ইংল্যান্ডে কালো ব্যক্তিকে কালো বা নিগার বলা ফৌজদারী অপরাধ। এটি চিত্রিত হয় রেসিজম বা বর্ণবাদ। আর ইসলামে কাউকে এমন নামে ডাকা হারাম যা ঐ লোকটির কাছে অপছন্দের। তাই ছাতু বলা বা পশ্চিমা বলাতে কি কোন পশ্চিম পাকিস্তানি খুশি হতে পারেন? অথচ অওয়ামী- বাকশালী নেতা- কর্মীগণ যত্র- তত্র ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করেছেন। এ ঘৃণাকে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীগণ শুধু দলীয় অফিস, গৃহে বা কেতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, সেটিকে তারা অবাঙ্গালীদের জানমালের উপরও প্রয়োগ করেছেন। এ লক্ষ্যে

তারা আদমজী জুট মিলে অবাঙ্গালী নিধনে দাঙ্গা বাধিয়েছেন। দাঙ্গা বাধায় সাধারনতঃ দূর্বত্ত প্রকৃতির অপরাধীরা। কোন রাজনৈতিক দল ও তার নেতারা সেটি ভাবতেও পারে না। কারণ রাজনীতি তো মানব কল্যাণের ব্রত। কি আওয়ামী লীগ সেটিকেও রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। রাজনীতির নামে এভাবে তারা প্রচন্ড পাপের চর্চা বাড়িয়েছেন। এভাবে তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙ্গালীদের পুঁজি বিণিয়োগের পথ বন্ধ করেন। কারণ, পুঁজি চায় নিরাপত্তা। পশ্চিম পাকিস্তানী বিণিয়োগকারীগণ তখন বুঝলেন, যে দেশে তাদের জানেরই নিরাপত্তা নেই সেদেশে তাদের পুঁজি নিরাপত্তা পাবে কি করে? ফলে যে দেশটি শিল্পোন্নয়নে তৃতীয় বিশ্বে রিকর্ড গড়ছিল, পরিকল্পিত ভাবে সেখানে স্থবিরতা আনা হল। উল্লেখ্য ৬০- এর দশকে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নের উপর একটি প্রচ্ছদ- নিবন্ধ ছেপেছিল। সে প্রবন্ধে দুটি দেশকে তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নমুখী দেশ রূপে চিহ্নিত করেছিল। এর একটি হল কোরিয়া, অপরটি পাকিস্তান। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পাকিস্তান সে অগ্রগতি ধরে রাখতে পারিনি, কিন্তু কোরিয়া পেরেছে।

একাত্তরের পর দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে শেখ মুজিব ভারতের জন্য প্রতিযোগিতামূক্ত নিরাপদ বাজার সৃষ্টি করিছিলেন,কিন্তু সেটির শুরু তিনি করেছিলেন পাকিস্তান আমল থেকেই। অবাঙ্গালী বিণিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, ভয়ভীতি, চাঁদাবাজী এসব ছিল তার মোক্ষম অস্ত্র। কথা হল, পাকিস্তান ছিল বহু এলাকার ও বহু ভাষাভাষি মানুষের দেশ। এমন সংকীর্ণ ও ঘৃণাপূর্ণ মনের রাজনীতিবিদগণ কি এমন একটি দেশের নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্যতা রাখে? প্যান- ইসলামিক চেতনার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতাদের মন- মগজ যে কতটা বিষর্পূণ তার একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। এবং এটি এ লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৬৯ সালের কথা। তখন ইয়াহিয়া খানের আমল। পাকিস্তান সরকারের নীতিনির্ধারেকরা অবশেষে উপলব্ধি করে, যে প্যান- ইসলামি চেতনার ভিত্তিতে উপমহাদেশের বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি,পাঠান ও অন্যা ভাষাভাষি মুসলমানগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিল সে চেতনাটিই দ্রুত দূর্বল হয়ে যাচ্ছে। দেশটির সংহতির বিরুদ্ধে বড় বিপদ এখানেই। প্যান ইসলামী চেতনার অভাবে অসংখ্য শত্রু বেড়ে উঠছে নিজ ঘরেই। পূর্ববর্তী

সরকারগুলোয় যারা ছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন মনে প্রাণে সেকুলার। তারা এসেছিলেন দেশের সবচেয়ে রেডিক্যাল সেকুলার ইনস্টিটিউশন যেমন আর্মি, আওয়ামী লীগ ও বুরোক্রাসী থেকে। তারা ইসলামি চেতনার বিকাশে কোন কাজই করেননি। এ চেতনার উপর তাদের নিজেদেরও কোন বিশ্বাস ছিল না।

বিপদ যখন ঘরের দরজায় তখন কিছু ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ ব্যক্তি এটিও অনুধাবন করে যে, দেশের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার পাঠ্য বই ছাত্রদের মনে এ চেতনার সৃষ্টি বা বৃদ্ধিতে কোন পুষ্টিই জোগাচ্ছে না, বরং উল্টোটি করছে। ইতিমধ্যে দেশ ছেয়ে গেছে ভারতীয়, রুশ ও চীনা বই- পুস্তক ও পত্র- পত্রিকা। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত ঘিরে ভারত বসিয়েছে শক্তিশালী অনেকগুলি রেডিও সম্প্রচারকেন্দ্র। এ্যায়ার মার্শাল নূর খান তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। নতুন প্রজন্ম যাতে ইসলামি চেতনা ও পাকিস্তানের ইতিহাস নিয়ে সম্যক ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠে সে লক্ষ্যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। পাকিস্তানঃ ইতিহাস ও কৃষ্টি নামে একটি বইও স্কুলের পাঠ্যসুচী করে। কিন্তু এতে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ। ছাত্র লীগ নূর খান শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক প্রতিবাদ সভা ডাকে। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন শেখ মুজিবর রহমানের ভাগিনেয় শেখ ফজলুল হক মনি। তখন বিভিন্ন সংগঠনের সাধারণ ছাত্র সভা হত এ মধুর ক্যান্টিনে। শেখ ফজলুল হক মনি অনেক কথাই বল্লেন। তবে যে বিষয়টির উপর তিনি জোর দিয়ে বললেন তা হল,

"নূর খান শিক্ষানীতির লক্ষ্য এ দেশে প্যান- ইসলামিক চিন্তার বিকাশ। বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদী চেতনার বিরুদ্ধে এটি এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাই ছাত্রলীগ এ শিক্ষানীতি মেনে নিবে না। এ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আমাদের দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।"

শেখ মনি বুঝতে ভূল করেননি, প্যান- ইনলামী চেতনা আর জাতিয়তাবাদী চেতনা এক সাথে চলতে পারে না। একটি প্রবল হলে অন্যটি বিলুপ্ত হতে বাধ্য। আর বাংলাদেশে প্রবলতর হচ্ছিল বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদী চেতনা। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সম্মিলিত ভাবে তুমুল ছাত্র আন্দোলন গড়ে

তুলে নূর খান শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে। সে বছরই (১৯৬৯ সালে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে (টিএসসি) নূর খান শিক্ষানীতির উপর আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে ছাত্রলীগসহ আরো অনেক ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা নিজ নিজ অভিমত তুলে ধরে। নিজ মত তুলে ধরেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র জনাব আব্দুল মালেকও। তিনি যা বলেছিলেন তা নূর খান শিক্ষা নীতির পক্ষে। তিনি তার মাশূলও দিয়েছিলেন। তার বক্তৃতা শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ করতে দেয়া হয়নি, বক্তৃতা চলা কালে প্রচন্ড হাঙ্গামা শুরু করেছিল ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা। শুধুমাত্র নিজ মত তুলে ধরার কারণে এই নিরস্ত্র মেধাবী ছাত্রকে সোহরাওয়ার্দ্দী (সাবেক রেস কোর্স) ময়দানে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আব্দুল মালেক ছিলেন ইসলামি ছাত্র সংঘ নামক একটি সংগঠনের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি। সে সময় ঢাকার বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানটি যে কতটা সন্ত্রাস কবলিত ছিল এ হল তার নজির। এবং আওয়ামী- বাকশালীরা চক্র যে কতটা ফ্যাসীবাদী ছিল, সেদিন সে স্বাক্ষরও তারা রেখেছিল। তবে এমন ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসী চেতনায় যে শুধু আওয়ামী- বাকশালী নেতা- কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছিল তা নয়, চরম ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল ঢাকার মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবী মহল। ফলে এতবড় একটা হত্যাকান্ড দিনদুপুরে সংঘটিত হওয়ার পরও তা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকুলার বুদ্ধিজীবী মহলে ও মিডিয়াতে সামান্যতম আলোড়নও সৃষ্টি হয়নি। ভাবটা এমন, যেন ঢাকাতে কিছুই ঘটেনি এবং তারা কিছুই দেখেনি। সে সময় ঢাকা- কেন্দ্রীক বুদ্ধিবৃত্তি যে কতটা আত্মঘাতের শিকার হয়েছিল এ হল তার নমুনা। পাকিস্তানের ইতিহাস ও কৃষ্টির উপর যে নতুন বইটিকে সরকার পাঠ্য তালিকাভূক্ত করেছিল, সেটির বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এমন তুমুল ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে যে সরকার সে বইটি তুলে নিতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগ,ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ন্যায় সেকুলার সংগঠনগুলির কাছে পাকিস্তান ও তার ইতিহাস জানা যে কতটা অপ্রিয় হয়ে পড়েছিল এ হল তার নমুনা। অথচ এরাই পাকিস্তানে ইসলামী দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চার জন্য জিদ ধরেছিল। প্রশ্ন হল, নিজ দেশে এত শত্রু থাকতে সে দেশ ভাঙ্গতে কি বিদেশী শত্রুর প্রয়োজন হয়?

অধ্যায় ৮: যে গাদ্দারী দ্বি- জাতি তত্ত্বের সাথে

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে মূল দর্শন ও যুক্তিটা ছিল দ্বি- জাতি তত্ত্ব। যার মূল কথা, মুসলমানগণ হিন্দুদের থেকে এক পৃথক জাতি। তাদের নাম ও নামকরণ পদ্ধতিই শুধু আলাদা নয়, আলাদা হল তাদের জীবন- লক্ষ্য, তাহজিব তামুদ্দন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং এ জীবনে সফলতা ও বিফলতা যাচাইয়ের মানদন্ড। মুসলমান ও হিন্দু - এ দুইটি জাতি যেমন এক লক্ষ্যে বাঁচে না, তেমনি একই লক্ষ্যে রাজনীতিও করে না। মুসলমানের বাঁচবার মূল লক্ষ্যটি হল, সর্বকাজে আল্লাহকে খুশি করা। এ জন্যই ভিন্ন হল, মুসলমানের রাজনৈতিক এজেন্ডাও। এবং সে এজেন্ডাটি হল আল্লাহর দ্বীন তথা বিধানকে সর্বস্তরে বিজয়ী করা। এজন্যই রাজনীতি তার কাছে কোন নেশা নয়, পেশাও নয় বরং ইবাদত। এটি জ্বিহাদ। আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করতে গিয়ে নবীজী (সাঃ) কে ৫০- এর বেশী যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাই শুধু নামাযা- রোযা, হজ্ব- যাকাত পালন করলেই পরিপূর্ণ ইবাদত হয় না। তাকে জীবনের প্রতি মুহুর্ত ও প্রতি ক্ষেত্রকে আল্লাহর অনুগত করে দিতে হয়। কোরআনের বিধান তাই শুধু মসজিদে পালন করলে চলে না, সে বিধানকে রাষ্ট্র- পরিচালনা, বিচার- আচার ও শিক্ষা- সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হয়। প্রতিকর্মে মেনে চলতে হয় আল্লাহর বিধানকেও। নামায- রোযা- হজ্ব- যাকাতের ন্যায় ইবাদতগুলি যেরূপ অমুসলিমদের সাথে একত্রে চলে না, তেমনি চলে না তার রাজনৈতিক ইবাদতও।

দুইটি ট্রেন যখন দুই ভিন্ন ধরনের যাত্রী নিয়ে ভিন্ন গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে, সে দুটি ভিন্ন ট্রেনকে কি এক ও অভিন্ন বলা যায়? বিষয়টি অবিকল অভিন্ন জাতিসত্ত্বা নির্ধারেণর ক্ষেত্রেও। মুসলমানগণ তাই সর্বাত্রেই ভিন্ন জাতি, সেটি ভিন্ন জীবনবোধ ও জীবন- লক্ষ্যের কারণে। নামায আদায়ে ভিন্ন জামাত, ভিন্ন নেতা ও ভিন্ন ইবাদতগাহ গড়তে হয়। তেমনি রাজনৈতীক ইবাদতের জন্যও মুসলমানের ভিন্ন জামাত, ভিন্ন নেতা এবং সম্ভব হলে ভিন্ন দেশ বেছে নিতে হয়। এজন্যই মুসলমানও পারে না অমুসলমানের রাজনীতির সাথে একাত্ব হতে। তাই মুসলমানগণ শুধু এক খন্ড ভূখন্ডের জন্য রাজনীতি করে না, সে লক্ষ্যে রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করে না। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য শুধু এ নয়,সেখানে নিছক জান- মাল, ঘর- বাড়ী, ব্যাবসা- বাণিজ্য ও অর্থনীতি

নিরাপত্তা পাবে। বরং তারা রাষ্ট্র চায় এ জন্য যে, সেখানে আল্লাহতায়ালার বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারবে। দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনসংখ্যা অমুসলিম হলে সে লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব হয়। অসম্ভব হয় পরিপূর্ণ মুসলমান রূপে বেড়ে উঠা। এমন দেশে অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জিম্মিদশা নেমে আসে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবনে। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও তেমনি এক জিম্মিদশায় ভুগছে আজকের ভারতীয় মুসলমানগণ। মুসলমানগণ সেখানে এতটাই নিরাপত্তাহীন যে, হাজার হাজার মুসলমানকে জ্বালিয়ে মারা হলেও নূণ্যতম অধিকার নেই ন্যায় বিচারের। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে ভারতীয় মুসলমানদের সে জিম্মিদশায় যোগ হত আরো তিরিশ কোটি মুসলমান। ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয় তো একারণেই। সেটির পক্ষে মূল যুক্তি বা দর্শনটি ছিল দ্বি-জাতিতত্ত্ব। সে সময় মুসলমানগণ আওয়াজ তুলেছিল, "পাকিস্তানে কা মতলব কিয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এ যুক্তিটি এতই শক্তিশালী ছিল যে এমনকি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকেরা তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ সরকার দেয় পৃথক নির্বাচন। যার ফলে মুসলমান এমপি নির্বাচিত হয় মুসলিম ভোটে। এতে মুসলমানের রাজনীতিতে গুরুত্ব পায় মুসলিম স্বার্থের প্রতি অঙ্গিকার । ফল দাঁড়ায়, মুসলিম প্রার্থীগণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মানুক আর নামুক, মুসলমানদের কাছে নিজেকে ধর্মভীরু রূপে পেশ করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। মিষ্টারও তখন হাজির হয় মৌলবী রূপে। নেতাদের পোষাক-পরিচ্ছদেও কোট-প্যান্ট-টাইয়ের পরিবর্তে পাজামা-শেরওয়ানি-টুপি ও মুখে দাড়ী গুরুত্ব পায়। মুসলিম লীগের নেতাদের মুখ দিয়ে তখন ধ্বনিত হতে থাকে, "কোরআনই আমাদের শাসনতন্ত্র" এবং "আল্লাহর দেওয়া আইনই আমাদের আইন"। ভারতীয় মুসলমানগণ তখন দেখতে পায় ইসলামের নতুন জাগরণের সম্ভাবনা।
দেখে, হারানো দিনের গৌরব ফিরে পাওয়ার। এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশে এমনকি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল ভারতীয় কংগ্রেসও আবুল কালাম আজাদের ন্যায় একজন মাওলানাকে সভাপতি করে। চল্লিশের দশকের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দীর্ঘ চার বছর তাঁকে সে পদে রাখে। সে সময় কংগ্রেস পেশ করেছিল, হিন্দু-মুসলিম মিলিত এক অভিন্ন ভারতীয় জাতিয়তাবাদের তত্ত্ব। তাদের মুল কথা ছিল, ভারতে বসবাসকারি সকল হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণ প্রথমে ভারতীয়, তারপর ধর্মীয়

পরিচিতি। কংগ্রেস এ নীতিকে পরিচিত করেছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে।

১৯৪৬ সালে নির্বাচন হয়েছিল মূলতঃ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে - পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ইস্যুতে। মুসলমানগণ সেদিন বিপুল পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয় এবং প্রত্যাখান করে কংগ্রেসের পেশ করা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের সাথে গাদ্দারী। সেটি শুরু হয় মুসলিম লীগের সাবেক নেতাদের দ্বারা। তাদের এ নীতির পিছনে কোন দর্শন ছিল না,ছিল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধীতায় প্রথম সারিতে ছিলেন মাওলানা ভাষানী ও সোহরাওয়ার্দ্দী প্রমুখ। অথচ ১৯৪৬ সালে তারা নিজেরাও হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের কথা বলতেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই তাঁদের নীতিতে আসে প্রচন্ড ডিগবাজি। মাওলানা ভাষানী নামে মাওলানা হলেও তাঁর অঙ্গিকার বাড়ে চীনের নেতা মাও সে তুঙয়ের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি। তিনি রাজনীতির ছাতা ধরেন চীনপন্থি সমাজতন্ত্রিদের আশ্রয় দিতে। বহু জনসভা, বহু অনশন,বহু মিছিল তিনি করেছেন, কিন্তু একটি বারও আল্লাহর আইন শরিয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করেননি। অথচ এটিই মুসলমানের রাজনীতির মূল এজেন্ডা।আর সেটিই বাদ পড়েছিল তার রাজনীতি থেকে। এরপরও তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন মাওলানা রূপে। তিনিই প্রথম নেতা যিনি হিন্দুদের সাথে সুর মিলিয়ে পৃথক নির্বাচনের বিলোপের দাবী তুলেন। পাকিস্তান ধ্বংসের এটি ছিল প্রথম ষড়যন্ত্র। কারণ পৃথক নির্বাচন ছাড়া পাকিস্তানের জন্ম যেমন সম্ভব ছিল না,তেমনি সম্ভব ছিল না এদেশটিকে বাঁচিয়ে রাখাও। নবীজীর (সাঃ) আমলে এবং তার পরবর্তীতে খোলাফায়ের রাশেদার আমলে মুসলিম দেশে বহু অমুসলিমও বাস করত। কিন্তু কে হবে খলিফা বা কি হবে আইন-আদালত ও রাজনীতি সেটি মুসলমানরাই নির্ধারিত করেছেন। অমুসলমানদের তারা জানমাল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পূণ্য নিরাপত্ত দিয়েছেন, কিন্তু ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেননি।মুসলিম উম্মাহর জীবনে প্রতিটি রাজনৈতিক ফয়সালাই গুরুত্বপূর্ণ,এর উপর নির্ভর করে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও পরাজয়ের বিষয়টি। তাই এ ফয়সালায় ভেজাল চলে না। কিন্তু মাওলানা ভাষানী ইসলামের সে মূল শিক্ষাকে মানেননি। তার

রাজনীতিতে আল্লাহকে খুশি করার চেয়ে গুরুত্ব পায় হিন্দু,সেকুলারিস্ট,নাস্তিক ও কম্যুনিষ্টদের খুশি করার বিষয়টি। বস্তুতঃ তাদের পক্ষ হয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মূল খেলাটি শুরু করেন তিনিই প্রথম। পরবর্তীতে শেখ মুজিবসহ আরো অনেকে সেটিকেই ষোলকলায় পূর্ণ করেন। মুসলিম লীগ ভেঙ্গে মাওলানা ভাষানীই আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ায় নেতৃত্ব দেন। শুরুতে আওয়ামী মুসলিম লীগের নীতিতে যুক্ত নির্বাচনের দাবী ছিল না। কিন্তু ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান দল রূপে আবির্ভূত হলেও দলটি সরকার গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ক্ষমতা পায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দল শেরে বাংলার কৃষক- শ্রমিক- প্রজা দল। যাদেরকে সমর্থন দেয় সংখ্যালঘু সদস্যগণ। আওয়ামী লীগ নেতাগণ তখন বুঝতে পারে, সংখ্যালঘুদের দলে টানতে না পারলে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া অসম্ভব। ফলে মৌলিক পরিবর্তন আসে তাদের নীতিতে। তারা দাবী তুলে পৃথক- নির্বাচন প্রথা বাতিলের। সোহরাওয়ার্দ্দী প্রথমে রাজী না হলেও পরে তিনি আত্মসমর্পন করেন ভাষানীর কাছে। তখন ভাষানীই ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি। পরে আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিম শব্দটিও তাদের কাছে অসহ্য হয়ে পড়ে। ১৯৫৫ সালে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে আয়োজিত অধিবেশনে মুসলিম নামটিকে তারা আবর্জনা স্তুপে ফেলে। আওয়ামী মুসলিম লীগ তখন পরিণত হয় আওয়ামী লীগে।

১৯৫৬ সালের ৭- ৮ ফেব্রেয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারি - বর্তমানে সন্তোষ- এ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগকে সেকুলার দল হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ইসলাম এবং মুসলিম স্বার্থের প্রতি যে অঙ্গিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান, সে অঙ্গিকারটি চিত্রিত হয় সামপ্রদায়িকতা রূপে। এভাবে আওয়ামী লীগের ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের স্বার্থপর রাজনীতিতে মুসলিম ও ইসলামের প্রতি অঙ্গিকার শুধু অসহনীয়ই নয়, বর্জণীয় রূপে গণ্য হয়। পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি বিপদসংকেত বেজে উঠে তখন থেকেই। সেকুলারিজমকে তাঁরা সংজ্ঞায়ীত করে ধর্ম- নিপরপেক্ষতা রূপে। অথচ মুসলমান হওয়ার অর্থই হল রাজনীতিসহ জীবনের প্রতিটি অঙ্গণে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের পক্ষ নেওয়া। আল্লাহতায়ালার উপর ঈমানের অর্থই হল, ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি প্রবল অঙ্গিকারবদ্ধতা। নিরপেক্ষতা এ ক্ষেত্রে হারাম।মানুষ যত দল বা জাতিতেই বিভক্ত হোক না কেন,মহান

আল্লাহতায়ালার কাছে মানুষের শ্রেণী বা দল মাত্র দুইটি। একটি আল্লাহর দল,আরেকটি শয়তানের। হাবিল ও কাবিল থেকে শুরু করে মানব- ইতিহাসের সর্বযুগ জুড়ে এ দুটি দলের সংঘাত। মুসলমান হওয়ার অর্থই হল পক্ষ নেওয়া,এবং সেটি মহান আল্লাহর পক্ষ। আল্লাহর পক্ষ নেওয়ার অর্থ হল ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ নেওয়া। তাই কোন মুসলমান ইসলাম ও মুসলিম প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ হয় কি করে? মহান আল্লাহ তো চান তার প্রতিটি বান্দাহ শুধু ইসলামের পক্ষই নিবে না, প্রয়োজনে যুদ্ধও করবে। পাকিস্তান তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানা ভাষাভাষি ভারতীয় মুসলমানদের সে লড়াকু অঙ্গিকারের বলেই। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেই শুধু নয়, এ দেশটির বেঁচে থাকারও মূল প্রাণশক্তি ছিল মুসলিম ও ইসলামের প্রতি গভীর অঙ্গিকার। এ প্রাণ শক্তি দূর্বল হলে পাকিস্তানের বেঁচে থাকার শক্তিটিও যে বিলুপ্ত হবে সে সত্যটি শত্রুদেরও অজানা ছিল না। ফলে ভাষানীর প্রতিষ্ঠিত সে সেকুলার আওয়ামী লীগের মধ্যে তারা পাকিস্তানের মৃত্যুর পয়গাম শুনতে পেল। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ এ মুসলিম দেশটির সৃষ্টিতে হিন্দু ও তাদের মিত্র সেকুলারিস্ট ও সোসালিস্টদের কোন ভূমিকা ছিল না, বরং প্রাণপণে তারা বিরোধীতাই করেছিল। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাচেঁ। তারা যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। এ দলটিতে তখন তারা দলে দলে যোগ দেয়। এভাবে ইসলামের প্রতিপক্ষ ১৯৪৭- এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগে নতুন মিত্র খুঁজে পায়।

নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের বীজ বপন করা হয়েছিল ঢাকাতে। সে ঢাকা নগরীতেই রোপণ করা হয় দেশটির ধ্বংসের বীজ। এবং সেটি ১৯৫৫ সালে সেকুলার আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সেটি প্রমাণ হয় ১৯৭১ সালে। যখনই পরিস্থিতি উপযোগী ভেবেছেন তখনই মাওলানা ভাষানী পাকিস্তান ভাঙ্গার গান গেয়েছেন। তিনিই সর্ব প্রথম পশ্চিম পাকিস্তানকে আস্সালামু আলাইকুম জানিয়ে দেন। এবং সেটি ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন পল্টন ময়দানে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায়। দ্বিতীয় বার জানান ১৯৫৬ সালে কাগমারী সম্মেলনে। সে সম্মেলনে তিনি গান্ধী, সুভাষবোস, চিত্তরঞ্জণ দাস প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের নামে তোরণ নির্মাণ করেছিলেন। যেন বাংলার মুসলমানদের কল্যাণে এসব হিন্দু নেতাদের অবদানই বেশী। তার তালিকায়

স্থান পাননি কায়েদে আযম, আল্লামা ইকবাল বা নবাব সলিমুল্লাহ। এমনকি নবীজী (সাঃ) বা খোলাফায়ে রাশেদারও কেউ নয়। তোরণ নির্মাণের মধ্য দিয়ে মূলতঃ তিনি জানিয়ে দিলেন তার কেবলা এখন কোন দিকে। এবং কারা তার আদর্শনীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তৃতীয়বার তিনি আর আস্সালামু আলাইকুম বলেননি, সরাসরি স্বাধীনতারই ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবং সেটি ১৯৭০- এ দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর। অথচ শেখ মুজিব তখনও নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। এই হল এক কালের মুসলিম লীগ নেতার কান্ড! দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, জ্বালাও- পোড়াও, ঘেরাও - এসবই ছিল তার রাজনীতি; কোরআনের পরিভাষায় যা হল ফিতনা। পবিত্র কোরআনে এমন গোলযোগ সৃষ্টিকে মানব- হত্যার চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে। কারণ কিছু মানবের নিহত হওয়ার কারণে একটি জাতির জীবনে ধ্বংস,পরাজয় বা বিপর্যয় আসে না। বাংলাদেশের ন্যায় কত দেশেই তো কত দুর্যোগ আসে। সে সব দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুও হয়। কিন্তু তাতে দেশ ধ্বংস হয় না। দেশ ধ্বংস হয় বা বিপর্যয়ের শিকার হয় আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের কারণে। আর মাওলানা ভাষানী ছিলেন এমন গোলযোগ সৃষ্টির গুরু। তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিজ দল ন্যাপের পক্ষ থেকে কোন প্রার্থীই দেননি। তার দলীয় সমর্থকগণ ভোট দিয়েছে তাঁরই সাবেক দল আওয়ামী লীগকে। অপর দিকে তিনি মিত্রতা গড়েছেন পাকিস্তানে রাজনীতি আরেক ভিলেন জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে।

১৯৬৮ সালে আইউব খান গোল টেবিল বৈঠক ডেকে দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দাবী মেনে নেয়ায় রাজী হয়েছিলেন। তখন মহাসুযোগ আসে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের।দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের বিরোধীদল সমূহ সে দাবীতে আন্দোলন করছিল। সে সুযোগটিও তিনি এবং শেখ মুজিব বানচাল করে দেন। মাওলানা ভাষানী গোল টেবিল বৈঠকেই যোগ দেননি। বৈঠকের বাইরে থেকে তিনি জনাব ভূট্টোর সাথে মিলে জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন শুরু করেন। অপর দিকে শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বৈঠকে ৬ দফা দাবীতে অনড় থাকেন। অথচ গোল টেবিল বৈঠক সে দাবি পেশের জন্য উপযুক্ত ফোরামই ছিল না। স্বাধীন দেশে এমন দাবী বিষদ নিয়ে বিষদ আলোচনা হয় দেশের পার্লামেন্টে। কারণ এর সাথে জড়িত আইনের সংশোধনের বিষয়। এভাবে ব্যর্থ হয় গোল টেবিল বৈঠক, নেমে

আসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে আরেকবার সামরিক শাসন। মাওলানা ভাষানীর নীতি ভ্রষ্টতা আরেকবার প্রমাণিত হয় ১৯৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। তখন তিনি আইয়ুব খানকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে রাজনীতিতে হঠাৎ খামোশ হয়ে যান। সে নির্বাচনে আইয়ুবের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন কায়েদে আযমের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। তার পক্ষে তিনি কোন প্রচারণাই চালাননি। এ নিরাবতার কারণ রূপে তিনি নিজেই বলেছিলেন, মাও সে তুং তাঁকে তৎকালে চীনের ঘনিষ্ট বন্ধু আইউব খানকে বিব্রত করতে নিষেধ করেছিলেন। অথচ সে নির্বাচনটি পাকিস্তানের ইতিহাসে অতিগুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে সময় ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচিত হলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ হয়ত ভিন্নতর হত।

অধ্যায় ৯: ভারতীয় গুপ্তচরসংস্থা র'এবং মার্কিনী সিআইয়ের ভূমিকা

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নবাদের পরিকল্পনা হয় ভারতে। এ ব্যাপারে শুধু ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র'এর কর্মকর্তারারই শুধু মুখ খুলেনি, মুখ খুলেছে বাংলাদেশের বহু নেতাও। যেমন এক কালের নেতা ও পরবর্তীতে জাতীয় লীগ নেতা জনাব অলি আহাদ বলেন, “১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে ময়মনসিংহ নিবাসী রাজবন্দীদ্বয় আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু সৈয়দের নিকট হইতে আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিষয়াদী অবগত হই। ভারতে মুদ্রিত বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ময়মনসিংহ ও বিভিন্ন জেলায় বিতরণকালেই তাহারা গ্রেফতার হইয়াছিলেন।”-(অলি আহাদ) ইতিহাসের নামে যে মিথ্যাচার ছড়ানো হয়েছে তা হল, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশের সৃষ্টি মূলতঃ মুক্তিবাহিনীর অবদান। ভারতের নাম তারা সহজে মুখে আনতে চায় না। ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারগণ কে কথায় লড়াই করেছেন সে বিবরণ থাকলেও ভারতীয় বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য কোথায় কি ভাবে যুদ্ধ করলো তার সামান্য বিবরণও নেই। বিবরণ নেই ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনীর ভূমিকার। স্কুলের

পাঠ্যবইয়ে কোন উল্লেখ সে যুদ্ধে কতজন ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর অবদান অবশ্যই আছে, তবে তারাই মূল নয়।

সত্য হলো, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ৯ মাসে পুরা বাংলাদেশ দুরে থাক একটি জেলা, একটি মহকুমা বা একটি থানাও মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। মূল লড়াই লড়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনী। তবে ভারত শুরু থেকেই একটি মুসলিম দেশ ভাঙ্গার অপরাধ নিজ কাঁধে নিতে চায়নি। কারণ এটি আন্তর্জাতিক আইনের খেলাপ। তাছাড়া এমন কাজ তখন অন্যদেরও বৈধতা দিবে ভারত- ভাঙ্গার কাজে অংশ নেওয়ার। ইতিহাসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এ ভয়ে নিজেদের অর্থ, অস্ত্র ও লোকবলদ্বারা পরিচালিত পাকিস্তান ভাঙ্গার এ যুদ্ধকে বাঙ্গালীদের মুক্তিযুদ্ধ বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে র'এর কর্মকর্তাগণ কি ভাবেন সেটি দেখা দরকার। ভারতীর গুপ্তচর সংস্থা র'এর সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিষ্টার বি. রমন লিখেছেনঃ

"The R&AW's success in East Pakistan, which led to the birth of Bangladesh, would not have been possible without the leadership of Kao and the ideas of Nair,"- (B.Ramon, 2007)

মিষ্টার বি. রমন যা লিখেছেন তা থেকে একথা সুস্পষ্ট, র'এর সফলতাই জন্ম দেয় বাংলাদেশের। এবং সেটি সম্ভব হয়েছে তৎকালীন র'এর দায়িত্বশীল মি. কাউ ও মি নায়ারের সফল নেতৃত্ব ও পরিকল্পণার কারণে। বাংলাদেশের সেকুলার পক্ষটি র'এর ভূমিকার কথা মুখে আনে না। কারণ তারা নিজেরাও জানে এ সম্পৃক্ততা প্রকাশ পেলে আজ হোক কাল মুসলিম ইতিহাসে তারা কুলাঙ্গার রূপে চিত্রিত হবেই। কারণ ভারতের ন্যায় একটি শত্রুদেশের গুপ্তচর সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য সুনাম বয়ে আনে না। এজন্য ইসলামের যেসব চিহ্নিত শত্রুরা ইরাক, আফগানিস্তানে ও কাশ্মীরে আজ উৎসব ভরে গণহত্যা চালাচ্ছে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকার কথা তারা মুখেই আনে না। অথচ তাদের ভুমিকাই ছিল চুড়ান্ত। এ ব্যাপারে মিষ্টার বি. রমন তার বই The Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane'–তে লিখেছেনঃ

"The IB (Intellegence Bureau) before 1968 & the R&AW thereafter had built up a network of relationship with many

political leaders and government officials of East Pakistan. The networking enabled the R&AW and the leaders and officials of East Pakistan to quickly put in position the required infrastructure for a liberation struggle consisting of a parallel government with its own fighters trained by the Indian security forces and its own bureaucracy. .. The only sections of the local population, who were hostile to India and its agencies, were the Muslim migrants from Bihar." - (B.Ramon, 2007)

মিষ্টার বি. রমনের কথায় এটি সুস্পষ্ট, একাত্তরে যা ঘটেছে তার পরিকল্পনা একাত্তরে হয়নি। হয়েছে অনেক আগে। পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা আইবি এবং ১৯৬৮এর পর র' ষাটের দশকের শুরু থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। বিচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মচারিদের দিয়ে তারা বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং অবকাঠামো গড়ে তোলে। এমনকি ট্রেনিং দেওয়ার কাজও শুরু করে। একাত্তরে নয়, বরং তার আগে ১৯৬২ সালেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা Director of Intelelligence Bureau (DIB) জানতে পারে যে কোলকাতার ভবানীপুর এলাকার একটি বাড়ীতে - যা ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল সদর দফতর,সেখানে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা। - (মাসুদুল হক)

মিষ্টার বি. রমনের লেখা থেকে এটি প্রমাণিত হয়, পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট আদৌ মিথ্যা ছিল না। এ গোপন পরিকল্পনা মোতাবেক মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি রূপে দেখা ভারতের কাম্য ছিল না। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পিছনে তারা যে পুঁজি বিণিয়োগ করেছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গা, শেখ মুজিবকে অখন্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা নয়। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে মিষ্টার বি. রমনের কথা মত র' যেভাবে পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা এঁটেছিল তা কি সফল হত? তখন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ থেকে মুজিব ময়দানে একা খেলছিলেন না,খেলছিল আর অনেকেই। ছাত্রলীগের নেতৃপর্যায়ে এদের পাল্লাই ছিল ভারি। তাদের দায়িত্ব ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে তিনি র'এর সে পরিকল্পনা থেকে যেন একটুও বিচ্যুত না হন। বস্তুতঃ শেখ মুজিব তখন চলে

গিয়েছিলেন তাদেরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তখন তার পক্ষে র'এর কাছে কৃত ওয়াদা থেকে পিছুটান দেওয়ার সামান্য সুযোগও ছিল না। বহু আগেই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিল। মুজিবের কাজ ছিল বিনা প্রতিবাদে তাদের অনুসরণ করা। মুজিব সেটি করেছিলেনও। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আপোষে শেখ মুজিবের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ এতে আগ্রহ ছিল না ভারতের। আর ভারতের যাতে আগ্রহ নেই তাতে মুজিবেরই বা আগ্রহ সৃষ্টি হয় কি করে? ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সাথে মুজিবের আলোচনা এজন্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন আলোচনাকে তারা স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী মনে করে। এনিয়ে আওয়ামী- বাকশালী শিবিরে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এ বিষয়ে অতিশয় বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্গতি হলো তাদের, যারা মনে করে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে স্বৈরাচারি ইয়াহিয়ার ভূলের কারণে। যেন মুজিব ও তার আওয়ামী- বাকশালী চক্র পাকিস্তান রক্ষার জন্য দু'পায়ে খাড়া ছিল!

স্বৈরাচারি ব্যক্তির ক্ষমতায় আসা বা গণতন্ত্র- দুষমন দুর্বৃত্তদের রাজনীতির কর্ণধার হওয়া কোন দেশেই অসম্ভব নয়। বিশ্বের বহু দেশেই সেটি হয়।একাত্তরের পর বাংলাদেশে সেটি বার বার হয়েছে। কিন্তু সে জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ সে দেশের মানচিত্র কর্তনে হাত দেয় না। এমন কাজ একমাত্র বিদেশী দুষমনদের হাতেই হতে পারে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র- বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু হয় দেশটির প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এরপরও ধৈর্যের সাথে দেশ গড়ার চেষ্ঠা করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে জনাব নাজিমুদ্দিন, জনাব মোহম্মদ আলী বগুড়া ও জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী অপসারিত হয়েছেন, সামরিক আইন জারি হয়েছে এবং দেশের শাসনতন্ত্রও রহিত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুরা, সোহরাওয়ার্দি বা অন্য কোন নেতাই পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে নামেন নি। এমনকি চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ও নয়। কিন্তু একাত্তরে দেশের রাজনীতি আর দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের হাতে থাকে নি। সেটি দখলে চলে যায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র' এর হাতে। বি. রমনের বই The Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane' বা অশোক রায়না রচিত Inside R&AW সে কিচ্ছাতেই ভরপুর। ভারতের স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য হল, বিশ্বের দরবারে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভ। সে কথার স্বীকারোক্তি এসেছে মি. রমনের

বইতে। তিনি এক্ষেত্রে র'এর ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

An emerging power such as India, which is aspiring to take its place by 2020 among the leading powers of the world, has to have an external intelligence agency which has the ability to see, hear, smell and feel far and near. (B.Ramon, 2007)

১৯৬২ সালে চীনের হাতে অপমানজনক পরাজয়ের পর সে স্বপ্নে ভাটা পড়ে। এরপর ১৯৬৫এ পাকিস্তান পরাজিত করতে না পারায় সে পুরোন অপমান থেকেও পরিত্রাণ মেলেনি। এরপর মনযোগী হয় পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে। শেখ মুজিব মূলতঃ ব্যবহৃত হয়েছে সে লক্ষ্য পূরণে। তবে ভারতের লক্ষ্য নিছক পাকিস্তানের শক্তিহানী নয়, সেটি উপমহাদেশে মুসলমানদের শক্তিহানী। এজন্যই একাত্তরে পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া হাজার কোটি টাকার অস্ত্র বাংলাদেশের আর্মির হাতে পোঁছতে দেয়নি। সব কিছু কুড়িয়ে তারা নিজ দেশে নিয়ে যায়। তাদের ভয়, পাকিস্তানের ন্যায় বাংলাদেশেরও যদি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পায় তবে সে খড়গ তাদের ঘাড়ে পড়বে। তাই তারা বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই সতর্ক।ভারত চায় নিঃশর্ত আনুগত্য। তাই ভারতীয় আগ্রাসী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি হওয়াটাই অপরাধ। মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগ সেটি ভাল করেই বোঝে। একারণেই, আওয়ামী লীগ ভারতে মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে না। তারা নিশ্চুপ কাশ্মীরে ভারতীয় অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অধিকৃত কাশ্মীরকে বিতর্কিত এলাকা বললে কি হবে, আওয়ামী- বাকশালী মহল সেখানে ভারতীয় আধিপত্যবাদকেই জায়েজ বলে মেনে নেয়। ১৯৬২এর ১৩ অক্টোবর চীন ভারতকে কাশ্মীরের লাদাখ সীমান্ত থেকে তার সৈন্য অপসারণের দাবী করে। ভারত সে দাবী মেনে না নেওয়ায় ১৯৬২ এর ২০ই অক্টোবরে হামলা করে। ২০শে নবেম্বরের মধ্যে লাদাখ এলাকার দুই হাজার বর্গমাইল এবং তিব্বত সীমান্তের NEFA এলাকার প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করে নেয়। ২৮ শে অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি আইউব খানকে ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলে। কিন্তু তিনি তা করেননি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চীন তখনও মার্কিন বিরোধীতার কারণে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি।

পাকিস্তান সদস্য পদ লাভে চীনকে জোড়ালো সমর্থণ করে। পেশোয়ারের কাছে ছিল সিআইয়ের গোপন ঘাটি, সেখান থেকে CIA U-2 গোয়েন্দা বিমান পাঠাতো রাশিয়ার অভ্যন্তরে। পাকিস্তান সে ঘাঁটিও বন্ধ করে দেয়। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচন্ড ক্রোধ চাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। অপর দিকে ১৯৬২ সালে চীন- ভারত সীমান্তে যুদ্ধে চীনের হাতে পরাজয়ের পর ভারতও প্রতিশোধের পরিকল্পনা নেয়। এবং সেটি যতটা না চীনের বিরুদ্ধে তার চেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পরিকল্পনা নেয় পাকিস্তানের অঙ্গহানির। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা নেয় আইয়ুব খানের অপসারণের ও পাকিস্তানকে দূর্বল করার।- (মাসুদুল হক)

তখন র' এবং সিআইএ –উভয়েরই প্রয়োজন পড়ে রাজনীতির ময়দানে খেলোয়াড়ের। আর সে শূন্যতা পূরণ করে শেখ মুজিব। তখন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই পাকিস্তানের রাজনীতির ময়দানে তাকে খেলোয়াড় রূপে বেছে নেয়। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রেয়ারিতে লাহোরে আইয়ুব বিরোধী দলসমুহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে জনাব নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন এনডিএফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগ সে সম্মেলনে যোগ দেয়। তখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন পাঞ্জাবের নবাবজাদা জনাব নাসরুল্লাহ খান। এ সভায় শেখ মুজিব হঠাৎ করেই ৬ দফা পেশ করেন। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছের বিষয়টি বিস্ময়ের জন্ম দেয়। সাংবাদিক মাসুদুল হকের কাছে এক সাক্ষাতকারে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরি বলেন, ”লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে এমনকি লাহোরে গিয়েও এ সম্পর্কে মুজিব আমাদের সঙ্গে আলাপ করেননি। আমরা জানতাম না মুজিব এ ধরনের প্রস্তাব তুলবে।” -(মাসুদুল হক)

এর পর আওয়ামী লীগ ৬ দফাপন্থি এবং ৬ দফা বিরোধী দুই খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৭ জেলার মধ্যে ১৪ জেলা সভাপতি ৬ দফার বিরোধীতা করে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে। কিন্তু কে এবং কিভাবে ৬ দফা রচনা সে রহস্যের আজও সমাধা হয়নি। পাকিস্তানের গোয়ান্দা বিভাগ ডিআইবি এটিকে সিআইয়ের চাল হিসাবে মনে করে। ভাষানীপন্থি ন্যাপও সেটিই মনে করে। সে সময় ঢাকায় মার্কিন কনস্যাল জেনারেল ছিলেন মিষ্টার ব্রাউন। তিনি একই সাথে সিআইয়ের ষ্টেশন চীফেরও দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার সাথে শেখ

মুজিব ও ছাত্রলীগের একাংশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। সে সময় মার্কিন কনসালে আরেক কর্মকর্তা ছিলেন কর্নেল চিশহোস। চিশহোসের বাসায় মাঝে মাঝে পার্টি দেওয়া হত। এসব পার্টিতে বাছাই করা রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র নেতা ও পদস্থ বাঙ্গালী কর্মকর্তাদেও দাওয়াত দেওয়া হত। এভাবে একদিনে ভারতীয় র'এর তৎপরতা যেমন চরম আকার ধারণা করেছিল তেমনি তৎপরতা বেড়েছিল মার্কিন সিআইয়ের। পরে পাকিস্তান সরকার কর্নেল চিশহোসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং দেশ থেকে বহিস্কার করে দেয়। পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা এ,টি,এস,সফদর জানান,

শেখ মুজিব তাকে বলেছিলেন তেজগাঁও বিমান বন্দরে লাহোরগামী বিমানে উঠার আগে ৬ দফা প্রস্তাবের একটি টাইপ করা কপি রুহুল কুদ্দুস নামে একজন সিএসপি অফিসার তার হাতে তুলে দেন। উল্লেখ্য যে রুহুল কুদ্দুস ছিলেন আগড়তলা মামলার একজন আসামী এবং শেখ মুজিবের ইনার সার্কেলের লোক।- (মাসুদুল হক)

সাপ্তাহিক মেঘনার (১৬/১২/৮৫) সাথে এক সাক্ষাতকারে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল মালেক উকিল বলেন, ৬ দফা তিনি প্রথম দেখেন একটি টাইপকরা কাগজে শেখ মুজিবের পকেটে ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনভেনশনে যাওয়ার পথে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ৬ দফা হলো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একাত্তরের ঘটনাবলী, পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশের সৃষ্টি - এসবের শুরু হয় মূলতঃ ৬ দফা থেকে। অথচ এটির প্রণয়নে শেখ মুজিব নিজদলের নেতাদের সাথেও কোনরূপ পরামর্শ করেননি। এটি প্রণয়নের প্রাক্কালে কোন দলীয় সম্মেলন বা পরামর্শ সভাও হয়নি। অথচ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সেটিই প্রথাসিদ্ধ রীতি। কিন্তু সেটি প্রণিত হয় রুহুল কুদ্দুসের ন্যায় একজন সন্দেহভাজন চরিত্রের মানুষের দ্বারা যিনি বিদেশী শক্তির বিশ্বস্থ বন্ধুরূপে বহু পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন।

কোন পরিকল্পনা যখন বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ রূপে আগায় তখন সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমুহ আর প্রকাশ্যে নেওয়া হয় না। দেশবাসীকে ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সে প্রক্রিয়ায় জড়িত করা হয় না। এবং সেটি ৬ দফা প্রণয়নের সময় যেমন হয়নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার সময়ও হয়নি। অথচ পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিল

প্রকাশ্য জনসভায়। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে এ কথাগুলো নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। কোন প্রশ্নও তোলা হয়নি। অথচ ইতিহাস রচয়িতাদের দায়িত্ব হল, এসব সিদ্ধান্তসমূহের গুঢ় রহস্যগুলি উদঘাটন করা। কারা ছিল নেপথ্যের নায়ক বা ভিলেন তাদের খুঁজে বের করা এবং সত্য থেকে মিথ্যাগুলোকে অতি সতর্কতার সাথে আলাদা করা। বাংলাদেশের ইতিহাসের লেখকদের দ্বারা একাজটিই হয়নি। তারা অতি পরিচিত মিথ্যাগুলোকেও বিনা প্রতিবাদে পাঠ্যতালিকাভূক্ত করেছেন। রক্তক্ষয়ী একটি লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে র'এর কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে আরো কিছু তথ্য দিয়েছেন ভারতীয় সাংবাদিক অশোক রায়না তার "Inside" বইতে। সেটি এরকমঃ...কিন্তু ততদিনে ভারতীয় এজেন্টরা পূর্ব পাকিস্তানের মুজিবপন্থী একটি অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় এজেন্ট মুজিবপন্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরবর্তী গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কর্নেল মেনন (ইনি হলেন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র'এর দিল্লিস্থ পাকিস্তান ডেস্কের দায়িত্বশীল। তার আসল নাম কর্নেল শংকর নায়ার। মেনন তার ছদ্দ নাম) যিনি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ও মুজিবপন্থী অংশের যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিলেন। তিনি আগরতলা বৈঠকেরপর ইঙ্গিত পান যে, মুজিবপন্থী গ্রুপ আন্দোলন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। কর্নেল মেনন তাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে,তার সঠিক ফলদায়ক সিদ্ধান্তে আসার সময় এখনো হয়নি।.. তারা অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং ঢাকাস্থ ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস অস্ত্রাগারে হামালা চালায়। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আসলে এই পদক্ষেপ একটি ধ্বংসাত্মক ফলাফল ডেকে আনে, ঠিক যেরূপ কর্নেল মেনন ধারণা করেছিলেন। এর কয়েকমাস পর ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন পাকিস্তানীর বিচার করা হবে। শেখ মুজিবকেও বারদিন পর একজন দোষী হিসাবে জড়িত করা হয়। এই মামলাই পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসাবে পরিচিত পায়।- (অশোকা রায়না, ১৯৯৬)

২৫শে মার্চের বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র' মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। তাই যারা মনে করে পাকিস্তান আর্মির মিলিটারি এ্যাকশনের পরই মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় তাদের ধারণা

একাত্তরের আত্মঘাতের ইতিহাস ফিরোজ মাহবুব কামাল

আদৌ সত্য নয়। অশোক রায়না লিখেছেন, "কর্নেল মেননের অবিরাম ভ্রমন ও যোগাযোগের জন্য সীমান্তব্যাপী র'এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং কর্নেল মেননের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিরিড় যোগাযোগ ঐ সমস্ত তরুণ,অবিশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল দারুনভাবে বৃদ্ধি করে। ... ইতিমধ্যে যখন বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন শেষ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের এজেন্টদের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়,তখনই সেই ভয়াবহ "কালো রাত্রী"(২৫ শে মার্চ)র পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে।- (অশোক রায়না, ১৯৯৬)

অধ্যায় ১০: জেনেবুঝে রক্তপাতের পথ বেছে নেওয়া হয়

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগের নেতাদের দলীল হল, ১৯৭০ - এর নির্বাচনে তাদের বিজয়। অথচ জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়েছিল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য হতে। এবং সেটি অখন্ড পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক সংকট দুর করার লক্ষ্যে, দেশটি বিভক্ত করতে নয়। কিন্তু যে জন্য জনগণ তাদেরকে ভোট দিল সে দায়িত্ব তারা পালন করেননি। পাকিস্তানের খেদমত না করে,দেশটিকই তারা ভেঙ্গে ফেলল। অথচ নির্বাচন কালে দেশটি ভাঙ্গার কথা বলে তারা জনগণ থেকে ভোট নেননি। এটি ছিল তাদের উপর অর্পিত আমানতের খেয়ানত। অথচ এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষযে রায় দেওয়ার অধিকার ছিল একমা জনগনের। যে কোন সভ্য দেশে এমন বিষয়ে বিপুল আয়োজনে জনমত যাচাই বা রেফারেন্ডাম হয়। রাজনৈতিক ময়দানে তা নিয়ে পক্ষে- বিপক্ষে বিস্তর আলোচনা হয়। উপমহাদেশেও এমন একটি রিফারেন্ডাম হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। সেটি ভারত ভাঙ্গার পক্ষে রায় যাচায়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে রিফারেন্ডামের ভিত্তিতেই। তখন বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দেয়। এদেশটির বিলুপ্তি হতে পারত একমাত্র আরেকটি অনুরূপ রায়ের ভিত্তিতে। কিন্তু তা হয়নি।

কোন দেশেই এমপিদের হাতে সব ক্ষমতা থাকে না। তারা বড় জোর শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে পারেন, বাজেট পাস করাতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী

কে হবেন সে সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা শক্তির সাথে তারা দর কষাকষিও করতে পারে। কিন্তু সে দরকষাকষিতে ব্যর্থ হলে তারা বড় জোর পদত্যাগ করতে পারেন,এবং অন্যদের জন্য তখন পথ ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হলেই তারা দেশকে খন্ডিত করবেন, সে অধিকার কোন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থাকে না।অথচ আওয়ামী লীগ সেটাই করেছে। ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টোর সাথে দরাকষিতে সফর না হয়েই শেখ মুজিব স্বাধীনতার পথ ধরেন। কিন্তু জনগণ কি তাঁকে সে মান্ডেট দিয়েছিল? উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত এমপিগণ কি অধিকার রাখেন উত্তর বঙ্গকে বাংলাদেশের অন্য এলাকা থেকে আলাদা করে স্বাধীন করার? আওয়ামী লীগ বলে, ১৯৭১- এর ২৫ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ঘোষণাটি তিনি দিলেন কোন ম্যান্ডেট অনুযায়ী? কে তাকে সে অধিকার দিল? শেখ মুজিব ও তার দল ১৯৭০- এর নির্বাচনে অংশ নেয় ইয়াহিয়ার দেওয়া ৫ দফা লিগ্যাল ফ্রেমওংয়ার্ক অর্ডার মেনে নিয়ে। তার শর্ত্বগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১। পাকিস্তানকে অবশ্যই ইসলামি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পর দেশের জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।

৩। আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সংহতির বিষয়কে অবশ্য শাসনতন্ত্রে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। দেশের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অবশ্যই দূর করতে হবে

৫। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা অবশ্যই এমনভাবে বন্টন করতে হবে যাতে প্রদেশগুলি সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন পয়। কেন্দ্রকে আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষাসহ ফেডারেল দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতে হবে।

শেখ মুজিব উপরের শর্ত্বগুলোয় দস্তখত করলেন, অন্যরা সেটি দেখল, সেটি দেখলেন মহান আল্লাহপাকও। কোন কিছু স্বাক্ষর করার অর্থ সেটি পালনে পবিত্র অঙ্গিকার করা। কোন মুসলমান কি পারে সে অঙ্গিকারের

সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বা গাদ্দারী করতে? এ কাজ তো মুনাফিকের। তাছাড়া সেটি স্বাক্ষরে তাঁকে তো কেউ বাধ্য করেনি। এ দলীল স্বাক্ষরের পর কোথা থেকে তিনি অধিকার পেলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণের? তবে কি তিনি সেটি স্বাক্ষর করেছিলেন জনগণকে এবং সে সাথে পাকিস্তান সরকারকে ধোকা দিতে? আর সেটি হলে, স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি কি তবে ধোকাবাজি? স্বাধীনতার ঘোষণা কি এজন্য যে, ২৫শে পাকিস্তান আর্মির হাতে ঢাকার অনেক বাঙ্গালী মারা গিয়েছিল? ২৫ শে মার্চ রাতে যত জন মারা গিয়েছিল, মুজিব আমলে রক্ষি বাহিনীর হাতে তার চেয়ে বেশী মানুষ মারা গিয়েছিল উত্তরবঙ্গে। অনেক প্রাণহানী হয়েছিল একমাত্র আত্রাইয়ের একটি ক্ষুদ্র এলাকায়। সে কারণে কি উত্তরবঙ্গের এমপিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে?

পাকিস্তান ভাঙ্গার লক্ষ্যে সংঘাতের যে পথটি আওয়ামী লীগ বেছে নিয়েছিল তাতে প্রচন্ড রক্তপাত হবে সেটি কারোরই অজানা ছিল না। শেখ মুজিব কারাবন্দী থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তিটি আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন আওয়ামী লীগের সে সময়ের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিসেস আমেনা বেগমও শেখ মুজিবকে এ বিষয়ে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন। আগ্রাসী ও আধিপত্যবাদী ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের মুখে পাকিস্তানকে যারা দুর্গ মনে করত তাদের সংখ্যা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানেই নয়, পূর্ব পাকিস্তানেও কম ছিল না। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষাকল্পে পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল এমন মুসলমানের সংখ্যা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতেই ছিল কয়েক লক্ষ। ছিল সেনাবাহিনীর বাইরেও। সে কসম খেয়েছিল বহু বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিও। সে কসম শেখ মুজিবও খেয়েছিলেন, বিশেষ করে যখন তিনি পূর্ব- পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। শেখ মুজিব না হয় তাঁর কসমের সাথে গাদ্দারী করতে পারেন, কিন্ত সবাই কি তা পারে? ফলে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের কারণেই দুই পক্ষের রক্তাত্ব সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল,যেভাবেই হোক পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের সৃষ্টি। তা যত রক্তপাতেই হোক। আওয়ামী বাকশালীদের কাছে পাকিস্তান হল, দক্ষিণ এশিয়ার বুকে এক সামপ্রদায়িক অনাসৃষ্টি। অনুকরণীয় সভ্য রাষ্ট্র মনে করত ভারতকে। অথচ ভারতে মুসলিম নিধন, মুসলিম নারীধর্ষণ ও তাদের সম্পদ লুন্ঠনকল্পে এ অবধি সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা হয়েছে দশ হাজার বারেরও অধিক। শত শত জীবন্ত মানুষকে সেখানে আগুনে পুড়িয়ে

মারা হয়। এ পক্ষটি তা নিয়ে একটি দিনের জন্যও প্রতিবাদে নামেনি। অথচ পূর্ব পাকিস্তান ছিল তাদের ভাষায় পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মিত্র ছিল পশ্চিম বাংলা ও ভারতের স্যেকুলার রাজনৈতিক শক্তিবর্গ। তাদের কথাবার্তায় চরম ঘৃণা ও উৎকট আক্রোশ প্রকাশ পেত পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাদের নেতাকর্মীগণ পাকিস্তানের অবাঙ্গালী মুসলমানদেরকে ছাতুখোর বলে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করত। এরূপ ঘৃণা সৃষ্টির ফলে ১৯৭০এ আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ নিরাপত্তার অভাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়তে থাকে। ক্যাম্পাস ছাড়তে থাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন শহরের বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যয়নরত অবাঙ্গালী ছাত্র- ছাত্রীরা। অথচ লক্ষ্যনীয় ছিল তাদের সে ঘৃণা প্রকাশ পেত না ভারতীয় অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে। বরং পাঞ্জাবী শিখ, হিন্দু বিহারী, মারওয়ারিদের সাথে যথেষ্ট সখ্যতাই ছিল। গান্ধি, নেহেরু, সুভাস বোস, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম ছিল তাদের আদর্শ; কায়েদে আযম বা ইকবাল নয়। কায়েদে আযমের বিরুদ্ধে প্রচন্ড অভিযোগ ছিল, কোলকাতা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পরেনি শুধু তাঁর কারণে। অথচ যে গান্ধি, নেহেরু ও পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কোলকাতা পাকিস্তানভূক্তির প্রচন্ড বিরোধীতা করল তাদের বিরুদ্ধে তাদের সামান্যতম অভিযোগ বা ক্ষোভও ছিল না। যে রবীন্দ্রনাথ ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল এবং নিজের ছোট গল্পে অছিমদ্দিকে হিন্দু জমিদারের জারজ সন্তান রূপে চিত্রিত করল তার জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী তারা মহা উৎসবে পালন করত। এমন মুসলিম স্বার্থবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক কবিকে তাদের কাছে সাম্প্রদায়িক মনে হয়নি, বরং সাম্প্রদায়ীক গণ্য করেছে ইসলামের উৎসবগুলি। ফলে মহানবীর (সাঃ) জন্ম বার্ষিকীতে তাদের কোন মহফিল বা কর্মকান্ডই নজরে পড়ত না।

শেখ মুজিব জীবনে কখনও কোরআন শরিফ বা হাদীস পাঠ করেছেন কিনা সে খবর নেই, কিন্তু তিনি প্রতিদিন সকালে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেন এবং তার কবিতা পাঠ করতেন সে খবর বহুল প্রচার পেয়েছে। ইসলামের প্রতিষ্ঠা তার জীবনে আদৌ কোন রাজনৈতিক এজেন্ডা ছিল না। তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছিল মুসলিম শক্তিবিনাশী। সে বিনাশী কাজে সহায়তা দিচ্ছিল শুধু ভারত নয়, বরং রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনসহ এমন সব দেশ যাদের কাছে

মুসলমানের প্রতিটি পরাজয় ও শক্তিহানির প্রতিটি ঘটনাই ছিল অতিশয় উল্লাসের বিষয়। দেশে দেশে মুসলিম নিধন, নির্যাতন ও তাদের সম্পদ লুন্ঠনে এদেশগুলোর প্রচুর অভিজ্ঞতাও ছিল। ফলে একাত্তরের বহুকাল পর ঢাকার রাজপথে ২০০৭ এর জানুয়ারিতে বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদী এ সেকুলার পক্ষটি বৈঠা হাতে যেভাবে দাড়ীটুপিধারি নিরীহ মুসল্লীদের পিটিয়ে আহত ও নিহত করে সেটি কোন নতুন ঘটনা নয়। তাদের মাঝে এমন নির্মূলমুখি চেতনা একাত্তরপূর্বকালেও ছিল। তারা ১৯৭০এর ১৮ই জানুয়ারিতে পল্টনে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় লাঠিসোটা ও পাথর নিয়ে হামলা করে তিনজনকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। আহত করেছিল বহু শতকে। নিহত তিনজনই এসেছিল মফস্বলের গ্রাম থেকে। তারা সেদিন পল্টন ময়দানে এসেছিল জামায়াত নেতা মাওলানা মওদূদীর বক্তৃতা শুনতে। হামলার পরিকল্পনাকারি কোন আওয়ামী ক্যাডার ছিল না, বরং শেখ মুজিব নিজে। পুরনো পল্টনে অবস্থিত তৎকালীন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে বসে মাওলানা মওদূদীর সে জনসভা সম্মন্ধে শেখ মুজিব বলেছিলেন, “লাহোর- করাচীর ব্যবসায়ীদের পয়সা নিয়ে বাঙ্গালী কিনতে আসছেন। দেখে নিব কি করে মিটিং করেন।” শেখ মুজিবের অফিস কক্ষে তার সামনে বসে সে কথা আমি নিজ কানে শুনেছি। সে মিটিং পন্ড করতে তিনি সমর্থও হয়েছিলেন।

একই কায়দায় এবং একই স্থানে ২৫শে জানুয়ারিতে মুসলিম লীগের জনসভায় তারা আহত করেছিল দলের নেতা ফজলুর কাদের চৌধুরিসহ বহু নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষকে। দুইটি জনসভাতেই হামলার দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আরো লক্ষ্যনীয় হল, সে সময়ের মিডিয়ার ভূমিকা। ১৮ই জানুয়ারীর জামায়াত আয়োজিত পল্টনের মিটিংয়ে যে হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হল, পরের দিন দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ সে হত্যাকান্ডের জন্য দোষ চাপিয়েছিল জামায়াত কর্মীদের উপর। প্রথম পাতায় বিশাল খবর ছিল, “সমবেত জনতার উপর জামায়াত কর্মীদের হামলা” এরূপ মিথ্যা শিরোনামে। একটি দেশের পত্র- পত্রিকা যে কতটুকু সত্য বিবর্জিত হতে পারে এ হল তার নমুনা।

নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের নেতা- কর্মীরা যখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের খন্ডিত করণে অস্ত্র ধরল এবং মুসলমানদের চিহ্নিত

দুষমন ভারত যেখানে তার সর্বাত্মক সহায়তায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল এবং অবশেষে যুদ্ধ শুরুও করল তখন ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি অঙ্গিকারবদ্ধ তৌহিদী জনতা নীরব থাকতে পারেনি। স্বেচ্ছাসেবকের (উর্দু ভাষায় এর অর্থ হল রাজাকার) বেশে তারা পাকিস্তান বাঁচানোর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এরাই একাত্তরের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অপর পক্ষ। সংখ্যায় অল্প হয়েও নিজেদের রক্ত দিয়ে সেকুলার জাতীয়তাবাদের সে প্রবল জোয়ার এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সে বিশাল হামলাকে সর্ব- সামর্থ দিয়ে রুখবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা পারেনি। পাকিস্তানকে তারা শুধু পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচদের দেশ নয়, নিজেদের দেশও মনে করত। তাছাড়া তারাই ছিল পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচদের সম্মিলিত জনসংখ্যার চেয়ে অধিক। কোন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কি সে দেশের সংখ্যালঘুদের থেকে আলাদা হয়? আলাদা হতে চায়নি ইসলামপন্থিরাও। কিন্তু এজন্য কি তাদের যুদ্ধাপরাধী বলা যায়?

মুসলিম উম্মাহর শক্তিহানির লক্ষ্যে শত্রু- পক্ষ সব সময়ই মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে সহযোগী মিত্র খুঁজে। এসব শত্রুরাই বিশেরও বেশী টুকরায় বিভক্ত করেছে অখন্ড আরবভূমিকে। পাকিস্তানও বিশ্বের সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার কারণে শত্রুর টার্গেটে পরিণত হয় তার জন্মলগ্ন থেকে। একাজে ভারত কোন সুযোগই হাত ছাড়া করেনি। সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ কাশ্মির এবং মুসলিম শাসিত গোয়া, মানভাদর ও হায়দারাবাদের নিজামের দাক্ষিণাত্য দখলের পর ভারত চেষ্টা চালিয়ে আসছিল পূর্ব পাকিস্তান দখলেরও। কিন্তু বহু ষড়যন্ত্রের পরও সফলতা মিলছিল না। সফলতা মিলেনি ১৯৬৫ সালে পরিচালিত প্রকান্ড যুদ্ধেও। এরপর সামরিক আগ্রাসন পরিকল্পনার পাশাপাশি ভারত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শত শত কোটি টাকার বিণিয়োগ করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে। এতে তাদের মুনাফাও মেলে প্রচুর। পাকিস্তানের এবং সে সাথে মুসলিম উম্মাহর শক্তিহানি প্রকল্পে অতিশয় বিশ্বস্ত ও সহযোগী রূপে তখন সমাদৃত হয়েছিল বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদি ও বামপন্থি দলের নেতাকর্মীগণ। ফলে মুজিবের মত যারা একদিন “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” বলে কোলকাতার রাস্তায় লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন তারাই পাকিস্তান ভাঙ্গতে ভারতীয় গোয়েন্দাদের আগড়তলা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হয়। লক্ষণীয় হল, শেখ

মুজিব ও তার সহযোগিরা পাকিস্তান আমলে তাদের বিরুদ্ধে আনীত এ ষড়যন্ত্রে জড়িত হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করলেও বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এটিকে নিজেদের জন্য অহংকার রূপে জাহির করেন। পাকিস্তান ভাঙ্গার সে ষড়যন্ত্রকে প্রচার করেন দেশপ্রেম রূপে। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার এক আসামী আব্দুর রউফ ভৈরবে তার সম্মানে আয়োজিত এক সমাবেশে বলেছিলেন, “..দেশ ও জনগণের প্রতি ভালবাসার টানেই আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে।”- (আব্দুর রউফ, ১৯৯২)

তাই বাংলাদেশের সৃষ্টিকে যারা ইয়াহিয়া খানের ভূল ও পাকিস্তান আর্মির নির্যাতনের কারণে হয়েছে বলেন তারা সঠিক বলেন না। এ ষড়যন্ত্রের শুরু তাই বহু পূর্ব থেকেই এবং সে প্রমাণ প্রচুর। প্রমাণ এসেছে এমনকি আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য থেকেও। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক ১৯৮৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক মেঘনা পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

“আগেই বলেছি আমরা বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট করেছিলাম। (নেতৃত্বে সিরাজুল আলম খান ও কাজী আরেফ আহমেদও ছিল) ...বঙ্গবন্ধুকে বলি ..আমাদের প্রস্তুতির জন্য ভারতের সাথে যোগাযোগ থাকা চাই। ...আমাকে তিনি একটা ঠিকানা দিলেন। বললেন, “এই ঠিকানায় তুই যোগযোগ করবি।” তিনি তখনই আমাদের বললেন ভারতের সাথে তার একটা লিংক আপ আগে থেকেই ছিল- ১৯৬৬ সাল থেকে। “তারা তোদের সব রকম সাহায্য করবে। তুই এই ঠিকানায় গিয়ে দেখা করবি।” তখন তিনি চিত্ত রঞ্জণ সুতারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।(এই সেই চিত্তরঞ্জন সুতোর যে বাংলাদেশ ভেঙ্গে স্বাধীন বঙ্গভূমি বানানোর আন্দোলনের নেতা।) বললেন, “তোরা শিগগিরই একটি ট্রান্সমিশন বেতার কেন্দ্র পাবি। সেটা কোথা থেকে কার মাধ্যমে পাওয়া যাবে তাও বলে দিলেন।” (সাপ্তাহিক মেঘনা, ৪/০২/৮৭, পৃষ্ঠা ১৮)

ফলে সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি হঠাৎ ২৫শে মার্চ সামনে আসেনি। শেখ মুজিব ভারতীয় সাহায্য ও সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি পাকাপোক্ত করেছিলেন অনেক আগেই। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় তো সে অভিযোগইতো আনা হয়েছিল। অথচ সে অভিযোগকে তিনি মিথ্যা

বলেছিলেন। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। আব্দুর রাজ্জাকের এ সাক্ষাতকারের পরও কি বুঝতে বাকি থাকে, কে ছিলেন মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে আজ খন্ডিত হতে যাচ্ছে ইরাক। কোন মুসলমান কি সেটি সমর্থন করতে পারে? পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ উঠে পড়ে লেগেছে আফ্রিকার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র সূদানকে খন্ডিত করার কাজে। সেটিও কি কোন মুসলমান সমর্থন করতে পারে? এমন কাজে সমর্থন দিলে কি তার ঈমান থাকে? মুসলমানের ঈমান শুধু নামায- রোযা, হজ্ব- যাকাতে প্রকাশ পায় না। সেটির প্রবল প্রকাশ ঘটে তার রাজনীতিতেও।

মুনাফেকি নামাযে লুকানো যায়, কিন্তু লুকানো যায় না রাজনীতিতে। কারণ এখানে ধরা পড়ে সে কার মিত্র, এবং কে তার পিছনে অর্থ বিণিয়োগ করছে। যেমন নবীজীর (সাঃ) আমলে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মুনাফেকি ধরা পড়েছিল তার রাজনীতিতে। ইসলামের উত্থান রুখতে সে মক্কার কাফেরদের সাথে চুক্তি করেছিল। নবীজীর (সা) পিছনে নামায পড়েও মুনাফিক হওয়ার এ কলংক থেকে সে রক্ষা পায়নি। ব্যক্তি বা দলের চেয়ে দেশ বড়। ফলে বলা যায়, একাত্তরে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় না গেলেও মুসলমানদের তেমন কোন ক্ষতি হত না। বরং শেখ মুজিব বাংলাদেশের জন্য যে ভিক্ষার ঝুলির অপবাদটি অর্জন করেছিলেন সেটি হয়তো অর্জন করতেন পাকিস্তানের জন্যও। মায়ানমারের নির্বাচনে জিতেও আং সান সুকির দল ক্ষমতায় যেতে পারেনি। কিন্তু সে জন্য কি তারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে? যুদ্ধ শুরু হলে মায়ানমারের অবস্থা কেমন হত? একটি দেশ ভাঙ্গা শুধু ইসলামেই নিষিদ্ধ নয়, নিষিদ্ধ এমনকি আন্তর্জাতিক আইনেই। এজন্যই ভারতের হামলার পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যে অধিবেশন হয় সে অধিবেশনে ১০৪টি রাষ্ট্র পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সংহতির পক্ষ্যে ভোট দেয়। মাত্র ১০টি রাষ্ট্র বিরোধীতা করে। কোন মুসলিম রাষ্ট্রই পাকিস্তানের বিভক্তির পক্ষে ভোট দেয়নি। বাংলাদেশের সৃষ্টির পরও কোন মুসলিম রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে প্রথমে স্বীকৃতি দেয়নি। দিয়েছিল ভারত, ভূটান, রাশিয়া। সাধারণ মুসলমানের ইসলামি চেতনা থেকে ভয় পেত শেখ মুজিব নিজেও। কারণ সে চেতনার অতি প্রবল রূপ তিনি দেখেছিলেন চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলন চলা কালে। ফলে জেনে শুনেই পাকিস্তান ভাঙ্গার গোপন

বিষয়টিকে তিনি নির্বাচনি ইস্যূতে পরিণত করেননি। জনগণ যে এমন কাজকে সমর্থণ করবে না সে বিশ্বাস সম্ভবতঃ তার ছিল। ফলে ১৯৭০এর নির্বাচনী জনসভায় তিনি পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্দানে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেছিলেন,

"আমাকে বলা হয় আমি নাকি পাকিস্তান ভাঙতে চাই। আপনারা জোরকন্ঠে এমন পাকিস্তান জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলুন যাতে পিন্ডির শাসকদের কানে পৌঁছে যায়।"

অথচ তিনি পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ১৯৪৭ থেকেই, যা তিনি পাকিস্তানের জেলখানা থেকে ফিরে এসে সোহরোওয়ার্দি উদ্দ্যানে আয়োজিত প্রথম জনসভাতে বলেছিলেন। ১৯৭০এ নির্বাচনী বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের বিজয়কে তিনি পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে রায় বলে চালিয়ে দেন। অথচ ভোটযুদ্ধে এটি কোন আলোচিত বিষয়ই ছিল না। জনগণের সাথে এটি ছিল আরেক প্রতারণা। নির্বাচনে বিজয়ের পর তিনি হাইজ্যাক করে নেন জনগণের রায়কে। ভোটের মাধ্যমে জনগণ যা বলেনি,যে বিষয়টি নেতার মুখ থেকে একটি বারও শুনেনি সেটিই জনগণের রায় বলে চালিয়ে দেওয়া হল। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থতা,এ মিথ্যাচার নিয়ে কোন রূপ চ্যালেঞ্জই করেনি। বরং তারা পরিণত হয়েছে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে। সে সময় এমন কোন ইসলামি দল ছিলই না যা পাকিস্তানের পক্ষ নেয়নি। যুবকেরা যেমন মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে তেমনি পাকিস্তানের পক্ষও নিয়েছে। বহু সাধারণ মানুষ, মুসলিম ও জামায়াত কর্মী, মাদ্রাসার ছাত্র, অন্যান্য পাকিস্তানপন্থি দলের রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থক সেদিন অস্ত্র হাতে দেশের অফিস, রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট পাহারা দিয়েছে। বহু হাজার নিহতও হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতি তাদের অঙ্গিকার এতই অটল ছিল যে ভারতীয় বাহিনীর বিজয়ের পর হাত- পা বেঁধে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে এবং জয়বাংলা শ্লোগান বলতে বলা হয়েছে,জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে তাদের গায়ে জয়বাংলা লেখা হয়েছে, কিন্তু তারপরও সে শ্লোগান তারা উচ্চারণ করেনি। কালেমা শাহাদত পড়তে পড়তে তার মুক্তিবাহিনীর বেয়নেট চার্জে নিহত হয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের পরও কিশোরগঞ্জের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আতাহার আলী ও তার হাজার হাজার সমর্থক পাকিস্তানের পতাকা নামাতে অস্বীকার করেছিলেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকে তিনি হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ইসলামে চেতনাসমৃদ্ধ প্রতিটি ব্যক্তিদেরকে স্যেকুলার রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীগণ আজও যে কারণে রাজাকার বলে তা তো সে অভিজ্ঞতা থেকেই। কারণ তারা নিজেরাও ভাবতে পারে না, ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ কোন ব্যক্তি পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টির সমর্থক হবে। বাংলাদেশের সৃষ্টি যে নিছক সেকুলার প্রজেক্ট, সেটি তারা নিজেরাও বুঝে।

অধ্যায় ১১: রক্তপাত হয়েছে তিনটি পর্যায়ে

একাত্তরের রক্তপাত হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়টি শুরু হয় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের কর্মী বাহিনীর হাতে। কথা ছিল, ১৯৭১এ মার্চের তিন তারিখে জাতীয় সংসদের বৈঠক বসবে ঢাকায়। ইয়াহিয়া খানের সরকার চাচ্ছিল সংসদে বৈঠক বসার আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে নেতাদের মাঝে কিছু মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত্য হোক। কিন্তু তা হয়নি। সেটি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল ভুট্টো ও মুজিবের আপোষহীন মনভাবের কারণে। নির্বাচনে বিজয়ের পরই আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রলীগ ইতিমধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে তা দেশজুড়ে লটকানোর ব্যবস্থা করেছিল। প্রচন্ড প্রস্তুতি চলছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার এবং সে লক্ষ্যে একটি প্রচন্ড যুদ্ধের। ১৯৭০এর নির্বাচনের পর নির্বাচিত সংসদ- সদস্যদের মূল দায়িত্ব ছিল একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের তা নিয়ে কোন মাথাব্যাথা ছিল না। ফলে ভূট্টো, ইয়াহিয়া খান বা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের সাথে তাদের আলোচনায় তাদের সামান্যই আগ্রহ ছিল। মুজিব তার অবস্থানে অনড় থেকে দিনের পর দিন আলোচনায় বসছিল। বিফল আলোচনার দায়ভার চাপাচ্ছিল সরকারের উপর। অপর দিকে সে সময় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাডাররা দেশজুড়ে অতিদ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল এবং সে সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতিও নিচ্ছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্ব গোপন সেল গঠন করা হয়েছিল বহু বছর আগেই। সে সময় নানা স্থানে অবাঙ্গালীদের ব্যবসা- বাণিজ্য ও ঘরবাড়ীর উপর হামলা হচ্ছিল। তারা হত্যায় সফল হয়েছিল এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যকেও। অবশেষে আলোচনা বিফল হল। ঢাকা থেকে ফিরে গেল ভূট্টো। ২৫শে মার্চ রাস্তায় নামে সামরিক বাহিনী। তখন শুরু হয় হত্যাকান্ডের নতুন পর্ব। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা বা ক্যান্টনমেন্ট আছে এমন শহর গুলোর উপর দখল জমালেও অধিকাংশ মফস্বল জেলা ও মহকুমা শহর আওয়ামী লীগ বাহিনীর দখলে চলে যায়। ঢাকাতে সামরিক অ্যাকশনে বহু বাঙ্গালী নৃশংস ভাবে মারা যায়। কিন্তু মফস্বল শহরগুলোতে সামরিক বাহিনী পৌছতে পারিনি। ফলে বিভিষিকা নেমে আসে সেখানে অবস্থানরত

অবাঙ্গালীদের উপর। এমন কি মফস্বল শহরগুলোতে সে সময় যে সব পাকসেনা ছিল তারা সবাই মারা পড়েছিল।যেমন কুষ্টিয়ায় তারা ঘেরাও হয় ইপিআর ও পুলিশের সশস্ত্র সেপাইদের দ্বারা। তাদের সবাইকে উৎসবভরে হত্যা করা হয়।রাতে দুয়েক জন পালিযে যশোর সেনানিবাসে যাবার পথে তারাও মারা যায়। হত্যা করা হয় মফস্বল শহরে কর্মরত বহু পশ্চিম পাকিস্তানী সিভিল সার্ভিস অফিসারকে। সে সাথে চলছিল বিহারিদের মারার উৎসব। কুষ্টিয়া শহরের বহু বিহারিকে হত্যা করে পাশের গড়াই নদীতে ফেলা হয়। পাকশি ও ভেড়ামারার শত শত বিহারীকে হত্যা করে হার্ডিন্জ ব্রিজের নীচে পদ্মা নদীতে ফেলা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বৃহত্তর দল মফস্বল শহর গুলিতে পৌঁছা শুরু করে এবং শহরগুলিকে আবার দখলে নেয়া শুরু করে। কিন্তু আসার পথে স্থানে স্থানে অবাঙ্গালীদের শত শত পচা লাশের দৃশ্য তাদের নজরে পড়ে। এর ফলে ভয়ানক বীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় পাক সেনাদের মনে।

সেটি প্রকাশ পায় পরবর্তী শহরের উপর তাদের সামরিক এ্যাকশনে। যে শহরই তারা দখল করছিল, সে সব শহরের উপর এলোপাথারি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। যেমন আমার নিজ জেলা- শহর কুষ্টিয়ায় অনেক ঘরবাড়ী ও দোকন- পাট জ্বালানো হয়। কে পাকিস্তানপন্থি আর কে পাকিস্তান বিরোধী সেটি পাক- বাহিনী দেখেনি। অনেক পাকিস্তানপন্থির ঘরবাড়ী যেমন পোড়ানো হয়, তেমনি হত্যা করা হয় অনেক পাকিস্তানপন্থিকেও। যেমন কুষ্টিয়ায় শহরে পুড়িয়ে দেয় জনাব জনাব এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদের দ্বিতল বাড়ী ও গাড়ী। তিনি পাকিস্তানপন্থি ছিলেন ১৯৪৭- এর পূর্ব থেকেই। একসময় কুষ্টিয়া জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং পরবর্তীতে কুষ্টিয়া জেলা পিস কমিটির সভাপতি। হত্যা করা হয় পাকিস্তানপন্থি ছাত্রসংগঠন ইসলামি ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখা ও ফরিদপুর জেলাশাখার সভাপতিকে। এরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে। এসবই ছিল ঘৃণ্যতম অপরাধ। এসময় লুট- পাট ও হত্যাকান্ডে নামে প্রতিশোধ পরায়ন বিহারীরা - যারা ২৫ মার্চের পরপরই ব্যবসা- বাণিজ্য ও আপনজন হারিয়েছিল আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে। শুরুতে কোন কোন জেলায় পরাস্ত হলেও পাক বাহিনী একে একে সবগুলি জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। অপর দিকে শুরু হয় ভারত অভিমুখে উদ্বাস্তুদের মিছিল। সে সাথে

ভারতের মাটিতে শুরু হয় মুক্তি বাহিনীর ট্রেনিং। আস্তে আস্তে সমগ্র দেশ প্রবেশ করে যুদ্ধাবস্থায়। তখন হতাহত হতে থাকে উভয়পক্ষই।

মুক্তিবাহিনীর হামলার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিজ- কালভার্ট, সরকারি ভবন এবং সে সাথে সেগুলির পাহারাদানকারি রাজকারেরা। হামলা হতে থাকে সরকার সমর্থক শান্তিকমিটির গ্রামীন এলাকার নিরস্ত্র সদস্যদের উপর। বহু প্রবীণ মুসলিম লীগ কর্মী, পাকিস্তান আন্দোলনের বহু প্রবীণ কর্মী, জামায়াতে ইসলামের বহু সদস্য এবং বহু পাকিস্তানপন্থি আলেম ও সমাজকর্মী সে সময় মুক্তিবাহিনীর হামলায় নিহত হন। মোনায়েম খানের মত রাজনীতি থেকে বহু বছরআগে অবসর নেওয়া মুসলিম লীগের বহু বৃদ্ধ ব্যক্তিও মুক্তি বাহিনীর হামলা থেকে প্রাণে বাঁচেন নি। আন্তর্জাতিক আইনে এগুলি ছিল যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী ক্যাডারদের কাছে এগুলো গণ্য হয় বীরত্বগাঁথা রূপে। তারা হত্যা করে এমন বহু ব্যক্তিকে যারা সক্রিয় ভাবে কোন রাজনীতির সাথেই জড়িত ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মোস্তাফা আল মাদানীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি ছিলেন নবীজীর (সাঃ) বংশধর। মদিনা থেকে সুদুর বাংলায় এসেছিলেন নিছক আল্লাহর দ্বীনের তালীম দিতে। তার কর্ম ক্ষেত্র ছিল মূলতঃ ঢাকা ও তার আশেপাশের জেলাতে। কিন্তু মুক্তি বাহিনী তাঁকেও ছাড়েনি। ইসলামের চেতনাবাহী এরূপ বহু অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে যুদ্ধকালীন সময়ে প্রাণ দিতে হয়। তাদের হত্যা করা হয় ঠান্ডা মাথায় এবং পরিকল্পিত ভাবে। সম্ভবতঃ এ হামলার লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামী চেতনা ও ইসলামের পক্ষের শক্তিকে নির্মূল করা। যে মূল্যবোধে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দাঙ্গার নামে আগুনে ফেলে মুসলিম নিধন ও বাবরী মসসিজদের ন্যায় মসজিদ ধ্বংসও উৎসবযোগ্য গণ্য হয়, সে অভিন্ন মূল্যবোধটি প্রচন্ড আকার ধারণ করে বাংলাদেশে।

হত্যাকান্ডের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর। তখন বিহারি, রাজাকার, শান্তিকমিটির সদস্য, পাকিস্তানপন্থি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের উপর নেমে আসে ভয়ানক হত্যাকান্ড। একাত্তরে কোন পক্ষে কতজন এবং কাদের হাতে কত জন মারা গেল সে হিসাবটি জেনেবুঝেই নেয়া হয়নি। সে হিসাবটি নেওয়া হলে জানা যেত, বেশী হত্যাকান্ড ঘটেছিল কাদের হাতে। সম্ভবতঃ বেশীর ভাগ হত্যাকান্ড হয়েছিল আওয়ামী- বাকশালীদের

হাতে, আর সে সত্যটি লুকাতেই হত্যাকান্ডের কোন রেকর্ডই রাখা হয়নি। বাস্তব চিত্রের কিছু উদাহরণ দেয়া যাক। লেখকের নিজ গ্রামে একাত্তরে ৪ জন নিহত হয়। এর মধ্যে ২জন নিহত হয় বিহারীদের হাতে। দুইজনই ছিল স্কুল ছাত্র। তাদের এক জন লেখকের সহোদর ভাই, আরেকজন তার ভাগিনেয়। অপর ২জন নিহত হয় মুক্তিবাহিনীর হাতে। তারা দুইজনই ছিল ভারতের পশ্চিম বাংলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে আসা মোহাজির। তাদের একজন ছিলেন খাদ্যবিভাগের থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা। আরেকজন ছিল কৃষক। পাশের গ্রামে নিহত হয় একজন, সে ছিল রাজাকার। মারা যায় মুক্তি বাহিনীর হাতে। তার পাশের গ্রামে মারা যায় দুই জন। তারা ছিল সহোদর দুই ভাই, বড় ভাইটি ছিল অত্যন্ত মেধাবী সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স পড়তো। দুই জনই ছিল রাজাকার। তাদেরকে হত্যা করে মুক্তিবাহিনী। তাদের পিতামাতা সন্তানদের লাশ আর খুজেঁ পায়নি। ১৬ই ডিসেম্বরের পর হাজার হাজার রাজাকারকে শুধু হত্যাই করা হয়নি, লুটপাট করা হয় তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্য। বহু ঘটনা এমনও ঘটেছে, বাড়ীতে রাজাকারকে না পেয়ে তার নিরীহ পিতা ও ভাইদের হত্যা করা হয়েছে। মহম্মদপুর, মীরপুর, রংপুরের সৈয়দপুরসহ সারাদেশে বিহারীদের হাজার হাজার ঘরবাড়ি তখন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দখলে চলে যায়। উচ্চসারির নেতাদের দখলে যায় ধানমন্ডি, গুলশান, কান্টনমেন্ট ও বনানীতে অবস্থিত অবাঙ্গালীদের বড় বড় বাড়ীগুলি। ফলে পরাজিত হওয়ার কারণে স্বভাবতই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় পাকিস্তানপন্থিদের। দুর্যোগ কালে আওয়ামী-বাকশালীদের প্রতিবেশী ভারতে পালানোর পথ খোলা থাকলেও, পাকিস্তানপন্থিদের তেমন কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। তাদের জন্য সমগ্র দেশ পরিণত হয় নির্যাতন মূলক জেলখানায়। ইসলাম ও পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ায় তাদের চরম কোরবানি দিতে হয় নিজেদের জানমাল, সহায় সম্পদ,চাকুরি-বাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য হারিয়ে। এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তানপন্থি শিক্ষকগণও হামলা থেকে রেহায় পায়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ হোসেন, অধ্যাপক ড. হাসান জামানের মত প্রখ্যাত ব্যক্তিগণও নৃশংস নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি। হাত পা ভেঙ্গে তাদের রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছিল।

এতটাই প্রহার করেছিল যে, তারা যে মারা যাবে, সেটি নিশ্চিত হয়েই তাদেরকে ফেলে রাখা হয়েছিল। হাজার হাজার নিরস্ত্র অবাঙ্গালীকে তারা ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করে। দাফনের ব্যবস্থাও হয়নি। মানুষ যত অপরাধীই হোক, তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হলেও তার লাশটি আপনজনদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বট থেকে যায়। অথচ সে দায়িত্ব পালিত হয়নি। অনেকের লাশই নদীর চরে কুকুর-শৃগালের খোরাক হয়েছে। যাদেরকে তখন এভাবে হত্যা করা হয়েছে তারা ছিল নিরস্ত্র। কথা হলো, নিরস্ত্র মানুষের সাথে এমন আচরণ কতটা মানবিক? এটি তো যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী স্যেকুলার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা রচিত ইতিহাসে এমন যুদ্ধাপরাধের সামান্যতম উল্লেখও নেই। তাদের সে যুদ্ধাপরাধের শিকার হয়ে কয়েক লক্ষ অবাঙ্গালী আজও নর্দমার পাশে ঝুপড়িতে বসবাস করছে। তাদের সে করুণ অবস্থা দেখে যে কোন সুস্থ্য বিবেকে ঝাঁকুনি লাগাতর কথা। ভারতের হিন্দুদের তাড়া খেয়ে যখন তারা নিঃস্ব হাতে পাকিস্তানে এসেছিল তখনও তাদের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। বিদেশীরা তাদের নিয়ে বই লেখে, ফিল্ম বানায়, সাহায্যও পাঠায়। কিন্তু বাঙ্গালীরা তাদের জবরদখল করা ঘর-বাড়ীগুলো ছাড়তে রাজী নয়। যে জাতির বিবেক দূর্নীতিতে বিশ্ব রেকর্ড গড়া নিয়ে ব্যস্ত তাদের বিবেক কি সে কাজে সাড়া দেয়?

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দান মূলত ইসলাম বিরোধীদের দখলে। সে দখলদারি ১৯৪৭এর পূর্বে আংশিক ভাবে হলেও সেটি বলবান হয় ১৯৪৭ এর পর। মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা যখন রাজনৈতিক বিবাদে লিপ্ত, ১৯৪৭-এর পরাজিত শক্তি তখন বুদ্ধিবৃত্তির ময়দান দখলে নেওয়া নিয়ে ব্যস্ত। আর একাত্তরের পর তাদের কোন প্রতিদ্বন্দিই থাকেনি। তখন ইতিহাস রচনার নামে তারা চালিয়েছে ইচ্ছামত মিথ্যাচার। নিজপক্ষের অতিশয় দুর্বৃত্ত নেতাদেরকেও বাঙ্গালীর হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করেছে। অপর দিকে ইসলামপন্থিদের চিত্রিত করেছে খুনি, চরিত্রহীন ও জঘন্য যুদ্ধাপরাধী রূপে। তাদের মিথ্যাচার এতটাই সীমাহীন যে, যুদ্ধে তাদের মূল সহায়তা দানকারি ভারতের অবদানকেও তারা এখন অস্বীকার করছে। বলছে, পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করেছে মুক্তিবাহিনী। অথচ সত্য হল, ভারতীয় বাহিনী সেদিন নিজেদের বিপুল অর্থ ও বহু হাজার মানুষের রক্তের খরচে পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করেছিল এবং পাকিস্তান বাহিনীকে

পরাজিত করার পর কোলকাতার হোটেলে আরাম-আয়াশে ব্যস্ত প্রবাসী আওয়ামী লীগের নেতাদের হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় এনে ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু সে ঐতিহাসিক সত্যকে তারা বাংলাদেশের ইতিহাস পুস্তক থেকেই বিলুপ্ত করেছে। এসব পুতুল নেতাদের বলা হয় স্বাধীনতার বীর সৈনিক রূপে। প্রতিছরের ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিনের অনুষ্ঠানে ভারতীয় বাহিনীর সে ভূমিকাকে মুখেও আনা হয় না। অথচ নয় মাসের যুদ্ধে যে মুক্তি বাহিনী পুরা বা আধা বাংলাদেশ দুরে থাক একটি জেলা শহরকেও অধিকারে নিতে পারেনি তাদেরকেই বিজয়ের মূল নায়ক রূপে হাজির করা হচ্ছে।

তবে এটি সত্য, উপমহাদেশে মুসলমানদের শক্তি খর্বকরণে এবং মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দুর্বল করতে শেখ মুজিব ও তার অনুসারিগণ যা করেছে ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এজন্যই মুসলিম দুষমন সকল ব্যক্তি ও শক্তির কাছে তিনি অতিশয় পুজনীয় ব্যক্তি।ভারতীয়দের কাছ এজন্যই তিনি এবং তার দল ও পরিবার এত প্রিয়। বাংলাদেশের ইসলাম বিরোধী ও ইসলামের চেতনাবিনাশী সকল ব্যক্তিবর্গ এজন্যই আওয়ামী লীগকে নির্দ্বিধায় ভোট দেয়। দলটিকে বিজয়ী করতে বিপুল অর্থ,পরামর্শ ও লোকবল জোগায়। অপরদিকে যারা বিশ্বে মুসলমানদের বিজয় ও গৌরব দেখতে চায়,এবং চায় বিশ্বশক্তি রূপে ইসলামের প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে শেখ মুজিব ও তার দল যে অতিশয় ঘৃণিতশক্তি রূপে যুগ যুগ ধরে ধিক্কার পাবে তা নিয়েও কি সন্দেহ আছে? ফলে একাত্তরে যে রক্তাত্ব সংঘাত ও বিভক্তির জন্ম হল,সেটি কি সহজে দূর হবার?

অধ্যায় ১২: মিথ্যাচারে রেকর্ড

একাত্তরকে ঘিরে আওয়ামী লীগের বড় অস্ত্র ছিল মিথ্যাচার। সে সাথে ছিল হৃদয়হীন সন্ত্রাস। এটি যে শুধু দলটির নীচের তলার ক্যাডার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, দলের শীর্ষ নেতা, আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক - সবার মধ্যেই সেটি ভয়ানক ভাবে প্রবেশ করেছিল। এর কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৭০ সালের ১৮ ই জানুয়ারীতে পল্টনে জামায়াতে ইসলামির জনসভা ছিল। সেখানে দলটির আমীর মাওলানা মাওদূদী ছিলেন প্রধান বক্তা। কিন্তু জনসভায় তার আগমনের আগেই প্রচন্ড হামলা শুরু হয়। সেদিন সে হামলা লেখক স্বচক্ষে দেখেছেন। না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন হত, গণতন্ত্রের দাবীদার একটি দল অন্য দলের শান্তিপূর্ণ জনসভার উপর কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে। হামলার জন্য প্রচুর ভাঙ্গা ইট জমা করা হয়েছিল জিন্নাহ এভিনিউতে যা আজ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ নামে পরিচিত। আওয়ামী ক্যাডারগণ বৃষ্টির মত ছুঁড়ে মারছিল জনসভায় সমবেত শ্রোতাদের উপর। মিনিটের মধ্যেই শত শত মানুষ আহত হল। পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছিল অনেকেরই। জনসভাটি বিশাল করার লক্ষ্যে জামায়াত সারা দেশ থেকে হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থক নিয়ে জমা করেছিল। মফস্বলের সাদামাটা মানুষগুলো তখন পাথর খেয়ে দিশে হারা হয়ে গিয়েছিল,নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কোথায় যে পালাবে সে রাস্তাও পাচ্ছিল না।

হামলা হচ্ছিল পশ্চিম দিক থেকে। তখন পল্টন ময়দানের দক্ষিণের উঁচু দেওয়াল অতি কষ্টে টপকাতে দেখা গেছে লম্বা আলখেল্লা পরিহিত মুসল্লীদের। সেদিন তিনজন নিরীহ শ্রোতা নিহত হয়েছিল। অথচ জনসভায় আসা ছাড়া তাদের কোন অপরাধই ছিল। আহত হয়েছিল বহুশত। আহতরা আরো আহত হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে। সেখানেও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের মারপিট করে। শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের অন্য কোন নেতা এমন বর্বর ঘটনার নিন্দা করে কোন বিবৃতিও দেননি। সুস্থ্য গণতন্ত্রচর্চার প্রতি সামান্য আগ্রহ থাকলে একটি দল কি এভাবে অন্য দলে উপর এতটা নির্দয় ও বিবেকহীন হতে পারে? তাদের বিবেক যে কতটা মৃত সেটিই সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল। পরের দিন আওয়ামী লীগের মুখপত্র ইত্তেফাক ও ন্যাপের মুখপত্র দৈনিক সংবাদের

হেডিং ছিল আরো বিস্ময়কর। প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল খবর ছেপেছিল, জনসভার শ্রোতাদের উপর জামাতকর্মীদের হামলা - এ শিরোনামায়। যেন জামায়াত এক সপ্তাহব্যাপী সারা ঢাকা শহরে প্রচার চালিয়ে এবং বহু হাজার টাকা ব্যয় করে মানুষ জমা করেছিল তাদের মাথায় পাথর মারার জন্য! এটি কি বিশ্বাস করা যায়? কোন সুস্থ্য সাংবাদিক কি এমন মিথ্যা লিখতে পারে? অথচ সে অবিশ্বাস্য মিথ্যাটিই পাঠকদের কাছে পেশ করেছিল দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ। এভাবে রেকর্ড গড়া হয় মিথ্যাচর্চায়।

কথা হল, হামলামুখি রাস্তার সন্ত্রাসীদের থেকে সাংবাদিক নামধারি এমন ব্যক্তিদের বিবেককে কি আদৌ উন্নত বলা যায়? একই রূপ বিবেকহীনতা দেখিয়েছেন দেশের বুদ্ধিজীবীরা। দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে তারা যুদ্ধ করবে, সেটি সবাই আশা করে না।কিন্তু মিথ্যার বিরুদ্ধে সোচচার হওয়ার দায়িত্বটা তো তাদের।কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছেন।বরং স্বৈরাচারি দুর্বৃত্ত নেতাদের কাছে তারা নীরবে আত্মসমর্পণ করেছেন।পরিণত হয়েছেন চাটুকারে। ১৯৭১- এর নির্বাচন ছিল আওয়ামী লীগের মিথ্যা ওয়াদার। মিথ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জনগণকেও।প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকেও। সে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যথেচ্ছা সন্ত্রাসের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিল আওয়ামী লীগ। মুজিব ইয়াহিয়া খানকে শাসনতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে কথা বলেছেন ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রী জি ডব্লিউ চৌধুরি (G.W. Chowdhury, 1974)। ফলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসে অন্য কোন দল শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচনী জনসভাই করতে পারেনি। জামায়াতে ইসলামী পারেনি, মুসলিম লীগও পারেনি। পারেনি অন্যান্য দলও। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে, বহু প্রাণহানীও হয়েছে। একমাত্র ৭০- এর ১৮ই জানুয়ারীর পল্টনের জনসভায় জামায়াতের ৩ জন নিহত এবং ৪ শতেরও বেশী আহত হয়েছিল। সে হত্যাকান্ডটি ঘটেছিল গভর্নর হাউজের সামনে। কিন্তু এ হত্যাকান্ডের অপরাধে একজনকেও শাস্তি দেওয়া হয়নি। কাউকে গ্রেফতারও করা হয়নি। আরো লক্ষ্যণীয় হল, যে নির্বাচনে বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হল, তছনছ হল বহু নির্বাচনী সভা, বহু ভোটকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বি দলের পোলিং এজেন্টকে বসতে দেওয়া হল না এবং জালি ভোট দেয়া হল বিপুল সংখ্যায় - সে নির্বাচনকেও সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বলা হয়েছিল। এবং সেটি দুটি

পক্ষ থেকে। পক্ষ দুটি হলঃ আওয়ামী লীগ এবং ইয়াহিয়া খানের সরকার। ৭১- এর সে নির্বাচনের ব্যাপারে মাওলানা ভাষানী কি বলেছিলেন সেটা শোনা যাক। এ বিবরণ দিয়েছেন ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা জনাব ইব্রাহীম হোসেন। তিনি তাঁর বই ‘‘ফেলে আসা দিনগুলো’’তে লিখেছেনঃ

“ঢাকার টাঙ্গাইলে জনসভা করার পর কাইয়ুম খান (পাকিস্তান মুসলিম লীগের এক গ্রুপের সভাপতি, ইনি এক সময় পাকিস্তানের উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন) গেলেন মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করতে। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। মওলানার সেই টিনের ঘরে গিয়ে তিনি প্রায় পাঁচ ঘন্টা কাটান। আমি তখন মওলানার নির্মীয়মান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রুমে বসে ছিলাম। ..তারপর কাইয়ুম খান বললেন, মওলানা যা বলেছেন তাতো সাংঘাতিক কথা। আমি বাঙালি হলে এসব কথা জোরেশোরে বলতে পারতাম। আমি বললে সবাই ভূল বঝবে। মওলানা বললেন, নির্বাচনে তিনি কেন যোগ দিচ্ছেন না। এতো সব সাজানো নাটক। আর্মির সাথে মুজিবের বোঝাপড়ার পরে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচেছ। এ ষড়যন্ত্রের পিছনে মদদ যোগাচ্ছেন ভূট্টো। যদিও তিনি আমার খুব ঘনিষ্ট। ইন্ডিয়া সুযোগের অপেক্ষায়। এই ভাগাভাগির নির্বাচনে যদি কোন উল্টাপাল্টা হয় তবে ইন্ডিয়া এগিয়ে আসবে।”- (ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)

তবে ভাষানী যাই বলুন,পূর্বের ন্যায় পাকিস্তানের সে দূর্দিনেও তিনি কোন কল্যাণ করেননি। যেহেতু সে সময় তার সাথে সে সময় দেশী- বেদেশী – বিশেষ করে চীনা গোয়েন্দা চক্রের সংযোগ ছিল, মুজির ও ইয়াহিয়ার গোপন সমঝোতার বিষয়ে তিনি যা বলেছেন সেটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া জেনারেল ইয়াহিয়ার তৎকালীন ইনার সার্কেলের মন্ত্রী জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরিও একই কথা বলেছেন। মিথ্যাচর্চা শুধু আওয়ামী লীগ নেতা, মাঠকর্মী ও আওয়ামী ঘরানার সাংবাদিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমান ভাবে সংক্রামিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও। বাংলাদেশের আওয়ামী ঘরানার উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তিনি একাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। দেখা যাক, তার উচ্চ শিক্ষা তার কদর্যতাকে কতটা পাকসাফ করতে পেরেছিল। তার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

লিখেছেন,"বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী একাত্তরের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে ঢাকা ত্যাগ করেন সপরিবারে। তিনি তখন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে জেনেভায় জুরিষ্টদের সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ২৫ মার্চের অব্যবহিত পর তিনি বিবিসিতে এক ইন্টারভিউতে বলেন যে, পাকিস্তান আর্মি তার ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্রকে খুন করেছে। এরপর তিনি বলেন, তিনি আর ঐ সরকারের আনুগত্য করতে পারেন না। অথচ এটি ছিল মিথ্যাচার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষক ২৫ মার্চ মারা যায় এবং সে সাথে দুই জন ছাত্র। অথচ যারা আবু সাঈদ চৌধুরির বক্তৃতা শুনেছিলেন তাদের ধারণা ছিল সত্যি বুঝি কয়েক শত শিক্ষক এবং ছাত্র ২৫শে মার্চের রাতে নিহত হয়।' -(ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)

বাংলাদেশের ইতিহাসে 'একাত্তরে ৩০ লাখ নিহত হয়েছে' এ মিথ্যার ন্যায় '২৫শে মার্চের রাতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্র খুন হয়েছে' আরেকটি বহু উচ্চারিত মিথ্যা। অথচ বিশ্বজুড়ে এ মিথ্যা রটনায় সক্রিয় ভূমিকা নেন জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী। এই হল আওয়ামী লীগের সেরা শিক্ষিত ব্যক্তিটির চরিত্র! একাত্তরে ৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। এত বড় মাপের মিথ্যা কথা বলে শেখ মুজিব বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তবে বিশ্বাস করেছিল খুব কম লোকই। বিশ্বাস করেনি এমনকি ভারতীয়রাও। তবে তাতে আওয়ামী- বাকশালীদের মিথ্যাচর্চায় ভাটা পড়েনি। শুধু দেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও মিথ্যাচার আওয়ামী লীগ নেতা ও ক্যাডারদের চরিত্রের সাথে কতটা মিশে গিয়েছিল তার আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন লিখেছেন,

"(লন্ডনে থাকাকালে) সালমান আলী সানডে টাইমস পত্রিকার একটি সংখ্যা দেখালেন। পড়ে তো আমি অবাক। মৃতের তালিকার মধ্যে ছিলেন আমার বন্ধু সহকর্মী কে এম মুনিম, মুনীর চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক - এ রকম আরো কয়েকজন। আমি যখন বললাম যে লন্ডন যাত্রার প্রাক্কালে আমি মুনিম সাহেবের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে এসেছি, সালমান আলীর বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেল। তাঁকে আরো বললাম যে আমি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর নিয়ে এসেছি যে মুনীর চৌধুরী এবং আব্দুর রাজ্জাক জীবিত। সালমান আলীকে আরো বলা হয়েছিল যে ঢাকায় নাগরিক জীবন বলে কিছু নেই। তানভির আহমদের রুমে যখন গেলাম পুরনো পরিচয় সূত্রে অনেক আলাপ হলো। তিনি ড্রয়ার থেকে

বড় হরফে ইংরেজীতে লেখা একটা লিফলেট বা প্রচারপত্র দেখালেন। বললেন তাঁর পরিচিত এক বাঙ্গালী মহিলা ওটা লন্ডনের রাস্তায় বিলি করছিলেন। প্রচারপত্রে লেখা ছিল, আপনাদের মধ্যে বিবেক বলে যদি কিছু থাকে তবে পাশবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। এরপর ছিল কয়েকটি লোমহর্ষক কাহিনী। এক পিতার বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল যে ২৫ শের রাত্রে আর্মি ঢাকায় মেয়েদের হলে ঢুকে শুধু গুলী করে অনেক মেয়েকে হত্যা করেনি, তাদের উপর পাশবিক অত্যাচারও চালিয়েছে। সমকামী পাঠান সৈন্যরা মেয়েদের ঐ জঘন্য প্রকারেও ধর্ষণ করেছে। বক্তা পিতা আরো বলেছিলেন যে এ সমস্ত ঘটনা নীচের তলায় যখন হচ্ছিল তখন জন পঞ্চাশেক মেয়ে উপরতলা থেকে এ সমস্ত কান্ড দেখছিল। তরা যখন বুঝতে পারলো যে এর পরই তাদের পালা তখন তারা উপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার মধ্যে বক্তার কন্যাও ছিল। তানভির আহমদ যখন বর্ণনার বীভৎসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ঐ মহিলাকে বলেছিলেন যে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে এ ঘটনার মূলে কোন সত্য নেই। মহিলা জবাব দিয়েছিলেন Every thing is fair in love and war অর্থাৎ যুদ্ধ এবং প্রেমের ব্যাপারে অন্যায় বলে কিছু নেই। তানভির সাহেবকে আমি বললাম যে ঢাকায় আমি নিজে মেয়েদের হলের প্রভোস্ট মিসেস আলী ইমামের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এসেছি। তাঁর থেকে যা শুনেছি তা হলো এই ৭ই মার্চের পর অধিকাংশ মেয়ে হল ছেড়ে চলে যায়। ২৪ তারিখে ৫ জন মেয়ে মাত্র ছিল। ২৪ তারিখের দিকে যখন আর্মি এ্যাকশনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যখন ঢাকায় নানা গুজব ছড়াতে থাকে তখন মিসেস ইমামের নির্দেশে এই মেয়েগুলোও হল ছেড়ে জনৈকা হাইজ টিউটরের বাসায় আশ্রয় নেয় সুতরাং হলের মেয়েদের উপর অত্যাচার বা ধর্ষণের কোন কথাই উঠতে পারে না। (ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)

অধ্যায় ১৩: ইতিহাসে যে বীভৎসতার উল্লেখ নেই

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা নিয়ে বহু লেখা হয়েছে, বহু ছায়াছবিও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু যাদেরকে বাঙ্গালীর হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বলা হচ্ছে তাদের দ্বারা যে নৃশংস হত্যাকান্ডগুলো ঘটেছে সে বিররণও কি সঠিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে? অথচ এটিও তো ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্দ্য অংশ। এটুকু না জানলে বাঙ্গালীর ইতিহাসের পাঠই যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ হবে না। দেখা যাক তাদের কান্ডটি। ১৯৭১এর ২৬শে মার্চ কুষ্টিয়ার মত একটি মফস্বল শহর আওয়ামী ক্যাডারগণ কতটা হিংস্র রূপ ধারণ করেছিল তার বর্ণনা একজন প্রত্যক্ষ্যদর্শি দিয়েছেন এভাবে, "উর্দুভাষী এডিশনাল ডিপুটি কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালটির ভাইস চেয়ারম্যানকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা মিছিল বের করে লাশ দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে মহা উল্লাসে শহর প্রদক্ষিণ করল। উর্দুভাষীদের দোকানপাট লুট ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় হিন্দু সাংবাদিক ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের শহরে আনাগোনা দেখে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না যে দু দেশের মানচিত্রে যে সীমারেখা ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।- (সা’দ আহম্মদ, ২০০৬)’

পাক আর্মী পাবনা জেলা দখল করে যখন ১৫ই এপ্রিল তারিখে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পার হয় তখন থেকেই (আওয়ামী লীগ) নেতারা (কুষ্টিয়া ছেড়ে) পালাতে শুরু করে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে যে বীভৎস ও নারকীয় কান্ড আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটিয়ে গেল এবং দেশের যে সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল তা ছিল অচিন্তনীয়। জেলার সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে উর্দুভাষীদের জড়ো করে হত্যা করা এবং সম্পদ লুট করার কাজ তারা ১২ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে করেছে। ট্রেজারী, ব্যাংক ইত্যাদি থেকে কোটি কোটি টাকা, সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে কয়েক লক্ষ মণ খাদ্য, কয়েক শত সরকারি জীপ, ট্রাক, ওয়াগান ক্যারিয়ার, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও বগী ইত্যাদী লুট করে ভারতে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যক্তিগত সম্পদ যা রেখে গেলেন নিয়ে গেলেন তার চাইতে হাজার গুণ বেশি।‘-(সা’দ আহম্মদ, ২০০৬)

১৯৭১এর ১৭ই ডিসেম্বরে ঢাকা শহরের মতিঝিলে তাদের সে চিত্রটি ধরা পড়েছে প্রত্যক্ষদর্শির দৃষ্টিতে এভাবেঃ ‘রাস্তায় মানুষের হৈ চৈ শুনে জানালার পর্দা সরিয়ে যা দেখলাম তা ছিল সত্যই মর্মবিদারক। আদমজী কোর্ট ও বাওয়ানী বিল্ডিং এর উর্দুভাষী দারোয়ানগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে এবং মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার জন্য গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। দারোয়ানগুলো সংখ্যায় পনের- ষোল জন। অধিকাংশই বৃদ্ধ কিন্তু ওদের মৃত্যুর কারণ ওরা বাঙ্গালী নয়। এদেশের মাটিতে ওরা জন্মায়নি এই ছিল ওদের অপরাধ। দু-চারজন পথচারী এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করেছে, নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু উল্লাসে ফেটে পড়া মানুষের সংখ্যার তুলনায় এ ছিল নগণ্য’ -(সা’দ আহম্মদ, ২০০৬)

ঢাকার অবাঙ্গালীদের উপর কিরূপ নারকীয় তান্ডব নেমে এসেছিল তার আরেক বিবরণ শুনা যাক এক প্রত্যক্ষদর্শী থেকে, "রাত ১১টার দিকে হঠাৎ হৈ চৈ আর কান্নার রোল শুনতে পেলাম। ইউসুফের বাসার সামনে ছিল একটা খোলা জায়গা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই খোলা জায়গায় কিছু সংখ্যক অবাঙালিকে দাঁড় করানো হয়েছে গুলি করে মারার জন্য। কয়েকজন গেরিলা স্টেনগান তাক করে আছে তাদের বুক ও মাথা বরাবর। অবাঙ্গালিদের পোষক- আশাক দেখে মনে হল তারা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন হবে। তাদের বৌ ছেলে মেয়েরা তখন গেরিলাদের কাছে মিনতি করে চলেছে সব কিছুর বিনিময়ে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়ার। নিজের চোখে দেখলাম এই সব মেয়ে নিজেদের অলংকার ছুঁড়ে দিচ্ছে গেরিলাদের দিকে। কিন্তু গেরিলাদের অন্তরে সামান্যতম করুণার উদ্রেগ হয়নি। এক এক করে তারা সেই রাতে সবগুলো পুরুষকে গুলি করে মেরে ফেলল। নিহতদের বৌ-ছেলে মেয়ের ভাগ্যে পরে কি ঘটেছিল তা আর কখনো জানতে পারিনি। এদের অপরাধ ছিল এরা অবাঙ্গালী’- (ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)

বাঙ্গালী মুসলমানদের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন মৌলভী ফরিদ আহম্মদ। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্টেরিয়ান। ছিলেন অতি প্রতিভাবান ও পন্ডিত ব্যক্তি। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তিনি সদস্য (এমএনএ) ছিলেন কক্সবাজার থেকে। নিজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। অথচ তাঁকে যেরূপ বর্বরভাবে হত্যা করা হয় সেটি হালাকু-

চেঙ্গীজ বা নাজী বর্বতাকেও হার মানাবে। তার নির্মম হত্যাকান্ডের বর্ণনাটি এসেছে এভাবে, "১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মৌলভী ফরিদ আহমদকে গ্রেফতার করে লালবাগ থানায় নেয়া হয়। গেরিলারা ১৯শে ডিসেম্বর তাঁকে লালবাগ থানা থেকে ছিনিয়ে ইকবাল হলে নিয়ে যায়। সে সময় ইকবাল হলে ছিল গেরিলাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। এখানে গেরিলারা পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসীদের ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে মেরে ফেলতো। আমি যখন জেল ধেকে বের হই তখন মৌলভী ফরিদ আহমদের দুঃখজনক পরিণতির কথা জহিরুদ্দিনের মুখে আদ্যোপান্ত শুনেছিলাম। জহিরুদ্দিন ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। গেরিলারা তাঁকেও ধরে নিয়ে ইকবাল হলে রেখেছিল। মৌলভী ফরিদ আহমদকে ইকবাল ধরে নিয়ে যায় সমাজতন্ত্রেও লেবেলধারী কতিপয় কপট ছাত্র নেতা ও তাদের সঙ্গী- সাথীরা। তারা প্রথমেই ফরিদ আহমদকে মুক্তি দেয়ার কথা বলে তাঁর ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা নিজেদের নামে তুলে নেয়। তারপর শুরু হয় তাঁর উপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। প্রথমে তাঁর চোখ তুলে ফেলা হয়। কান কাটা হয়। হাত ভেঙ্গে দেয়া হয়। সর্বশেষে দীর্ঘ নিপীড়নের পর ২৪শে ডিসেম্বর রাতে তাকে হত্যা করা হয়। তার আগে তাঁর জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং শরীর থেকে অবশিষ্ট অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। নরপশুরা তাঁকে ঐ রাতেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের পিছনে একটি ডোবার মধ্যে ফেলে দেয়" - (ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)

ধীরে ধীরে অতি নৃশংস ও বীভৎসভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডটিকে কি করে অতি বেশী বেদনাদায়ক করা যায় এবং সে অসহ্য বেদনাদায়ক মুহুর্তগুলোকে কি করে আরো দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, পরিকল্পনা করা হয়েছিল সে ক্ষেত্রেও। অথচ তিনি কাওকে হত্যা করেছেন বা হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন- আওয়ামী- বাকশালী চক্র আজও সে প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। মানব- ইতিহাসের এটি হল অন্যতম অতি জঘন্য যুদ্ধাপরাধ। যুদ্ধের ময়দানে নেমে যারা হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করে আন্তর্জাতিক আইনে তাদেরকেও এভাবে হত্যা করার অনুমতি নেই। অথচ এরূপ হত্যাকান্ডটি যারা ঘটিয়েছিল, আওয়ামী- বাকশালী চক্রের বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকেই চিত্রিত করছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালীরূপে। আরো লক্ষ্যণীয় হল, এ বীভৎস হত্যাকান্ডটি যেখানে এ ঘটেছিল সেটি কোন ডাকাত- পল্লি নয়,

কোন জেলখানাও নয়, এটি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল। জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি কিভাবে দুর্বৃত্ত- কবলিত হয়েছিল এ হল তার নমুনা।

সিরাজগনঞ্জের ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাংলার মুসলিম জাগরণে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলামিক রেনেসাঁর প্রখ্যাত ও প্রধানতম কবি। আওয়ামী বাকশালীদের নৃশংস হামলার শিকার হয়েছিল এ পরিবারটিও। এ সিরাজী পরিবারের সন্তান ছিলেন সৈয়দ আসাদুল্লাহ সিরাজী। তাঁর অপরাধ, ইসলামের জাগরনে তার গভীর অঙ্গিকার ছিল। তিনি বিরোধীতা করেছিলেন পাকিস্তান ভাঙ্গার। এ অপরাধে তাঁকে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অতি নির্মম ভাবে হত্যা করে। তাঁকে প্রথমে গ্রেফতার করে সিরাজগঞ্জ জেলে রাখা হয়। কিন্তু জেলও সে সময় বন্দীদের জন্য নিরাপদ ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতা ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা যাকে ইচ্ছা তাকে জেল থেকে তুলে নিয়ে যেত। তাদেরক নির্যাতন করত এবং নির্যাতনের পর হত্যা করত। গেরিলারা (জনাব সিরাজীকে)হত্যা ও রক্তের জন্য এতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাঁকে ও তাঁর সাথে আরো ১৫/১৬ জন পাকিস্তানপন্থীকে গেরিলারা ধরে নিয়ে প্রথমে শারীরিক নির্যাতন করে পরে গুলি হত্যা করে। তাদের লাশও ফেরত দেয়নি। যমুনার বক্ষে এসব লাশ ছুঁড়ে ফেলেছিল। পাকিস্তানপন্থিদের হত্যা করার এরকম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে যত বেশি দালাল(?) খুন করতে পারতো সেই তত বড় বীর হিসেবে চিহ্নিত হতো।”- (ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)

অন্যান্য জেলার ন্যায় নির্মম বর্বরতার বহু করুণ ঘটনা ঘটেছে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলাতে। তার কিছু বিররণ দেওয়া যাক। ‘ছাগলনাইয়া থানার ইউপি চেয়ারম্যান ও মুসলিম লীগ নেতাকে ধরে নিয়ে শুধু নির্যাতনই করেনি, পানুয়া মাঠের মধ্যেই তাঁকে দিয়ে নিজ হাতে নিজের কবর খুঁড়িয়ে তার মধ্যে তাঁকে জোর নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে জ্যান্ত কবর দেয় আওয়ামী লীগাররা। নজরুল ইসলাম নামে একজন মুসলিম লীগ কর্মীকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে ধরে নিয়ে সারা শরীরে খেজুরের কাটা ফুটিয়ে জয় বাংলা উচ্চারণ করতে বলে। নজরুল ইসলাম ছিলেন সুসাহিত্যিক এবং মনে- প্রাণে পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি জয় বাংলা বলতে অস্বীকার করায় তাঁকেও নিজের কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হয় এবং খেজুরের ডাল দিয়ে পিটাতে পিটাতে জ্যান্ত কবর দেয়া

হয়'- (ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩) বাংলাদেশ হওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন নাগের নেতৃত্বে নোয়াখালীতে বহু আলেম ও মুহাদ্দিসকে ধরে নিয়ে লাইন বেধে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে থেকে শুনেছি বহুদিন ধরে একটি খাল আলেম ওলামাদের লাশে পূর্ণ ছিল। -(ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩) একাত্তরের চেতনার নামে কীরূপ বীভৎস নিষ্ঠুরতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়কে পরিচর্যা দেয়া হয়েছিল তার কিছু নমুনা দেয়া যাক। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন তার স্মৃতিচারনে লিখেছেন,

"১৯৭১ সালে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে যাকে কোলকাতা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে দেশপ্রেমের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হতো। শুনেছি এক পরিবারে বাপ ছিলেন পাকিস্তান সমর্থক আর ছেলে যোগ দিয়েছিল বিদ্রোহী বাহিনীতে। একরাত্রে এসে সে বর্শা দিয়ে বাপকে হত্যা করে। এবং পরদিন তারই প্রশংসা কোলকাতা থেকে প্রচারিত হয়। আর একটি ঘটনার কথা শুনেছি, সেটা ঐ রকমই লোমহর্ষক। ফরিদপুরের এক ব্যক্তি এক বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। তার শ্বশুর ছিল মুসলিম লীগের লোক। দেশে সে স্ত্রী এবং ছোট একটি মেয়েকে রেখে গিয়েছিল। একদিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও হয়। নিজ হাতে প্রথমে শ্বশুরকে হত্যা করে। পরে অনুরূপভাবে স্ত্রী ও কন্যাকেও খতম করে। এসব জঞ্জাল থাকলে দেশ উদ্ধারের কাজে বাধার সৃষ্টি হবে এজন্য সে পথের কন্টক দূর করে দিয়েছিল। তার বাবা- মা বেঁচেছিলেন কিনা জানি না, তবে আরো শুনেছি ঘরে এক বোন ছিল তাকে টেনে নিয়ে তার সহকর্মী এক হিন্দুর হাতে স্ত্রী হিসেবে সঁপে দেয়। সে যে সত্যিকার অর্থে বাঙ্গালী এবং কোনো রকমের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মানে না দুনিয়ার সামনে সে কথা প্রমাণ করার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করে। এই হত্যাকারীকে পরে রাষ্ট্রীয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়।" -(ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩)

অধ্যায় ১৪: একাত্তরে মুক্তি বাহিনীর প্রকৃত সফলতা কতটুকু?

বহু ভিত্তিহীন মিথ্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় আরেক মিথ্যাচার হয়েছে মুক্তিবাহিনীর অবদান নিয়ে। এ নিয়ে কোন বিরোধ নেই যে, মুক্তিবাহিনীর বহু হাজার সদস্য ভারতে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও গুপ্তচর সংস্থা র'এর প্রশিক্ষকদের থেকে ট্রেনিং নিয়েছিল। ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশের ভিতরে তারা বহু লড়াই এবং বহু নাশকতা তৎপরতাও চালিয়েছে। এ নিয়েও বিরোধ নেই যে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের নিয়ে স্বাধীন বাংলা মুক্তিফৌজ নামে একটি গুপ্ত সংগঠন ষাটের দশক থেকেই ভারতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। তারা বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত হামলা চালিয়েছিল এবং এসব হামলায় অনেকে প্রাণও হারিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের পরাজয় ও বাংলাদেশের সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা কতটুকু? মুক্তিবাহিনীর দাবী, স্বাধীন বাংলাদেশ তাদেরই সৃষ্টি। এ যুক্তিতে ভারতের ভূমিকাকে পাদটিকায় পাঠানো হয়েছে। এ কথাটি প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও। স্কুলের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি প্রতি বছর এ কথাটিই তারা বার বার বলে ১৬ই ডিসেম্বরে। এ কথা বলে, নিছক নিজেদের ভাবমূর্তিটাকে বড় করে তুলে ধরার লক্ষ্যে। এটি সত্য যে, মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করেছিল ৯ মাস। এ ৯ মাসে ভারত তাদের সর্বাত্মক সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহ জুগিয়েছিল।

তবে এটিও পুরাপুরি সত্য, মুক্তিবাহিনীর ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশেরও সৃষ্টিও হয়নি। কোন একটি জেলা শহর থেকেও পাক বাহিনীকে হটানো যায়নি। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের কোথাও এ সত্যটির উল্লেখ নেই। ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে ১৯৭১- এর ৩রা ডিসেম্বর। ভারতের বিশাল স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী এ যুদ্ধ করে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে। তাদের বহু হাজার সৈন্য এ যুদ্ধে হতাহতও হয়। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৬ই ডিসেম্বর, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। কথা হল,মুক্তিযোদ্ধাদের ৯ মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি অর্জিত হয়েই থাকে তবে ভারতের বিশাল বাহিনী তাদের স্থল, বিমান ও স্থলবাহিনী নিয়ে কি পাক বাহিনীর সাথে খামখা তামাশা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল? বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হাতে স্বাধীন হয়ে গেলে যুদ্ধ-

ঘোষণার প্রয়োজনটাই বা দেখা দিবে কেন? আরো প্রশ্ন, ৩রা ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশ দূরে থাক, তৎকালীন ১৭টি জেলার একটি জেলাও কি মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনা বাহিনী থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল? তারা যদি মুক্ত করেই থাকে তবে সে জেলা কোনটি?

প্রশ্ন হল, ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবেত্তাগণও কী একাত্তর নিয়ে একই রূপ ভাবেন, যেভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস বইতে পড়ানো হয় বা আওয়ামী- বাকশালী লীগ যেভাবে দাবী করে থাকেন? এ প্রসঙ্গে ভারতীয়দের রায় যে ভিন্নতর সে প্রমাণ অনেক। উদাহরণ দেওয়া যাক। একাত্তরের যুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল ম্যানেক শ'। তিনি মারা যান ২০০৮ সালের আগষ্ট মাসে। তার মৃত্যু উপলক্ষে ২৭/০৮/০৮ তারিখে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। উক্ত নিবন্ধের শিরোনাম ছিলঃ Manek Shaw: A Soldier Who Created a Nation, অর্থঃ ম্যানেক শঃ একজন সৈনিক যিনি একটি জাতির জন্ম দিয়েছেন।

ভারত জুড়ে এটি ছাপা হয়েছে। সারা দুনিয়ার মানুষ সেটি ইন্টারনেট মারফত পড়েছে। এর অর্থ দাঁড়ালো কি? এ নিবন্ধে বুঝানো হয়েছে, বাংলাদেশে যে নতুন জাতিসত্ত্বার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্ম দিয়েছেন জেনারেল ম্যানেক শ'। এখানে কোন ঘোরপ্যাঁচের আশ্রয় নেয়া হয়নি। এই একটি মাত্র নিবন্ধই একটি প্রবল বিশ্বাস ও চেতনা তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। এ নিবন্ধটি প্রচার করা হয়েছে কোন ব্যক্তি বা অখ্যাত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নয়, বরং প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার ন্যায় একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান থেকে। যারা বলে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে, তাদের মাথায় এতে বাজ পড়ার কথা। কিন্তু সেটি হয় নি। আওয়ামী বাকশালীরা এতে একটুও বিক্ষুব্ধ হয়নি,বরং নীরবে হজম করেছে। তাদের আত্ম- সম্মানে এতে একটু আঁচড়ও লাগেনি। এ নিবন্ধের বিরুদ্ধে কোনরুপ প্রতিবাদও করেনি। প্রশ্ন হল, একাত্তরে মুক্তি বাহিনীর প্রকৃত সফলতা কতটুক? তাদের সামর্থই বা ছিল কতটুকু? তাদের কি সামর্থ ছিল, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার? কেনই বা ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি যুদ্ধে নামার প্রয়োজন দেখা দিল?

ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধে নামার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, পাক- বাহিনীর পরাজিত করার সামর্থ মুক্তি- বাহিনীর ছিল না। পাক- বাহিনীর পরাজয় শুরু

হয়েছে ৩রা ডিসেম্বরে ভারতীয় স্থল, বিমান ও নৌ- হামলা শুরুর পর। আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম ও আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধ থেকে এখানেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বড় পার্থক্য। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্বের এক নম্বর বিশ্ব- শক্তিকে পরাজিত করেছিল। অন্যরা সাহায্য দিলেও এ যুদ্ধে কোন দেশের সরাসরি যুদ্ধে নামার প্রয়োজন পড়েনি - যেমনটি একাত্তরে ভারত নেমিছিল। আফগানিস্তানের মোজাহিদরা আরেক বিশ্বশক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে শুধু পরাজিতই করেনি, দেশটিকে ১০ বছরের যুদ্ধে এতটাই কাহিল করেছিল যে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়েছিল। সে পরাজয়ের পর বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। সে মৃত দেশটি থেকে জন্ম নিয়েছে ডজন খানেক স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ভিয়েতনামের প্রায় দ্বিগুণ, আর আফগানিস্তানের তুলনায় চারগুণ। তা হলে, পাক- বাহিনী কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী ছিল? অথচ সে সময় বাংলাদেশে মাত্র ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য ছিল। অথচ আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ।

বাংলাদেশে পাক বাহিনীর যে অস্ত্র ছিল আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর অস্ত্র ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ও অনেক উন্নত। পাক- বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর বিজয় যে অসম্ভব, সে বিষয়টি বুঝতে ভারত সরকারের বেশী দিন লাগেনি। মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ রেলপথ ও সড়কপথের ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া বা গ্রামের নিরস্ত্র ও প্রতিরক্ষাহীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামি, পিডিপি ও শান্তিকমিটির সদস্য, পাকিস্তানপন্থি আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে সমর্থ হলেও পাক- বাহিনীর বিরুদ্ধে তেমন কোন সফলতা আনতে পারেনি। তাছাড়া একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া ও কিছু অমুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া কোন মুসলিম রাষ্ট্রই পাকিস্তানের অখন্ডতার বিরুদ্ধে ভারত পরিচালিত যুদ্ধকে সমর্থণ দেয়নি। পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল, দেশের সমগ্র ইসলামি সংগঠন ও সকল ইসলামি ব্যক্তিত্ব। আলেমরা ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে হারাম ঘোষণা দেয়। আর পাকিস্তানের পক্ষের যুদ্ধকে বলে জ্বিহাদ। ফলে হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবক রাজাকার রূপে পাকিস্তান বাঁচানোর লড়াইয়ে যোগ দেয়। রাজাকার শব্দটি মূলতঃ ফারসী, এর অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। এ বাহিনীতে তারা যোগ দিয়েছিল আধিপত্যবাদী ভারতীয় ষড়যন্ত্র থেকে

পাকিস্তানকে বাঁচানোর তাগিদে, বেতনের লোভে নয়। এমন একজন রাজাকারের পিতার সাথে লেখকের সাক্ষাৎ হয়েছিল চাঁদপুরে। মাথায় টুপি, লুঙ্গি- পাঞ্জাবী পরিহিত মধ্যম বয়সী একজন সাধারণ মুসল্লি বলছিলেন, 'আমার এক ছেলে রাজাকার ছিল। সে শহীদ হয়ে গেছে। আরেক ছেলে আছে। তাঁকেও ইনশাল্লাহ রাজাকারে নাম লেখাবো' তাঁর ছেলে যে রাজাকার ছিল এবং সে শহীদ হয়ে গেছে এটি ছিল তাঁর জন্য গর্বের। মুক্তিবাহিনী চারিদিকে পরাস্ত হচ্ছিল এদের হাতে। লক্ষাধিক যুবক রাজাকার ও আলবদর বাহিনীতে লাগাতর নাম লেখাচ্ছিল। আলিয়া ও খারেজী মাদ্রাসার ছাত্রদের পাশে যোগ দিচ্ছিল কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পীর সাহেবদের মুরীদ এবং অরাজনৈতিক অথচ ধর্মীয় পরিবারের সদস্য। সবাই উজ্জিবীত ছিল প্যান- ইসলামি চেতনায়। একাত্তরের সংঘাত তখন সুস্পষ্ট এক আদর্শিক সংঘাতে পরিণত হয়েছিল। সত্তরের নির্বাচনে ইসলামপন্থি ও পাকিস্তানপন্থিদলগুলোর শোচনীয় পরাজয়ের বড় কারণ, তাদের মধ্যে একতা ছিল না। ফলে সে সময়ে বহু পাকিস্তানপন্থি দিকপালও পরাজিত হয়। আব্দুস সবুর খান একাত্তরের পর খুলনা জেলার তিন সিট থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। অথচ মুজিব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল, কত কুৎসিত ভাবেই না তাঁকে চিত্রিত করেছিল! কিন্তু অনৈক্যের কারণে আব্দুস সবুর খান ৭০- এর নির্বাচনে জিততে পারেননি। একাত্তরে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন অনৈক্যও দূর হয়। ভারতীয় হামলা যে বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য আসন্ন ভয়াবহ বিপদ নিয়ে আসবে তাতে তাদের সামান্যতম সংশয়ও ছিল না। এমন কি সে পরিণতির কথা মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক সময়ের রাজনৈতিক গুরু জনাব আবুল হাশিম। জনাব আবুল হাশিম ছিলেন ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের বাংলা প্রদেশ শাখার সেক্রেটারি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব জনাব আবুল হাশিমের সংস্পর্শে আসেন।

সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের বিজয়ের পর জনাব আবুল হাশিম তাঁকে কি বলেছিলেছেন সে বিবরণ শোনা যাক একজন প্রত্যক্ষদর্শী থেকে। “নির্বাচনের পর পরই আমি আবুল হাশিমের বাসায় বসা। হঠাৎ দেখি মুজিব এবং জহিরুদ্দীন (আওয়ামী লীগের নেতা ও ১৯৭০ এর নির্বাচনে মোহম্মদপুর- ধানমন্ডি এলাকা থেকে নির্বাচিত এমএনএ) হাশিম সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয় নির্বাচন জিতে সৌজন্য সাক্ষাত

করতে এসেছিলেন তাঁরা। হাশিম সাহেব বললেন, মুজিব আমি শুনেছি কাইয়ুম ও দৌলতানার মুসলিম লীগ তোমাকে ভূট্টোর বিরুদ্ধে সমর্থন দিতে রাজি হয়েছে। খেলার মাঠে ভাল দল কখনও মারা মারি করে না। ...তোমার প্রতি আমার অনুরোধ তুমি প্রোভোকেশনে যাবে না। আমি দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি। আমি জানি তোমাকে অসৎ পরামর্শ দেয়ার লোকের অভাব নেই। আশাকরি তুমি সেটা থেকে দূরে থাকবে। তুমি তো জানো আমি (পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান থেকে) এখানে এসেছি সর্বহারা মুহাজির হয়ে। পশ্চিম বঙ্গে আমার সবই ছিল। ওখানে থাকতে পারিনি। আমার আত্নীয়- স্বজনেরাও ওখানে অনেকে আছে। যতদূর জানি তাদের অবস্থা ভাল না। তুমি নিজেও পাকিস্তান আন্দোলন করেছ। হয়তো পাকিস্তান পেয়েও আমাদের অনেকের অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়ীত হয়নি। তা সত্ত্বে এ দেশ আমারাই তৈরি করেছি। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এটা আরো সুন্দর হবে”। - (ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩)

কিন্তু যে ব্যক্তি পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছেন ১৯৪৭ সাল থেকেই এবং বহু বছর আগেই জড়িত পড়েছেন ভারতীয় র’এর সাথে তার উপর জনাব আবুল হাশিমের মুরব্বী সুলভ নসিহত কোন কাজই দেয়নি। জনাব আবুল হাশিম সাহেবের মনে ভারতীয় ষড়যন্ত্র নিয়ে যে প্রচন্ড আশংকা ছিল, একাত্তরের পর যেটি প্রমাণিতও হয়েছিল - সেটি ইসলামি চেতনা সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই কাজ করছিল। ফলে ৭০এ যে ঐক্য তাদের মধ্যে অসম্ভব ছিল সেটি ৭১- য়ে অতি সহজসাধ্য হয়। এমনকি বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী ভারতীয় ষড়যন্ত্রের বিপদ বুঝতে পারে। ভারতে অবস্থানকালে সেখানকার নিপীড়িত মুসলমানদের থেকে পাকিস্তান ভাঙ্গার সাথে জড়িত থাকার কারণে তাদের অনেকে তিরস্কৃত হয়েছেন। অনেকে বীরূপ অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারত থেকে ফিরেও আসে। আরো অনেকে ফিরে আসার প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। কেউ কেউ ডাঃ মালেক মন্ত্রীসভার মন্ত্রীও হয়। মোশতাক আহম্মদসহ অনেকে ভারত থেকে ফিরে আসার পরিকল্পনা করছিল। চীনপন্থি রাজনৈতিক দলগুলিরও অনেকে পাকিস্তান ভাঙ্গার ভারতীয় ষড়যন্ত্রের বিরোধীতা শুরু করে। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টির আওয়ামী- বাকশালীদের পরিকল্পনার এরা এতটাই বিরোধী ছিল যে, ৭১- এর পরও নিজদের দলের নাম পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি রাখে। অপর দিকে মুক্তি বাহিনীর মধ্যেও দ্রুত হতাশা বাড়ছিল। একাত্তরে দেশে প্রচন্ড বন্যা হয়েছিল। এতে জুন-

জুলাই- আগষ্ট- সেপ্টেম্বর মাস অবধি মুক্তিবাহিনীর যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। হামলার পর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সহজেই বিল, হাওর ও নদীর চরে আশ্রয় নিতে পারত। কিন্তু অক্টোবর- নভেম্বরে পানি নেমে যাওয়ায় তাদের বিপদ বাড়ছিল। ফলে চরম হতাশা নেমে আসছিল মুক্তিবাহিনীর মধ্যে। সে সময়ের হতাশা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর পাবনা সদর থানার এক সদস্য লেখককে বলেছিলেন,

“একাত্তরের বন্যার সময় আমরা নৌকা নিয়ে থাকতাম পদ্মার চরে। চারিদিকে পানি আর পানি। সেখানে রাজাকার বা পাক- বাহিনীর পক্ষে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নভেম্বরে যখন পানি নেমে যেতে লাগল তখন আমাদেরও বিপদ বাড়তে লাগল। ঘন ঘন রাজাকারদের হামলা শুরু হল। কতদিন আর পালিয়ে পালিয়ে থাকা যায়? দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। আর কোন দিন বাড়ীতে ফিরতে পারবো কিনা সে দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হত না। ডিসেম্বরে ভারতের হামলা শেষ রক্ষা করেছে”।

ভারতের বুঝতে বাঁকী থাকেনি, ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মোক্ষম সুযোগটি দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ভারতের পক্ষ থেকে সরাসরি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর এটিই মূল কারণ। ভারতের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বড় কথা ছিল না। মূল লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করে শক্তিহানী করা। কারণ শেখ মুজিব যাই বলুক না কেন, ভারত ভালই জানত, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা ভারতের পশ্চিম বাংলার মানুষ ভোগ করে না। এটিও জানত, ১৯৪৭- এর পর ঢাকায় যে উন্নয়ন হয়েছে তা কোলকাতার মানুষ চোখেও দেখেনি। কোলকাতায় যা হয়েছে তা ১৯৪৭- এর পূর্বে। কারণ, ১৯১১ সাল অবধি এ শহরটি সমগ্র ভারতের রাজধানী ছিল। ভারতের লক্ষ্য শুধু পাকিস্তানকে দূর্বল করা ছিল না। মূল লক্ষ্য ছিল, উপমহাদেশের মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করা।

ভারতের লক্ষ্য যদি স্বাধীন ও শক্তিশালী বাংলাদেশের নির্মাণ হত, তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাদবাকী অস্ত্র- শস্ত্র, যানবাহন ও সম্পাদ নিজেরা না নিয়ে বাংলাদেশে রেখে যেত। কিন্ত ভারত তা করেনি। দরিদ্র বাংলাদেশীদের সুখ- শান্তি তাদের কাম্য হলে হাজারো মাইল ব্যাপী সীমান্ত খুলে দিয়ে সীমাহীন লুন্ঠন করত না। জাল নোট ছেপে পঙ্গু করত না

বাংলাদেশের অর্থনীতি। তারা শুধু পাকিস্তানের মেরুদন্ডই ভাঙ্গেনি, মেরুদন্ড ভেঙ্গেছে বাংলাদেশেরও। বাংলাদেশ যে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছিল তার জন্য শুধু শেখ মুজিব ও তার দলীয় দুর্বৃত্তরাই শুধু দায়ী নয়। দায়ী ভারতীয় দুর্বৃত্তরাও । একটি দেশের তলা হল তার সীমান্ত। সেটি দেশের সম্পদ চোরাচালানের মারফত হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। তাই তলা ছিদ্র হলে বা খুলে যাওয়াতে লাভ হয় প্রতিবেশীর, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটি হলে সম্পদ গিয়ে উঠে ভারতে। আর মুজিবামলে বস্তুতঃ সেটিই ঘটেছে। দেশের ও বিদেশের দেওয়া সম্পদ তখন বাংলাদেশের নিজ ভান্ডারে না দাঁড়িয়ে সরাসরি গেছে ভারতে। বিপুল ভাবে যায় খাদ্যশস্য, ফলে ৭৪- এ বহু লক্ষ মারা গেছে দুর্ভিক্ষে। অপরদিকে যুদ্ধ শুরু করার মধ্য দিয়ে তারা পুরা দেশ জুড়ে লুটপাটের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘ দিন দেশ ছিল তাদের দ্বারা অধিকৃত। পুরাদেশটাকে তারা মনে করে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার।

ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের সর্বত্র গেছে ইচ্ছামত। ব্যাংক- বীমা, সরকারি গুদাম ও অফিস- আদালত, সেনানিবাস, কলকারখানা সর্বত্র ছিল তাদের মুক্ত পদচারণা। খুঁজে খুঁজে তারা তুলে নিয়ে যায় বাংলাদেশের দামী সম্পদ যা পাকিস্তানে আমলের ২৩ বছরে জমা হয়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করার আরেক কারণ তো এটিই। এটি ছিল এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের মত অবস্থা। পাকিস্তানকেও যেমন খন্ডিত করতে পারল, তেমনি সম্পদ লুন্ঠনেরও অধিকার পেল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র- শস্ত্রই শুধু নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেছে তৎকালীন সরকারের হাজার হাজার সামরিক- বেসামরিক গাড়ী, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ও বগি, সামুদ্রিক জাহাজ এবং ব্যাংকে গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রা। এমনকি সরকারী অফিস, সেনাবাহিনীর মেস এবং সরকারি রেস্ট হাউস থেকে তারা ফ্যান, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। লুন্ঠনের ফল দাড়ালো, একাত্তরের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে কোন ট্যাংক ছিল না এবং বিমান বাহিনীর হাতে কোন বিমানও ছিল না। লক্ষ্যণীয় যে, একাত্তরের ইতিহাস যারা লিখেছেন তারা এনিয়ে কিছুই লেখেননি। বরং দস্যুচরিত্রের ভারতকে চিত্রিত করেছে অকৃত্রিম বন্ধু রূপে।

অধ্যায় ১৫: পাকিস্তানের সমর্থনের অর্থ কি জালেমের সমর্থন?

অনেকেরই যুক্তি, একাত্তরে পাকিস্তানের সমর্থন করার অর্থ ছিল জালেমের সমর্থন করা। তাদের প্রশ্ন, এমন জালেমকে সমর্থন করা কি ইসলামসম্মত? তাদের কথা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেহেতু জালেম, দেশটিকে তাই আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না। ফলে তারা সর্বশক্তি বিনিয়োগ করে পাকিস্তানের বিনাশে। এ যুক্তিতে ইসলামের শত্রুশক্তি বা কাফের শক্তির সাথে জোট বাঁধাটাও তাদের কাছে আদৌ দোষের মনে হয়নি। ফলে তারা ভারতকে ডেকে আনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সাদ্দাম হোসেন অতি জালেম - এ যুক্তি দেখিয়ে একই ভাবে ইরাকের মার্কিন তাঁবেদার পক্ষটি নিজ দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে অনিবার্য করে তোলে। এভাবে তারা ত্বরান্বিত করে দেশটির সর্বাত্মক ধ্বংসের কাজ। জালেম হটানোর এমন হটকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যেই দেশটির ৬ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। পঙ্গু হয়েছে ১০ লাখেরও বেশী। উদ্বাস্তুর বেশে দেশে- বিদেশে ঘুরছে প্রায় ৩০ লাখ। ফালুজার মত বহু শহর মাটিতে মিশে গেছে। এখনও সে বিনাশকর্ম পুরাদমে চলছে। কোন ঘরেই বিষাক্ত সাপের প্রবেশ অস্বাভাবিক নয়। তবে আহাম্মকি হল সে সাপের কারণে ঘরে আগুন দেওয়া। অথচ ধৈর্য ধরলে হয়ত বিষাক্ত সাপটি নিজে নিজেই সরে যেতে পারে। না সরলে সে সাপটিকে মারা যেতে পারে।

কিন্তু তাই বলে ঘরের বিনাশ কি কোন সুস্থ্য মানুষের কাম্য হতে পারে? বিষয়টি অভিন্ন কোন দেশে জালেম শাসকের অপসারণের বিষয়েও। মূল লক্ষ্য হতে হবে সে জালেমকে হটানো। দেশের বিনাশ নয়। যে স্বৈরাচারি ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে এত অভিযোগ সে কিন্তু ১৯৭২ এ ক্ষমতা থেকে নেমে গিয়েছিল নিজে থেকেই। এ জন্য পাকিস্তানীদের কোন আন্দোলন করতে হয়নি। জেনারেল ইয়াহিয়ার চেয়েও শক্তিধর এবং অভিজ্ঞ স্বৈরাচারি শাসক আইয়ুব খানকে সরাতেও কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। একটি গণ- আন্দোলনই সে লক্ষ্যে যথেষ্ট ছিল। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জালেম সরানোর এটিই তো বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক পথ। তাই প্রশ্ন, ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার যতই জালেম হোক,সে জন্য কি একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনিবার্য ছিল? সে যুদ্ধে ডেকে আনতে হবে ভারতের ন্যায় চিহ্নিত শত্রু শক্তিকে? অথচ আওয়ামী লীগ তাই

করেছে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর কথা ছিল ১৯৭১ এর ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের (পার্লামেন্ট) বৈঠক বসবে। এ সংসদের দায়িত্ব শুধু সরকার গঠন ছিল না,মূল দায়িত্ব ছিল একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করা। প্রেসেডেন্ট ইয়াহিয়া খান চাচ্ছিল বৈঠকের আগেই প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্রেও মৌলিক কিছু বিষয়ে আপোষ হোক। আওয়ামী লীগ যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সাক্ষও কেও নির্বাচন করেছিল সেটিও তারা মানতে রাজী ছিল না। ইয়াহিয়া খান প্রস্তাব রেখেছিল শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী ও ভূট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে একটি সরকার গঠনের। আলোচনার শেষ দিনে শেখ মুজিব জানিয়ে দিল,পাকিস্তানে ফেডারেল সরকার গঠন নিয়ে তাদের আগ্রহ নেই। শেখ মুজিব দাবী করছিল, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা তার হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। এবং সেনা বাহিনী অপসারণ করা হোক।

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বহু নেতা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নির্মাণ করেছিল ষাটের দশকেই। তারা মোক্ষম সুযোগ খুঁজছিল বাংলাদেশের মাটিতে সেটি উত্তোলনের। একাত্তরের পর সে পরিকল্পনার কথা এসব নেতারা বহুবার বলেছেন। ফলে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যতই রাজনৈতিক আপোষের চেষ্টা করুক না কেন আওয়ামী লীগ অপেক্ষায় ছিল তেমন একটি সুযোগের। পাকিস্তানকে জালেম শাসক মুক্ত করা বা দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এজন্যই শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের কাছে সে সময় আদৌ কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। বরং লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে খন্ডিত করা। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ তৎকালীন সরকারের দেওয়া ৮ দফা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক মেনে নিয়ে নির্বাচনে নামে। এর অর্থ ছিল অখন্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া। কিন্তু নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ তাদের সে কথা ভূলে যায়। এমন সব দাবী করে যাতে পাকিস্তানের পক্ষে অখন্ড অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে অকার্যকর ও অনর্থক হয়ে পরে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন্ন বৈঠক। এমন এক অচল অবস্থায় ১৯৭১ এর ১লা মার্চে এক বেতার ভাষনে ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবি করেন। মুলতবী করলেও আলোচনার পথ তিনি খোলা রাখেন। কদিন পরই ২৫ মার্চে আবার জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে অধিবেশনে যেতে অস্বীকার

করে। বরং দেশ জুড়ে শুরু করে সন্ত্রাস এবং সে সন্ত্রাসের শুরু ১লা মার্চ থেকেই।

পহেলা মার্চে পার্লামেন্ট অধিবেষন মুলতবি ঘোষণার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের কর্মীগণ মারমুখো আক্রোশ নিয়ে রাস্তায় নামে। ঐদিন ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট খেলা চলছিল। খেলার মাঠে সামিয়ানায় আগুন দেওয়া হয়। পন্ড হয় খেলা। খেলোয়াড়গণ সে সময় দৌড়িয়ে মাঠ ছাড়ে। (লেখক নিজে সে সময় দর্শকের গ্যালারিতে ছিলেন।) শুরু হয় তৎকালীন জিন্নাহ এ্যাভিনিউয়ের (বাংলাদেশ আমলে যার নাম হয় বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ) অবাঙ্গালীদের দোকান লুটপাঠ। তখন লুন্ঠিত হয় গ্যানিস নামে ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টাল শপ। (সে লুটপাটের দৃশ্য লেখক নিজ চোখে দেখেছেন।) অবাঙ্গালীদের উপর হামলা ও তাদের সম্পদ লুন্ঠনের তান্ডব শুধু ঢাকাতে সীমিত থাকেনি। শুরু হয়েছিল দেশ জুড়ে। কিন্তু সে জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ কোন ভূমিকাই রাখেনি। এমনকি বাংলাদেশের ইতিহাসের লেখকদের জবানবন্দীতে সেটি ধরা পড়েনি। ফলে পাকিস্তান ভাঙ্গার লড়াইকে যারা জালেম ও জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই বলেন, সে জুলুম বিরোধী চেতনাটি এখানে ধরা পড়ে না। তাদেরকেই বরং প্রচন্ড জুলুমবাজীতে নামতে দেখা যায় অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগের অপরাধ, তাদের টার্গেট দেশের জালেম শাসক ছিল না। ছিল দেশ। লক্ষ্য ছিল দেশটির বিনাশ। তাই পাকিস্তানে যখন ইয়াহিয়া খান বা টিক্কা খান ছিল না, ২৫ শে মার্চের সামরিক এ্যকশনও হয়নি তখনও শেখ মুজিব দেশটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছেন এবং সেটি ১৯৪৭ থেকেই। শেখ মুজিব নিজেই বলেছেন তিনি (পাকিস্তান ভেঙ্গে) বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেন ১৯৪৭ থেকেই। (সুত্রঃ পাকিস্তান থেকে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানের জনসভায় দেওয়া তার ভাষণ।) এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি আগরতলা গেছেন। ভারতীয় গোয়েন্দাদের সাথে ষড়যন্ত্রে নেমেছেন। এবং নিজ দলীয় নেতা চিত্তরঞ্জন সুতারকে ভারতে পাঠিয়েছেন। তাই ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের জুলুমের কথা বলে যারা একাত্তরের আওয়ামী লীগের যুদ্ধকে জায়েজ বলতে চান সেটি কি সমর্থণযোগ্য? ইসলামে মানুষ হত্যা দূরে থাক অনর্থক গাছের ডাল ভাঙ্গা বা পাতা ছেঁড়াও জুলুম। তবে মানব হত্যার চেয়েও গুরুতর জুলুম হল একটি দেশের ভূগোলকে হত্যা

করা বা খন্ডিত করা। ইসলামে এমন বিভক্তিকে বলা হয়েছে ফিতনা। মানব হত্যার চেয়েও এটিকে ক্ষতিকর বলা হয়েছে। ভূগোলের উপর হামলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ- নাশই শুধু হয় না, কোটি কোটি মানুষের নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়। যে ক্ষতির শিকার আজ ইরাক ও ফিলিস্তিনের মানুষ। বহু ক্ষেত্রেই সে বিপদটি আসে শত শত বছরের জন্য। দুর্বৃত্ত খুনিদের হাতে প্রতি দেশেই বহু মানুষ খুন হয়। বহু মহিলা ধর্ষিতাও হয়। কিন্তু এ জন্য কোন দেশেই যুদ্ধ হয়না। এমন হত্যা,ধর্ষণ ও জুলুম থেকে দেশবাসীকে বাঁচানোর দায়িত্ব দেশের আদালতের। সংসদ, মিডিয়া বা রাজনৈতিক জনসভায় তা নিয়ে তুমুল আলোচনা হতে পারে। আন্দোলনও হতে পারে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়কে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে সে অভিযোগেরও নিস্পত্তি হওয়া উচিত ছিল দেশের আদালতে। সেটিই সভ্য সমাজের নীতি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পথে যায়নি। তারা বেছে নিয়েছে প্রকান্ড যুদ্ধের পথ।

২৫শে মার্চের পূর্বে ১লা মার্চ থেকেই ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীগণ প্রকাশ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। তাই একাত্তরে সবচেয়ে বড় জুলুমটির শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেই। আর সেটি হল উপমহাদেশের মুসলমানদের নিজস্ব আশা- আকাঙ্খা, নিরাপত্তা ও ইজ্জত নিয়ে বাঁচার বিরুদ্ধে। বিশ্বের বুকে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র নির্মাণের যে স্বপ্ন নিয়ে তারা এগুচ্ছিল আওয়ামী লীগের হামলা ছিল সেটির বিরুদ্ধেও। আগ্রাসী হামলাকারির হাত থাকে এক ইঞ্চি ভূগোল বাঁচাতে প্রতিটি দেশের মানুষই প্রাণ- পণে যুদ্ধ লড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের নানা দেশে ৭ কোটিরও বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তো সে ভূগোল বাঁচানোর যুদ্ধে। বৃহৎ ভূগোলের গুরুত্ব যে শুধু যে ইউরোপীয়রা বুঝে তা নয়। মুসলিম দেশের ভূগোল বাঁচানোর এমন প্রতিটি যুদ্ধই ইসলামে জ্বিহাদ। যারা সে জ্বিহাদে মারা যায় ইসলাম তাদেরকে মৃত বলে না। বলে মৃত্যুহীন শহিদ। আল্লাহতায়ালার কাছে তারা এতই প্রিয় যে মৃত্যুর পরও তিনি তাদেরকে খোরাক দিয়ে থাকেন। উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানিয়া আমলে বহু জালেম ব্যক্তি খলিফা হয়েছেন। কিন্তু তাদের কারণে জ্বিহাদের ন্যায় ফরয ইবাদত থেমে থাকেনি। যেমন বন্ধ থাকেনি নামায- রোযা। মুসলমানগণ জ্বিহাদ করেছেন। শহীদও হয়েছেন। ইয়াহিয়া খান যত স্বৈরাচারিই হোক,নিজ দেশ বাঁচানোর জ্বিহাদ থেকে কোন পাকিস্তানী কি দায়িত্বমূক্ত হতে পারেন? দায়িত্বমূক্ত থাকতে পারেনি তৎকালীন

পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগণ পূর্বপাকিস্তানীরাও। এমনই একটি চেতনা নিয়েই দেশের সমুদয় ইসলামপন্থিরা একাত্তরে পাকিস্তান বাঁচানোর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। একাত্তরে তারা পাকিস্তানকে নিজেদের দেশ মনে করতেন, যেমনটি ভাবতেন ১৯৪৭ এ। অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আওয়ামী লীগের কৃত অপরাধগুলোকে যেমন তারা সমর্থন করেনি তেমনি সমর্থন করেনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপরাধগুলোকেও। কোন দেশের সব মানুষই কি এক ও অভিন্ন চেতনার হয়? ভিন্ন ভিন্ন চেতনার মানুষেরা প্রতিদেশেই বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে বাস করে। স্বৈরাচারি জেনারেল ইয়াহিয়ার এজেন্ডাকে তাই ইসলামপন্থিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কি যথাযথ? সে সময় ইসলামপন্থিদের এজেন্ডা ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণ। সে লক্ষ পুরণে তারা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিল পাকিস্তানের অখন্ডতার সংরক্ষন। অথচ মুজিব বা আওয়ামী লীগ ইসলামে এতটাই অঙ্গীকারশূণ্য ছিল যে পাকিস্তানের খন্ডিতকরণ বা দেশটির বিনাশকে আদৌ জুলুম মনে হয়নি। বরং চিহ্নিত শত্রুর সাথে একাত্ম হয়ে তারা নিজেরাই দেশটির বিরুদ্ধে জুলুমে লিপ্ত হয়েছিল। সফলও হয়েছিল। তাদের সে সফলতা প্রচন্ড উৎসব বয়ে এনেছিল দিল্লির শাসক মহলে। দেশকে তারা তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি বা দেশে অসংখ্য জালপড়া দুঃখী বাসন্তি সৃষ্টি করলে কি হবে ভারতের মুসলিমবিরোধী মহলে সেদিন আনন্দের প্রচন্ড হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিল।

অধ্যায় ১৬: পাকিস্তানপন্থিগণ কি স্বাধীনতার বিপক্ষ-শক্তি?

যাদেরকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি রূপে চিত্রিত করা হচ্ছে তারা কি আদৌ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল? এ নিয়ে বিবাদ নেই, তারা অখন্ড স্বাধীন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। তারা বিরোধীতা করেছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার। তখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ছিল পূর্বপাকিস্তানীরা, তাই পাকিস্তান স্বাধীন হলে সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকগণ পরাধীন হয় কি করে? বরং সে দেশ ভাঙ্গার অর্থ বাংলাদেশের চেয়ে ছয়গুণ বৃহৎ দেশের উপর বৈধ শাসনের যে ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের ছিল সে অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা। এজন্যই কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠরা দেশবিভক্তির সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধীতা করে। প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও লড়ে। অথচ পাকিস্তানে উল্টোটি ঘটেছে, দেশটি বাঁচাতে দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠরা লড়েছে। আর ধ্বংসে নেমেছিল সেদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। একেই বলা যায় একটি নিরেট আত্মঘাত। নিরোদ চৌধুরি কোলকাতা কেন্দ্রীক বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের অনেক আগেই আত্মঘাতি বলেছেন, কিন্তু আত্মঘাতে বিশ্বকে তাক লাগিয়েছে তাদের ঢাকার শাগরেদরা। কোলকাতার আত্মঘাতি বুদ্ধিজীবীদের কারণেই ১৯৪৭ এ বাংলা বিভক্ত হয়েছিল। এবং পশ্চিম বাংলা পিছিয়ে গেল ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে; শুধু রাজনীতিতে নয়, জ্ঞানবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতেতেও।

আত্মঘাতি ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কারণেই বাংলার মানুষ তাদের নিজ দেশের চেয়ে ৬ গুণ বৃহৎ দেশ সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। এবং পিছিয়ে গেল সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে। তারা আণবিক শক্তিতে পরিণত হল, আর বাংলাদেশ অর্জন করলো তলাহীন ঝুড়ি রূপে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি। বিতন্ডা ও সংঘাত ছাড়া দেশের স্যেকুলার পক্ষটির থলিতে দেওয়ার মত কিছু নেই। যে সমাজতন্ত্র নিয়ে এক কালে তারা গর্ব করত সেটি আজ আবর্জনার স্তুপে। সত্তরের দশকে মুজিববাদ নিয়ে তারা প্রচন্ড প্রচার শুরু করেছিল, যেন সেটিকে বিশ্বজনীন করে ছাড়বে। মুজিববাদের উপর তখন বড় বড় বইও লেখা হয়েছিল। মুজিবভক্ত সেদিন প্রচার করত, মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের

চেয়েও নাকি সেটি কালোপযোগী। কিন্তু সেটি কবরস্থ হয়েছে মুজিবের মৃত্যুর আগেই। আর স্যেকুলারিজমের কথা? পবিত্র কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় সেটিও বাজার পাচ্ছে না বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশে। কোরআন চায় আল্লাহর বিধানের প্রতিষ্ঠা। সে বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যক্তির অঙ্গিকার ও আত্মবিণিয়োগ দিয়ে যাচাই হয় তার ঈমান। অথচ স্যেকুলারিজম চায়, আল্লাহর বিধানকে রাজনীতির বাইরে রাখতে- যাতে সেটি প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই না পায়। মুজিবামলে সেটিই হয়েছিল। ইসলামের নামে রাজনীতি বা সংগঠিত হওয়ার কাজকে তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। কোন দ্বীনদার মানুষ কি এমন জাহেলী মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে? পার্থিব বা ইহজাগতিক লাভ-লোকসানই হলো স্যেকুলার রাজনীতির মূল প্রসঙ্গ। সেখানে অনন্ত অসীম কালের পরকালীন সুখ-শান্তির ভাবনা হল সাম্প্রদায়ীকতা। সেকুলার রাজনীতিতে তাই এটি অপ্রাসঙ্গিকই শুধু নয় অপরাধমূলকও। তারা চায়, মুসলমান তার ইসলামে অঙ্গিকার জায়নামাযে রেখে প্রশাসন, বিচার বা রাজনীতিতে প্রবেশ করুক। অথচ হৃৎপিন্ডের ন্যায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকারটি তার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামী পরিভাষায় সেটিই ঈমান। ব্যক্তির কর্ম বা আচরণ থেকে এমন অঙ্গিকার বিচ্ছিন্ন হলে তার ঈমানই বাঁচে না। যেমন দেহ বাঁচে না হৃৎপিন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলে। ফলে মুসলমানের রাজনীতি স্যেকুলার হয় কি করে? ইসলামে এটি হারাম। এজন্যই বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের আশু মৃত্যু অনিবার্য। তারা বেঁচে আছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের চেতনায় ইসলাম- বিষয়ে বিরাজমান অজ্ঞতার কারণে। যে সময়টিতে তাদের জয়জয়কার, বাংলা ভাষায় তখন ইসলামের উপর তেমন বই ছিল না।

বাংলাভাষায় ইসলামের উপর যত বই লেখা হয়েছে তার সম্ভবতঃ শতকরা ৯০ ভাগ লেখা হয়েছে একাত্তরের পর। ফলে যতই বাড়ছে ইসলাম চর্চা, কর্পূরের মতই ততই হাওয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির সর্বশেষ এ পুঁজি। তাই মরণের ভয় ঢুকেছে বাংলাদেশের স্যেকুলার মহলে। রাজনীতিতে নিছক বেঁচে থাকার স্বার্থে তারা নিজেদের একাত্তরের ভূমিকাকে ব্যবহার করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে এটিই হল তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। একাত্তরের যুদ্ধ ছিল দুটি দর্শনের, দুটি জীবন- চেতনার। একাত্তরের যুদ্ধ শেষ হলেও এদুটি চেতনার মৃত্যূ হয়নি। ফলে বেঁচে আছে সংঘাতের

উপকরণ বা প্রেক্ষাপটও। আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে উত্তাপ তা তো সে কারণেই। ভারতপন্থি বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদি শক্তি সেদিন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পরাজয় ও পাকিস্তান ভাঙতে পারলেও প্যান- ইসলামি চেতনার পরাজয় ঘটাতে পারিনি। বরং বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদের চেয়েও প্রবল ভাবে বেঁচে আছে ইসলামি চেতনা। সে প্যান- ইসলামি চেতনা বাড়ছে এখন বিশ্বব্যাপী। মুসলিম মনে অঙ্গিকার বাড়ছে ইসলামের বিজয় ও মুসলমানের গৌরব বাড়াতে। এ লক্ষ্যে দেশে দেশে মুসলমানগণ একতাবদ্ধও হচ্ছে। ফলে লেবাননে ইসরাইলী বোমা পড়লে লাখো মানুষের ঢল নামে জাকার্তা, কায়রো বা ইস্তাম্বুলের রাজপথে। কাবুল বা বাগদাদে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে মিছিল হয় ঢাকা, করাচী ও কুয়ালালামপুরের ন্যায় নানা মুসলিম শহরে। বরং দিন দিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সেটি তীব্রতর লড়াকু রূপ নিচ্ছে। ১৯৪৭ এ এমন এক চেতনার বলেই বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর প্রদেশ তথা ভারতের নানা প্রদেশের মুসলমানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ, হিন্দু ও শিখদের প্রবল বিরোধীতার মুখে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমন চেতনার প্রবলতায় উদ্বেগ বাড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইসরাইলসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তির। তারা ইসলামি চেতনার উত্থান রুখতে প্রতি মুসলিম দেশে বিশ্বস্ত পার্টনার খুঁজছে। এতে তাদের সফলতাও মিলছে।

বাংলাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইসরাইল ও ভারতীয়দের অতি বিশ্বস্থ মিত্র হল এসব স্যেকুলার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীগণ। তাদের হাত দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি ও মিডিয়া জগতে শত শত মিলিয়ন ডলারের বিণিয়োগ ঘটছে। ফলে মাত্র কিছুদিন আগেও যাদের পক্ষে নিজ অর্থে একখানি দোকান খোলাও অসম্ভব ছিল তারা এখন রমরমা টিভি চ্যানেল বা বিশাল আকারের দৈনিক পত্রিকা বের করছে। তাদের অর্থে রাজনৈতিক দলের নেতা, এনজিও পরিচালক, পত্রিকার কলামিষ্ট ও বুদ্ধিজীবীর বেশে ময়দানে নেমেছে হাজার হাজার ব্যক্তি। বাংলার মাটিতে কোনকালেই মিরজাফরদের অভাব পড়েনি। বরং আজ তারা বিপুল সংখ্যায়। বিদেশী মদদে তারা জিদ ধরেছে, দেশের ইসলামপন্থিদের নির্মূল করতেই হবে। চায়, একাত্তরের ন্যায় আরেকটি ভয়ানক যুদ্ধ। বাংলাদেশ সৃষ্টির বহুকাল পরেও আজ ইসলামাপন্থিদের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারের মূল কারণ হল এটি। ১৯৪৭ সালে যে ভৌগলিক এলাকা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে এলাকায় বর্তমানে

৩০ কোটি মানুষের বাস। জনসংখ্যায় চীন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই এর অবস্থান। বিশ্বরাজনীতিতে মুসলমানদের মূল এজেন্ডা মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে নয়। বরং মাথা তুলে দাঁড়ানো নিয়ে। নইলে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেই মুসলমানদের দখলে যে ভৌগলিক এলাকা ছিল তা দিয়ে ১০০টিরও বেশী বাংলাদেশ সৃষ্টি করা যেত। প্রতি ভাষাভাষিদের জন্য একেকটি রাষ্ট্র সৃষ্টিকে ন্যায্যতা দিলে একমাত্র ইরানেই সৃষ্টি হত কমপক্ষে অর্ধ- ডজন বাংলাদেশের আয়তনের ন্যায় রাষ্ট্র। কারণ সেখানে ফারসী, তুর্কি, আরব, বেলুচ, কুর্দ, লোর, তুর্কমানীসহ এক ডজনের বেশী বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের বাস। কিন্তু সেদিন তা হয়নি। নানা ভাষার মুসলমানেরা জন্ম দিয়েছে বিশাল এলাকার এক অখন্ড মুসলিম ভূগোলের। যা সেদিন ছিল বিশ্বের এক নম্বর বিশ্বশক্তি। সে সময়ের অপর বিশ্বশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য পরাজিত হয়েছিল তাদের হাতেই। আজও মুসলমানদের সামনে ইজ্জত নিয়ে বাঁচার এটিই একমাত্র মডেল। পবিত্র কোরআন ও নবীজীর (সাঃ) আদর্শ মুসলিম মনে এমনই একটি প্যান- ইসলামী চেতনার জন্ম দেয়। এজন্যই যখন ইরাক, সূদান বা ইন্দোনেশিয়া ভেঙ্গে আরো কয়েক টুকরা মুসলিম রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা হয় তাতে কোন ঈমানদার মুসলমান বেদনাসিক্ত না হয়ে পারে না। পাকিস্তান ভাঙ্গাতেও তেমনি বেদনাসিক্ত হয়েছে সারা দুনিয়ার মুসলমান। এবং সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল তারা যারা মুসলমান নর- নারীদের জীবন্ত আগুণে ফেলা, তাদের ঘরবাড়ি লুট করা বা তাদের নারীদের ধর্ষণ করাকে বিজয় উৎসব মনে করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর কোন মুসলিম দেশই যে স্বীকৃতি দানে এগিয়ে আসেনি তার কারণ তো এটাই।

শত বছর আগে তুরস্কের ওসমানিয়া খেলাফতকে খন্ডিত করার এমনই চেষ্টা হয়েছিল বলকান এলাকায়। শত্রু শক্তি সেদিন যুদ্ধ শুরু করেছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে। তখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশের বিপদে তাদের সাথে একাত্ম হয় এমন কি বাংলার মুসলমানগণও। খলিফাকে সাহায্য করতে ঘরে ঘরে তারা মুষ্টির চালের হাঁড়ি বসিয়েছিল। কেউ কেউ সুদুর বলকানে ছুটে গিয়েছিলেন খলিফার বাহিনীকে সাহায্য করতে। একাত্তরে এমন একটি চেতনা কাজ করেছিল ইসলামের চেতনাধারিদের মাঝে। এমন কাজে মৃত্যুবরণ করলে তারা যে শহীদ হবে এ নিয়ে সে সময় কোন আলেমের মাঝেই সন্দেহ ছিল না। এমন একটি বলিষ্ঠ চেতনা এ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ

করা হয়নি। বরং তাতে চাপানো হয়েছে মনগড়া মটিভের কথা। তাদের কাজ নাকি ছিল, পাঞ্জাবী মিলিটারিদের নারী সাপ্লাই দেওয়া! বাংলাদেশের সৃষ্টিতে যারা সর্বপ্রকার সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য দিল তাদের সবগুলিই কেন অমুসলিম দেশ? বাংলাদেশের সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করতে কেনই বা ভারত নিজেদের অর্থ ও রক্ত ব্যয়ে প্রকান্ড একটা যুদ্ধ করল? কেনই বা যুদ্ধ শেষে ভারত বাংলাদেশে ব্যাপক লুণ্ঠন শুরু করল, বহু শত কোটি টাকার জালনোট ছেপে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে আনল এবং দেশটিকে একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিল? এ প্রশ্নগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এ নিয়ে পাঠ্য বইগুলোতে আলোচনা হয়নি।

১৯৪৭এ অখন্ড ভারতপন্থিদের যে পরাজয় হয়েছিল ১৯৭১এ এসে তারা সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল। যুদ্ধ কোন দেশেই মধুর বন্যা আনে না, আনে রক্তের। যুদ্ধে অপরাধ ঘটে যুদ্ধরত উভয় পক্ষ থেকে। কিন্তু যখন সকল হত্যার জন্য দোষ চাপানো হয় শুধু এক পক্ষকে তখন সেটি মানবতার সাথে মসকরায় পরিণত হয়। অথচ বাংলাদেশের স্যেকুলাররা সেটিই করছে। স্যেকুলারদের আলোচনায় একাত্তরে সংঘটিত সকল অপরাধের জন্য দোষী রূপে চিত্রিত করা হচ্ছে দেশের ইসলামের পক্ষশক্তিগুলিকে। কোন ঘটনার বিচার- বিশ্লেষণে রায় কি হবে সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেটি বিচারে কোন আদর্শ বা কোন দর্শনকে মাপকাঠি ব্যবহার করা হল তার উপর। একারণেই দুনিয়ার তাবত স্যেকুলারদের ন্যায় বাংলাদেশের স্যেকুলারদের কাছেও পতিতাবৃত্তির ন্যায় জ্বিনা আইনসম্মত পেশা। এটি তাদের কাছে এতটাই গ্রহণযোগ্য যে নিজেদের টাক্সের অর্থ দিয়ে সে পাপাচারের হেফাজতে পুলিশি প্রহরারও ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশের স্যেকুলার আদালতে তাই জ্বিনা কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধই নয়। তাদের সেকুলার বিবেচনায় সূদের ন্যায় হারাম বিষয়টিকেও তারা হালাল মনে করে। অতি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে দেশের সূদী ব্যংকগুলোতে নিজের বা নিজ সন্তানদের চাকুরি পাওয়াটাকে। অথচ ইসলামের বিচারে সূদ দেওয়াই শুধু নয় সূদের হিসাব লেখাও হারাম। হাদিস পাকে এটিকে নিজের মায়ের সাথে জ্বিনার তুলনা করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে মুসলিম নামধারি সূদখোরের সংখ্যা মুর্তিপুজারি কাফেরদের চেয়ে বহুগুন বেশী। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ এখনও ডুবে আছে স্যেকুলার চিন্তা- চেতনার প্রবল প্লাবনে। সে প্লাবনের পানি ঢুকেছে দেশের অধিকাংশ

বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের মগজে। বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থ্যতা ক'জনের? ফলে একাত্তরে বাংলাদেশে সবগুলো ইসলামি দল কেন পাকিস্তানের পক্ষ নিল এবং তাদের বহু লক্ষ ধর্মভীরু কর্মী কেন রাজাকার বা আলবদরের সদস্য হয়ে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিল বা নির্যাতিত হল - সেটির একটি ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা কি এমন স্যেকুলারদের থেকে আশা করা যায়?

কথা হল, ১৯৭১ এ বাংলাদেশের ইসলামের পক্ষ শক্তি যদি পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে অংশ নিত তা হলে ইতিহাসে তারা কিভাবে চিহ্নিত হত? একটি দেশের ইতিহাসে একটি বছর বা একটি দশক বা একটি শতকই বড় কথা নয়। ইতিহাস বেঁচে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে। আজকে দেশ স্যেকুলারজিমের প্লাবনে ভাসলেও পঞ্চাশ বা শত বছর পর তেমনটি নাও হতে পারে। ইসলামি আদর্শের পতাকাবাহিগণ তখন বিজয়ী হলে কি ভাববে? তারা কি এমন কর্মকে ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ভাববে না? ইসলামে অঙ্গিকারহীন স্যেকুলারদের সাথে ইসলামপন্থিদের যে বিরোধ সেটি কি শুধু একাত্তর নিয়ে? মূল বিরোধ তো অন্যত্র। সেটি তো শরিয়তের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় নিয়ে। এ কারণেই যেসব দেশে একাত্তর নেই রক্তাক্ত বিবাদ সেখানেও। একাত্তরে ইসলামপন্থিরা যদি পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষও নিত তারপরও কি তারা ভারতপন্থি স্যেকুলার মহলে গ্রহনযোগ্য হতে পারতো? মেজর আব্দুল জলীল তো প্রাণবাজী রেখে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করেও রাজাকার হওয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচতে পারেনি। তাছাড়া মুসলমানের লক্ষ্য কি গণমুখী হওয়া না আল্লাহমুখী হওয়া? তাছাড়া মুসলমানগণ নিছক নিরাপদে বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, শিল্পসাহিত্য বা রাজনীতির জন্য রাষ্ট্র নির্মাণ করে না। তার জন্য যুদ্ধ- বিগ্রহ বা সংগ্রামও করে না। নিছক রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে এমন কাজ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা নাস্তিক ও স্যেকুলারগণও করে থাকে। কিন্তু মুসলমানের বাঁচার লক্ষ্য যেমন অন্যদের থেকে ভিন্ন, তেমনি ভিন্নতর হল তাদের রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যও। অন্যদের কাছে রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ নিছক রাজনীতি, অর্থনীতি বা সাংস্কৃতিক লক্ষ্য রূপে গণ্য হলেও মুসলমানের কাছে সেটি সর্বোচ্চ জ্বিহাদ। এ লক্ষ্যে সে যেমন অর্থ- শ্রম- মেধা ও সময় দেয়, প্রয়োজনে প্রাণও দেয়। প্রাণ দানের বরকতে সে জীবন্ত শহীদে পরিণত হয়।

সারা জীবন ব্যাপী রোযা- নামায বা অসংখ্য বার হজ্বের মাধ্যমেও এ মর্যাদা হাসিল হয় না। এজন্যই শক্তিশালী রাষ্ট্রের নির্মাণ ও তার প্রতিরক্ষা প্রতিটি মুসলমানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাষ্ট্র বাঁচলেই মুসলমান ও মুসলিম সংস্কৃতি বাঁচে; তখন ইসলামী চেতনা ব্যপ্তি পায়, প্রসার পায়, এবং শক্তিশালী হয়। তাই ইতিহাসে যত মুসলমান শহীদ হয়েছেন তা তো নিরাপদ রাষ্ট্রের নির্মাণেই, ধর্মের তাবলীগ করতে নয়। মুসলমান দ্বীনের তাবলীগে অস্ত্র ধরে না। নবীজী (সাঃ) বলে গিয়েছিলেন, সম্ভব হলে তোমরা কনস্টান্টিনোপল দখল করবে। রাষ্ট্রের ভূগোল বৃদ্ধি যে কত জরুরি সেটি তিনি এভাবে বুঝিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে কত বড় মিলিটারি স্ট্রাটেজিস্ট ছিলেন, এটি হল তার প্রমাণ। তখন কনস্টান্টিনোপল ছিল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানি এবং এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থল। শুধু নামাজ রোযায় মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা বাড়ে না। এজন্য নিরাপদ রাষ্ট্রও নির্মাণ করতে হয়। মোমেনের জীবন ও মৃত্যু এ কাজের মধ্য দিয়েই তো মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে উঠে। ১৯৪৭এ মুসলমানগণ পেশোয়ার থেকে চিটাগাং অবধি 'পাকিস্তানের মতলব কি? -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্লোগান তুলেছিলেন। (উর্দুতেঃ পাকিস্তান কা মতলব কিয়া? -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এটি ছিল সে সময় মুসলিম লীগের শ্লোগান)। সেদিন একটি বৃহৎ ভূগোল নির্মাণের সে প্রচেষ্টার মাঝে তাদের সে ইসলামি চেতানারই প্রকাশ ঘটেছিল। এ রাজনীতি সেদিন জ্বিহাদে পরিণত হয়েছিল। শেখ মুজিব নিজেও তাতে জড়িত ছিলেন। কথা হল, ১৯৪৭- এ যদি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা জ্বিহাদে পরিণত হয়, তবে ১৯৭১- এ সেটির সুরক্ষা কেন অপরাধে পরিণত হবে? বাংলাদেশে ইতিহাসের বইয়ে সে প্রশ্নেরও কোন উত্তর দেওয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের জাতিয়তাবাদী রাজনীতির ইসলাম-বিরোধী বড় অপরাধ হল, বাংলার মুসলমানদেরকে জীবনের সে জ্বিহাদী মিশন থেকেই বিচ্যুৎ করে। এতে অসংখ্য অপচয় ঘটে জীবনের। স্যেকুলার আওয়ামীলীগের হাতে বাংলার মুসলমানদের, সে সাথে ভারতের মুসলমানদেরও সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হয়েছে এক্ষেত্রে। এ বিষয়ে শুধু আগামী মুসলিম প্রজন্মের কাছেই নয়, মহান রাব্বুল আ'লামীনের দরবারেও তাদের জবাব দিতে হব। সে দরবারে ইন্দিরা গান্ধি, জ্যোতি বসু বা মানেক শ'দের দেওয়া সার্টিফিকেট কোন কাজে লাগবে না।

অধ্যায় ১৭: ভারতপন্থিরা কি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি?

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পিছনে যে আদর্শটি কাজ করেছিল সেটি ছিল প্যান- ইসলামিক চেতনা। সে চেতনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল ছিল মুসলিম লীগের দ্বি- জাতি তত্ত্ব। যার মূল কথা হল, হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি। ফলে তাদের জীবন ও জগত নিয়ে ভাবনা যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন হল রাজনীতির মূল লক্ষ্য ও এজেন্ডা। তখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল উপমহাদেশে, মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সংগঠন ছিল মুসলিম লীগ। তখন এ সংগঠনটির নেতাদের মাঝে স্থান পেয়েছিল মুসলমানের কল্যানচিন্তার এক প্রবল ভাবনা। সে ভাবনা নিয়ে সেদিন একতাবদ্ধ হয়েছিল বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান, গুজরাটি তথা নানা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলমানগণ। তারা বুঝতে পেরেছিল মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে হলে আলাদা দেশ চাই। সে লক্ষ্যে একতাও চাই। নইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সে সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা- দীক্ষায় অগ্রসর হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতা করে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর কিছু করা অসম্ভব। সে ধারণা অতি দ্রুত গ্রহনযোগ্যতা পায় অধিকাংশ ভারতীয় মুসলামানদের কাছে। এ ধারণা প্রবল ঝাঁকুনি দেয় ভারতীয় মুসলিম যুবকদের মনে।

এমন কি যারা নিশ্চিত ছিল যাদের ঘরবাড়ী ও ব্যবসা- বাণিজ্য কখনই পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হবে না তারা পাকিস্তানের পক্ষে রাজপথে নেমেছিল। নিজেদের কল্যাণের চেয়ে তারা বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল সর্ব- ভারতীয় এবং সে সাথে বিশ্ব- মুসলিমের কল্যাণ চিন্তা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তারা এ উপমহাদেশের বুকে নিজেদের এবং সে সাথে বিশ্ব- মুসলিমের নবজাগরনের স্বপ্ন দেখছিল। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলমান জনগোষ্ঠীর বাস ভারতে। ফলে তাদের চেতনালোকে অতি সক্রিয় ছিল বিশ্ব- মুসলিমের কল্যাণে কিছু করার প্রবল দায়িত্ববোধ। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র, আগ্রাসী হামলা ও সে হামলার সাথে ইসলামে অঙ্গিকারহীন ক্ষমতালোভী মুসলিম নেতাদের সহযোগীতার কারণে মুসলিম বিশ্বের - বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের - বড়ই বিপন্ন দশা। তখন লুপ্ত হয়েছে খেলাফত, ২০- এর বেশী টুকরায় বিভক্ত

হয়েছে আরব ভূ- খন্ড। ভারতীয়রা স্বপ্ন দেখছিল নিজেদের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার। মুসলমানদের সে স্বপ্ন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভাল লাগেনি। তারা ভিন্ন আরেকটি স্বপ্ন দেখছিল, সেটি ভারত জুড়ে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সে আন্দোলনে বল্লব ভাই প্যাটেল, বাল গঙ্গাধর তিলকের ন্যায় চরমপন্থিদের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন গান্ধী ও নেহেরুর নেতারাও। তারা শ্লোগান তুলেছিল অখন্ড ভারত মাতার স্বাধীনতার, প্রচার করছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের। অখন্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার তারা স্বপ্ন দেখছিল একটি বিশ্ব- শক্তি রূপে ভারতের আবির্ভাবের। এমন প্রেক্ষাপটে মুসমানদের একতা, সে একতার বলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা মেনে নেওয়ার বিষয়টা ছিল তাদের কাছে অসহ্য। খেলাফতের বিলুপ্তি ও ইরাক- ফিলিস্তিনসহ আরব ভূমি জবরদখলের সমগ্র বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের মুসলিম স্বার্থবিরোধী ভূমিকার কথা তাদের অজানা ছিল না। তাই দক্ষিণ এশিয়ার বুকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা রুখতে তারা জোট বেধেছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের সাথে। কিন্তু তাদের সে সম্মিলিত কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ১৯৪৭- এ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল পাকিস্তান। যদিও তারা দেশটিকে ভৌগলিক ভাবে দূর্বল করার কোন চেষ্টাই বাদ রাখেনি। তবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠা পায় তখন পাকিস্তান- ভূক্ত প্রদেশগুলির সবাই যে এ নতুন দেশটির প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিল তা নয়। অনেকেই এ দেশটির প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল শুরু থেকেই। প্রচন্ড বিরোধীতা করেছিল কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, আরএসএস ও অন্যান্য হিন্দু ও সেকুলার সংগঠন। পাকিস্তানভূক্ত পূর্ব বাংলায় তাদের ছিল বহু হাজার রাজনৈতিক কর্মী। ছিল শত শত কবি- সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। ১৯৪৭ সালে তারা পরাজিত হয়েছিল বটে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার বুকে অপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি রূপে ভারত গড়ার স্বপ্ন বিলুপ্ত হয়নি। এ লক্ষ্য অর্জনে পাকিস্তানই ছিল প্রধান বাধা। তাই বিলুপ্ত হয়নি পাকিস্তানের ধ্বংস বা শক্তিহানীর ভাবনা। উপমহাদেশের মুসলিম শক্তির বিনাশ ভিন্ন সে লক্ষ্যে পৌঁছা তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। সে লক্ষ্য- পূরণে ভারত শুধু ১৯৪৮ ও ১৯৬৫ সালেই পাকিস্তান সীমান্তে হামলা করে ক্ষান্ত দেয়নি। হামলা করেছে পাকিস্তানের মূল দর্শনেও।

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষায় সবচেয়ে বড় সামর্থ জোগায় একটি দর্শন। একটি প্রবল দর্শনের কারণে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাই একটি তীরও

ছুড়তে হয়নি। প্যান-ইসলামিক চেতনা ও সে চেতনাভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বই সে কাজটি করে দেয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান সরকার নিছক রাস্তাঘাট ও কলকারখানা গড়া গুরুত্ব দিয়েছে, কিন্তু পুঁজিবিণিয়োগ করেনি সে দর্শনকে আরো মজবুত করায়। সমুদ্র পাড়ী দেওয়াই যার কাজ, তার কাছে নৌকার গুরুত্ব প্রতিদিনের। সেটিকে নিয়মিত মেরামত করতে হয়। তাই পাকিস্তানের বেঁচে থাকার স্বার্থে দ্বি-জাতি তত্ত্ব, প্যান-ইসলামী চেতনার মজবুত গণভিত্তি অতি অপরিহার্য। কিন্তু বিষয়টি প্রচন্ড অবহেলার শিকার হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। উর্দু ভাষায় কিছু কাজ হলেও বাংলায় আদৌ হয়নি। ফলে পাকিস্তানের আদর্শিক মৃত্যু দ্রুত ঘনিয়ে আসতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানে।

প্রবল জোয়ারের টানে কচুরীপানার ন্যায় শিকড়হীন ও অগভীর শিকড়ের অনেক আগাছাই ভেসে আসে। তেমনি আন্দোলনের জোয়ারের ভেসে আসে দর্শনহীন অনেক সাধারন মানুষও। কিন্তু জোয়ারে ভাসা সে লোকগুলো মূল ধারায় বেশী দিন টিকে থাকে না। তাই ভাষানী, শেখ মুজিব, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খানের মত অসংখ্য ব্যক্তি পাকিস্তানের প্যান-ইসলামী দর্শনের সাথে বেশী দিন থাকতে পারেনি। ‘ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশা’র ন্যায় তারা গিয়ে মিশেছেন ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী সেকুলার দর্শনের সাথে। লিপ্ত হয়েছেন পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে। এজন্যই দেশ বাঁচাতে হলে জনমনে দর্শনের গভীরতা গড়তে হয় শিক্ষার মাধ্যমে। আর ইসলামি দর্শনের সে গভীরতা আসে পবিত্র কোরআন থেকে। সে কাজটিই পাকিস্তান সরকার করেনি। ফলে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে যারা একদিন কচুরিপানার ন্যায় ভেসে এসেছিল তারাই আবার ভেসে যাওয়া শুরু করে সেকুলারিজম, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের ন্যায় নানা মতাদর্শের প্রবল স্রোতে। চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে শেখ মুজিব ও তার অনুসারীরা ছিলেন পুরাপুরি শিকড়হীন। ফলে খড়কুটোর মত উড়েছেন মতবাদের ঝড় যেদিকে যায় সেদিকেই। তাই কখনও মুসলিম লীগের সাথে ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানে বলেছেন’, কখনও সোহরওয়ার্দীর সাথে মার্কিন শিবিরের দিকে ঝুঁকেছেন, আবার কখনও মস্কোপন্থিদের সাথে সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা উঁচু করেছেন।

১৯৪৭-এর পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে সবচেয়ে বেশী বিণিয়োগ করে ভারত। তখন প্রাণ ফিরে পায় ভারতপন্থি বুদ্ধিজীবীরা। সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যের প্রবল প্লাবন নেমে আসে পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ সালের পূর্বে রবীন্দ্র সাহিত্যের এত চর্চা মুসলমানেদের মাঝে হয়নি। তার জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীও এত পালিত হয়নি - যা পালিত হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর। তখন দেশে প্লাবনের পানির ন্যায় ঢুকেছে মস্কো ও বেইজিং থেকে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য। সে সাহিত্য বিভ্রান্ত করে বিপুল সংখ্যক বাঙালী যুবকদের। সে সাহিত্য তাদেরকে প্রচন্ড ইসলাম বিরোধী এবং সেসাথে পাকিস্তান বিরোধীও করে তোলে। তখন চলছিল বিশ্ব ব্যাপী পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী –এ দুই শিবিরের প্রচন্ড বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। এ লড়াইয়ের ময়দান থেকে রাশিয়া ও চীন উভয়ই বিদায় নিয়েছে, পতন ঘটেছে সোভিয়েত রাশিয়ার। কিন্তু বিষধর শাপ মড়নের আগেও মরণ ছোবল হানতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়া তেমনি ছোবল মেরেছিল পাকিস্তানের অখন্ড অস্তিত্বে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থণের কারণেই ভারত সাহস পায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর। আওয়ামী শিবিরে কোরআন পাঠ বা কোরআন শিক্ষার কোন আয়োজন হয়েছে কিনা সেটি জানা যায়নি, কিন্তু আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠন রবীন্দ্র সংগীতের আসর বসিয়েছে যত্র যত্রই। দেশী ও বিদেশীদের সৃষ্ট সে সেকুলার সাহিত্যের জোয়ারে ভেসে গেছেন এমনকি আওয়ামী শিবিরের প্রধান রাজনৈতিক গুরুরা। ফলে যে ভাষানী আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, ১০ বছর যেতে না যেতেই তিনি সেকুলারিজম ও সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা কাঁধে তুলে নেন। ১৯৫৬ সালের কাগমারী সম্মেলনে ভারতীয় সেকুলারিজমের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কংগ্রেসী নেতা গান্ধীর নামে তোরণও নির্মন করেন। তিনি নতুন ভাবে দীক্ষা দেন মাওবাদে। আবুল মনসুর আহম্মদ, শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খানের মত আওয়ামী লীগ নেতারা কাঁধে তুলে নেন কংগ্রেসী সেকুলারিজমের পতাকা। ইসলাম, ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নির্মাণ তাদের কাছে পরিণত হয় সাম্প্রদায়িকতা রূপে। কারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ও কারা বিপক্ষে - সেটি বিচারে গুরুত্বপূর্ণ হল চেতনা রাজ্যে কোন দর্শনটি কাজ করছে সেটি। আজকের বাংলাদেশ মূলতঃ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের

ভগ্নাংশ। কাঁচের পাত্র ভেঙ্গে গেলেও ভাঙ্গা অংশটি কাঁচেরই, মাটি বা কাঁসার নয়। ভেঙ্গেঁ যাওয়ার কারণে পাত্রটির নির্মাণে যে মৌল পদার্থ কাজ করে তাতে গুণগত পরিবর্তন আসে না। তেমনি পাকিস্তান ভেঙ্গেঁ গেলেও বাংলাদেশ ভারতের সাথে মিশে না গিয়ে প্রমাণ করেছে দ্বি-জাতি তত্ত্বই সঠিক ছিল। ভারতভূক্ত পশ্চিম বাংলা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের এখানেই পার্থক্য। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ রূপে টিকে থাকতে পারে সে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্য দিয়েই। দেশের সীমানা তখনই বিলুপ্ত হয় যখন বিলুপ্ত হয় দর্শনের সীমানা। পশ্চিম বাংলার সাথে দিল্লীর কোন দর্শনগত বিভক্তি নেই। তাই বিভক্তি নেই রাজনৈতিক দিক দিয়েও। একই ভাবে ভারতীয় সেকুলারিজমের যারা যত কাছের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তারাই ততই বিপদজনক। যাদের দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাস নেই, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বন্ধু হতে পারে না। যারা একটা ভিন্ন দর্শনে বিশ্বাস করে তারা সে দর্শনের ভিত্তিতে একটা পৃথক ও সুরক্ষিত ভূগোলেও বিশ্বাস করে। তাই বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল একাত্তর-পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা। সেকুলার ভারতের আধিপত্য বাড়লে শুধু বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যই নিরাপত্তা হারাবে না, তখন সুরক্ষা পাবে না মুসলমানের জানমাল, তাহজিব-তামুদ্দনও। স্বাধীন দেশের অর্থ নিছক আলাদা পতাকা নয়, তেমন পতাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভূক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রেরই আছে। স্বাধীনতার অর্থ নিজেদের ভৌগলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শিক সার্বভৌমত্বের সুরক্ষার সামর্থ। সেটি মুজিব আমলে ছিল না। তাই বিপর্যয় নেমে এসেছে বাংলাদেশের ভূগোলে; অর্থনীতি, রাজনীতি ও জীবন দর্শনে। সে সামর্থ না থাকার কারণেই মুজিব আমলে বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে বেরুবাড়ী ও তালপট্টি। ধ্বংস নেমে এসেছে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যে। অবাধ সীমান্ত বাণিজ্যের নামে দেশের তলা খসিয়ে সম্পদ ঢেলে দেয়া হয়েছে ভারতের পেটে। এভাবে ডেকে এনেছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে ভাবতে হলে ভাবতে হবে তার ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশকে নিয়ে। বাংলাদেশ তিন দিক দিয়ে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর হামলা আসমান থেকে হবে না। হলে প্রতিবেশী দেশ থেকেই হবে। স্বাধীনতার সুরক্ষায় তো তারাই এগিয়ে

আসে যারা বিশ্বাস করে স্বাধীনতা বিলুপ্ত হলে তাদের আর কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল থাকবে না। কিন্তু সে ভয় কি আওয়ামী বাকশালীদের আছে? তারা তো বরং বাংলাদেশের চেয়ে ভারতকেই নিরাপদ ভাবে। তাই ১৯৭৫-এর ১৫ আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর কাদের সিদ্দিকীদের মত আওয়ামী বাকশালীরা দলে দলে ভারতে গিয়েছিল। যে দেশটিকে যারা এতটা নিরাপদ ভাবে সে দেশের পক্ষ থেকে হামলা হলে তারা কেন যুদ্ধ করতে যাবে? কেনই বা জান দিবে? প্রাণপনে তো তারাই লড়বে যাদের সে হামলায় অতি মূল্যবান কিছু হারিয়ে যাবার ভয় আছে। তাছাড়া আওয়ামী বাকশালী পক্ষটির নেতা শেখ মুজিব তো ১৯৭২-এ ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি সাক্ষর করেছিল প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের অধিকারকে জায়েজ করতে। আজ এরা বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের ট্রানজিট দিতে উদগ্রীব। মুজিব ভারতীয় বাহিনীর অনুপ্রেবেশকে চুক্তি করে জায়েজ করেছিল। এ ভয়ে, তার সরকার বিরোধীদের দমনে যদি অক্ষম হয় তবে ভারতীয় সামরিক বাহিনী যেন তাকে উদ্ধার করে। দূর্বলতাই মানুষকে পরনির্ভর করে। শেখ মুজিবও একই কারণে ভারত নির্ভর হয়েছিলেন। এমন চেতনার লোকেরা কি কখনও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হতে পারে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা কি এদের হাতে সুরক্ষা পেতে পারে?

ইসলামী চেতনাধারী মানুষের কাছে ভারত কখনই নিরাপদ স্থান রূপে বিবেচিত হতে পারে না। দেশটিতে অতি ঘন ঘন ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ছদ্দাবেশে মুসলিম নিধন যজ্ঞ। মুসলিম মহিলারা সেদেশে ধর্ষিতা হয়, ধর্ষনের পর আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়। নিরাপত্তা পায় না মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য। নিরাপত্তা পায় না এমনকি মসজিদ মাদ্রাসাও। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ বিধ্বস্ত হল হাজার হাজার উগ্র হিন্দুদের দ্বারা দিন-দুপুরে। সভ্যদেশে কারো ঘরের দিকে ঢিল ছুড়ে মারলেও পুলিশ ছুটে আসে। অথচ মসজিদ ধ্বংসের কাজ অতি উৎসবভরে হল পুলিশের চোখের সামনে। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও সেটি টিভিতে দেখলেন, দেখেছেন শত শত রাজনৈতিক নেতা এবং পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা। একজনও গ্রেফতার হল না। কারো শাস্তিও হল না। যেন দেশে কোন কিছু ঘটেনি, কেউ কিছু দেখেও নি। এমন দেশে কি কোন মুসলমান নিরাপত্তা পেতে পারে? বরং এমন দেশের আগ্রাসন থেকে বাঁচতে একজন মুসলমান যে অর্থ, শ্রম, মেধা

এমনকি প্রানদান করবে তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে? অথচ আওয়ামী বাকশালী পক্ষ তাদেরকেই স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলছে। তবে এমনটি বলার মধ্যেও একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে। আছে নিরেট মিথ্যাচার। এ মিথ্যাচারের লক্ষ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত সৈনিকদের হেয় করা। এভাবে দূর্বল করা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে এবং স্বাধীনতার এ প্রকৃত সৈনিকদের নির্মূলের লক্ষ্যে একটি উপযোগী প্রেক্ষাপট তৈরী করা। যেমনটি তারা একাত্তরে করেছিল।

অধ্যায় ১৮: যে ইতিহাস আত্মবিনাশের

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে যে অবিরাম বিবাদ সেটি বাংলাদেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আত্মঘাতি বিষয়ও। যখনই দেশে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্রতর হয় তখনই প্রবলতর হয় এ বিবাদ। তবে এটিকে বিবাদ বললেও ভূল হবে। কারণ বিবাদে দুটি পক্ষ থাকে। অথচ এখানে চলছে এক পক্ষের তীব্র গলাবাজী। এনিয়ে যেমন নেই বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, তেমনি নেই একাডেমিক লেখালেখি। আছে নিছক আবেগ, গালিগালাজ ও অস্বীকারের মিথ্যাচার। এটি অস্বীকারের উপায় নেই, তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তির পুরো ময়দানটি দখল করে আছে চিন্তা-চেতনায় স্যেকুলার, ধর্মে অঙ্গিকারহীন এবং রাজনীতিতে ভারতপন্থি একটি পরিচিত গোষ্ঠী। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে তা মূলতঃ তাদেরই পক্ষ থেকেই। তাদের অভিযোগ,বাংলাদেশের স্বাধীনতা এই ইসলামপন্থিদের কারণে বিপন্ন। এটি এক গুরুতর অভিযোগ। আরো দুশ্চিন্তার কারণ, ইসলামপন্থিদের মুখেও এনিয়ে উচ্চবাচ্য নেই, একাডেমিক আলোচনাও নেই। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ন্যায় তারাও বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকে তো স্যেকুলার প্রপাগান্ডার জোয়ারে ভেসেও গেছে। এমনকি একাত্তরে নিহত নিজেদের লোকদের কথাও তারা বেমালুম ভুলে গেছে। বরং নিজেদের পরাজয়ের দিনটিকে উৎসবের দিন রূপে উদযাপন করছে।

এভাবে গাদ্দারি করছে নিজেদের নিহত বহু হাজার নিরপরাধ মানুষের সাথে। আবার কিছু ইসলামপন্থির উদ্ভব ঘটেছে যারা ৭১-এ

পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিও দাবী করছে। দেশের জন্য এটি এক বড় রকমের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্গতি। যা ডেকে আনছে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংঘাত। এমন বিভক্ত জাতি কি সামনে এগুতে পারে? স্বাধীনতা ও সুস্থ্য রাজনীতির স্বার্থে এ নিয়ে বিশদ বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হওয়া উচিত। আলোকিত করা উচিত নতুন প্রজন্মকে। সনাক্ত করা উচিত কারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি, কোথায় তাদের অবস্থান এবং কি তাদের কর্মকান্ড। এমন শক্তি যদি থেকেই থাকে তবে তাদের আশু বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত। তবে প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ অবধি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বা সীমান্তে ইসলামপন্থিদের পক্ষ থেকে একটি বুলেটও কি নিক্ষিপ্ত হয়েছে? উচ্চারিত হয়েছে কি একটি শব্দ? লিখিত হয়েছে কি কোন প্রচারপত্র বা বই? অধিকারে নিয়েছে কি তারা দেশের এক ইঞ্চি ভূখন্ড? রাস্তার ভদ্রলোককে খুনি বললেই সে খুনি হয়না। খুনের লক্ষ্যে তার হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল এবং সে সাথে খুনের মটিভ ছিল আদালতে সে প্রমাণও হাজির করতে হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেছে দুই বার। তাদের হাতে তখন সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা বাহিনীও ছিল। ছিল আদালত। যাদের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ তাদেরকে তারা প্রমাণসহ আদালতে তুলতে পারতো। শাস্তিও দিতে পারতো। কিন্তু তা পারেনি। একজনের বিরুদ্ধেও আদালতে তারা অভিযোগ আনতে পারেনি। অথচ একই কথা বিগত ৩৫ বছর ধরে বলে ময়দান গরম করে চলেছে। দেশে সুষ্ঠ বিচার থাকলে বরং তাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবী তুলে মানহানির মামলা হতে পারত। এর কারণ একটিই, দেশের ইসলামী শক্তিকে স্বাধীনতার শত্রু বলে তাদের নির্মূল করা। এরা রুখতে চায় ইসলামের উত্থান।

ইরাকের বিরুদ্ধে মানববিধ্বংসী অস্ত্রের এমনই এক মিথ্যা অভিযোগ এনে জর্জ বুশ সে দেশের নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশু হত্যার বাহানা তৈরী করেছিল। এরাও তেমনি একটি মিথ্যা বানায়োট অভিযোগ এনে দেশে একটি ব্যাপক হত্যাকান্ড ঘটাতে চায়। এবং সে অভিলাষের কথা তারা বার বার ঘোষণাও দিয়েছে। নব্বইয়ের দশকে নির্মূল কমিটি গঠনের মূল কারণ তো এটিই। তখন মেঠো আদালত বসিয়ে মৃত্যূদন্ডে দন্ডিত করেছিল বহু মানুষকে। আইন-আদালত ও বিচারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদের মন যে কতটা ইতর এবং ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে যে কতটা বিষপূর্ণ এটি হলো তারই

নমুনা। তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা সীমান্তে হামলা যে হয়নি তা নয়। সেটি হয়েছে তাদেরই সহযোগী বা সমচিন্তার লোকদের দ্বারা। সত্তরের দশকে হামলা করেছিল ভারতীয় অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও অর্থে প্রতিপালিত আওয়ামী-বাকশালী কাদের সিদ্দিকী ও তার সাঙ্গোপাংগের বাহিনী। আজও বাংলাদেশ দখলের ষড়যন্ত্র ও পাঁয়তারা হচ্ছে এককালীন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি এবং ভারতীয় নাগরিক চিত্তরঞ্জন সুতোর ও তার নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বঙ্গভূমী আন্দোলনের কর্মীদের দ্বারা। হামলা হয়েছে ভারতীয় সাহায্যপুষ্ট চাকমা বিদ্রোহীদের দ্বারাও। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এ হামলাগুলো সবর্জনবিদিত। এদের মটিভ বা উদ্দেশ্য যেমন গোপন ছিল না, তেমনি গোপন ছিল না কর্মকান্ডও। অথচ এ পক্ষটি তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। এমনকি শেখ মুজিব যখন বাংলাদেশের কয়েকটি ছিটমহল ভারতের হাতে তুলে দিল এবং ভারত দখল করে নিল বাংলাদেশে উপকূলে জেগে উঠা তালপট্টি দ্বীপ তখনও তারা প্রতিবাদ জানায়নি। প্রতিবাদ তখনও করেনি যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শুরুতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে গেল এবং লুটে নিল বাংলাদেশী কলকারখানার বহু হাজার কোটি টাকার যন্ত্রাংশ। এরাই যখন স্বাধীনতার পক্ষ- বিপক্ষ নিয়ে বিতন্ডা খাড়া করে তখন তাদের মতলব নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। তাদের মতলব স্বাধীনতা না অন্যকিছু সেটিরও অনুসন্ধান হওয়া উচিত। কারণ পক্ষ- বিপক্ষের এ লড়াই উন্নয়নের পথে একটি প্রকান্ড বাধা। পরস্পর এমন সংঘাত ও ঘৃণা নিয়ে কোন দেশ কি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে?

এটি সত্য, ১৯৭১এ মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, নুরুল আমীন সাহেবের পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামসহ সবগুলো ইসলামী ও মুসলিম জাতিয়তাবাদী দলই অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। এ নিয়ে বিতর্ক নেই। বিতর্ক নেই যে মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক একাত্তরে ভারতে যায়নি। মুক্তি বাহিনীতে যোগও দেয়নি। কোন আলেম দেয়নি পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ফতওয়া। অথচ বাংলাদেশে এদের সংখ্যা বহু লক্ষ। ব্যতিক্রম থাকলেও সে সংখ্যা অতি নগণ্য। তাদের সে ভূমিকার পিছনে রাজনৈতিক দর্শনটি কি ছিল সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামনে আসেনি। ফলে নতুন প্রজন্ম পায়নি সে বিষয়ে সঠিক ধারণা। এক পক্ষের বিবরণ শুনে এমন কি অতিশয় দক্ষ ও সুবিজ্ঞ

বিচারকও সুবিচারে ব্যর্থ হয়। একাত্তরে যারা বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধী ছিল তাদের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়নে একই ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে সাধারণ জনগণ। আর বিবাদের যারা নায়ক তারা সেটিই চায়। কারণ হিন্দু পৌরাণিক উপখ্যানের মত কিছু কল্প কথাকে দিয়ে তারা ইতিহাস বানাতে চায়। ফলে একাত্তর প্রসঙ্গে আজ অবধি যা বলা হচ্ছে তা হলো এক পক্ষের ভাষণ যার মধ্যে রয়েছে সীমাহীন অসত্য। রয়েছে প্রচুর অতিরঞ্জন। এ কল্প কথার বিরুদ্ধে যাতে প্রতিবাদ না উঠে সে জন্য শুরু থেকেই তারা মিডিয়া ও প্রকাশনা জগতে বজায় রেখেছে চরম সন্ত্রাস। সরকারি সেন্সারের চেয়েও যা শক্তিশালী। সন্ত্রাসী পক্ষটির মনপুতঃ নয় এমন বই মেলায় উঠলে বইয়ের স্টলেই আগুন দেওয়া হয়। ফলে সাধারন মানুষ ব্যর্থ হচ্ছে একাত্তরের দুটি প্রতিদ্বন্ধী পক্ষের মাঝে সুবিচার করতে। অথচ দেশের স্বার্থে এমন অবস্থা দূর হওয়া উচিত ছিল বহু পূর্বেই। নইলে একাত্তরে যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিল তাদের যুক্তিই শুধু অজানা থাকবে না, বরং অজানা থেকে যাবে ১৯৪৭এ যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমান অবাঙ্গালী মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াই লড়েছিলেন তাদের রাজনৈতিক দর্শনও। পাকিস্তান খন্ডিত হতে পারে, কিন্তু বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানের পক্ষে যে আন্দোলন করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কি ভিত্তিহীন ছিল? সে বিষয়টিও সামনে আসা উচিত। নইলে চরম অসম্মান ও বেয়াদবি বাড়বে পূর্বপুরুষদের প্রতি। তবে এ জন্য দূর করতে হবে প্রকাশনা ও মিডিয়া জগতের সন্ত্রাস।

গায়ের জোরে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ শুধু একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা বা মিডিয়া দমনই করেনি, জাতির ইতিহাসে প্রচুর মিথ্যা আবর্জনাও ঢুকিয়েছে। সে আবর্জনা সরাতে না পারলে জাতির জীবনে নেমে আসবে চরম বুদ্ধিবৃত্তিক অসুস্থ্যতা। মন ও মননের সে অসুস্থ্যতায় অসম্ভব হবে ইতিহাসের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন। জাতীয় জীবনে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক অসুস্থ্যতা বিজয়ী হলে ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ চিন্তায় যেসব দেশপ্রেমিক ছাত্র, যুবক ও সাধারণ মানুষ সাতচল্লিশে ও একাত্তরে নির্যাতিত হয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন বা গৃহহারা হয়েছেন এবং আজও নানা ক্যাম্পাসে ও গ্রাম- গঞ্জে রক্ত দিচ্ছেন, ইতিহাসে চিরকাল তারা ভিলেনরূপেই চিত্রিত হয়ে থাকবেন। আগামী প্রজন্ম ব্যর্থ হবে তাদের আত্মত্যাগ ও রাজনৈতিক দর্শনটি বুঝতে। অপরদিকে ধর্মে

অঙ্গিকারহীন বিদেশী এজেন্ট এবং চরিত্রহীন দুর্বৃত্তরা প্রতিষ্ঠা পাবে মহান নেতারূপে। ফলে অন্ততঃ দেশ ও ইসলামের কল্যাণে ইসলামপন্থিদের সাহসের সাথে সত্য কথাগুলো বলা উচিত। তাছাড়া সত্যের পক্ষে এমন সাক্ষ্যদান তাদের ঈমানী দায়বদ্ধতা। সে দায়বদ্ধতা ইতিহাসের প্রতিও। নইলে সঠিক ইতিহাস লেখা হবে কি ভাবে? ইসলামী পরিভাষায় এটিই হলো ‘শাহাদতে হক’ -যা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। এটি গোপন করা গোনাহ। তাদের বোঝা উচিত, ইতিহাসের কোন মহত কর্মই ভীরুতায় গড়ে উঠে না। ভীরুদের স্থান হয় চিরকালই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তাছাড়া ইসলামের বিরুদ্ধে আজ যারা স্যেকুলারিজমের ঝান্ডা নিয়ে ময়দানে নেমেছে তারা ফিরাউন নয়, নমরুদও নয়; বরং বিদেশনির্ভর কিছু মেরুদন্ডহীন জীব। অথচ মুসলমানদের ঐতিহ্য তো খোদ ফিরাউন ও নমরুদের বিরুদ্ধে সাহসের সাথে সত্য কথা বলা। এমন সাহসিকতায় আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তি তখন অনিবার্য হয়। তবে দ্রুত বাজার হারাচ্ছে সেকুলারিজমও। তাদের জাতীয়তাবাদ ও তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের রাজনীতি মাঠে মারা পড়েছে ভারতের প্রতি নতজানু নীতির কারণে।

মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রে বিভক্তি গড়া ছাড়া জাতিয়তাবাদ মুসলমানদের আর কোন কল্যাণই দেয়নি। দিবে না আখেরাতেও। আল্লাহর দরবারে ভাষা বা বর্ণের নামে বিবাদ গড়ার প্রতিটি প্রয়াস চিত্রিত হবে কবীরা গুনাহ রূপে। সেখানে বরং হিসাব হবে, ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন দেশের মুসলমান ভাইয়ের সাথে একতা গড়ায় কে কতটা মেহনত করেছে সেটির। এমন ভাতৃত্ব ইসলামে ইবাদত। এটি হলো অভিন্ন উম্মাহর চেতনা। উম্মতে ওয়াহেদা গড়ার লক্ষ্যে এটি হলো সিমেন্ট লাগানোর কাজ। অথচ ভাষা,বর্ণ,গোত্র বা ভূগোলের অহংকার তথা জাতিয়তাবাদ মূলতঃ মুসলমানদের মধ্য থেকে সে সিমেন্টই খুলে নেয়। ইসলামে তাই এটি হারাম। আল্লাহর দরবারে এটি গণ্য হবে জঘন্য অপরাধ রূপে। পবিত্র কোরআনে একতা গড়ার তাগিদ এসেছে বার বার। সে বর্ণনা এসেছে এভাবেঃ

“ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্লাযীনা ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিহি সাফফান কা’আন্নাহুম বুনইয়ানুন মারসুস”।

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তাদেরকে ভালবাসেন যাঁরা তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করে, যেন তারা (একতায়)সীসাঢালা দেওয়াল।”-(সুরা সাফ, আয়াত ৪)

ভাষা, বর্ণ, ভূগোল বা অন্য কোন পরিচয়ে এ দেওয়ালে কোন ফাটল সৃষ্টি করা যাবে না। সেটি হলে তা আল্লাহর আযাব ডেকে আনবে। তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রাঃ), রোমের হযরত সোহেল(রাঃ), ইরানের হযরত সালমান ফারসী(রাঃ)র ন্যায় বহু অনারব সাহাবী আরবী- ভাষী সাহাবাদের সাথে আপন ভাইয়ের ন্যায় যেভাব একাত্ম হতে পেরেছিলেন সেটি তো আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হওয়ার তাগিদেই। ফলে গড়ে উঠেছিল সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অখন্ড মুসলিম উম্মাহ। আল্লাহর কাছে তাঁরা যে অতি প্রিয় হতে পেরেছিলেন সে সার্টিফিকেটও এসেছে পবিত্র কোরআনে। বলা হয়েছেঃ...“রাযীআল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু..।” অর্থঃ..“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর রাযী আছেন, এবং তারাও রাযী আল্লাহর উপর” (সুরা বাইয়েনাহ, আয়াত ৮)

আজও মুসলমানদের সামনে তারাই অনুকরণীয় আদর্শ। ফলে সে আমলে নানা ভাষাভাষী ও নানা বর্ণের মানুষ নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের ভূগোল বাড়লেও রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়েনি। যখন থেকে রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে, তখন থেকে বাড়তে থাকে দূর্বলতাও। কারণ, খন্ড খন্ড রাষ্ট্রতো মুসলিম দেওয়ালে ফাটলেরই লক্ষণ, এতে কি কোন শক্তি সৃষ্টি হয়? একমাত্র কোরআনের অনুসরণই মুসলমানদের আবার ফিরিয়ে আনতে পারে একতা পথে। একমাত্র সে একতার পথেই আবারও অর্জিত হতে পারে বিশ্বশক্তির মর্যাদা ও সম্মান। তাই যেখানেই প্রসার পাচ্ছে কোরআনী জ্ঞান, সেখানেই বেগবান হচ্ছে প্যানইসলামিক চেতনা। ফলে আরব, আফগান, চেচেন, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, তুর্কী মুসলমান বিশ্বের বহু মঞ্চেই এখন আবার একতাবদ্ধ হচ্ছে। এরই প্রমাণ মেলে লন্ডন, প্যারিস, রোম বা নিউয়র্কের রাজপথে। প্রমাণ মেলে বহুভাষী পাশ্চাত্য নগরগুলির ছাত্র সংগঠন, কম্যুনিটি প্রতিষ্ঠান ও মসজিদগুলোতে। এমনকি নানা দেশের জিহাদের ময়দানগুলোতেও। নানা বর্ণ, নানা ভাষা ও নানা গোত্রে মানব সৃষ্টির লক্ষ্য এ নয় যে, তারা এ ভিন্নতার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র গড়বে এবং পরস্পরে লড়াই করবে। যেমনটি একাত্তরে হয়েছে। বরং সেরূপ ভিন্নতা নিয়ে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য আল্লাহপাক বর্ণনা করেছেন এভাবে,

“ইয়া আইয়োহান্নাসু ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিও ওয়া উনসা ওয়া যায়ালনাকুম শুয়ুবাও ওয়া কাবায়িলা লি তায়ারাফু ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম,ইন্নাল্লাহা আলীমুন খাবির।”

অর্থঃ “হে মানব,আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছুর খবর রাখেন”।-(সুরা হুযরাত আয়াত ১৩)

অর্থাৎ মহান আল্লাহতায়ালার কাছে ভাষা ও গোত্রের কোন গুরুত্বই নেই, গুরুত্ব পায় ব্যক্তির তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। এর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় তার মর্যাদা। ফলে মহান আল্লাহর কাছে মানুষের যে পরিচিতির কোন মূল্যই নেই সেটি নিয়ে এত বিভক্তি, এত অহংকার, এত যুদ্ধবিগ্রহ ও এত রক্তপাত কেন? মুসলমান হিসাবে তার কাজ হবে মহান আল্লাহর কাছে যেটি গুরুত্ব রাখে সেটির অর্জনে আত্মনিয়োগ করা। নানা গোত্র, নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মুসলমানরা একই ভাবে একত্রে বসবাস করবে জান্নাতে, সেখানে ভাষাগত, বর্ণগত বা গোত্রগত পরিচয়ের কোন গুরুত্ব থাকবে না। একমাত্র পরিচয় হবে, তারা সবাই আল্লাহতায়ালাতে আত্মসমর্পিত মুসলমান। তাই জান্নাতের প্রবেশের পূর্বশর্ত হলো দুনিয়া থেকেই সে গুণটি অর্জন করা। সাহাবায়ে কেরাম সেটি অর্জন করেছিলেন। আজও যদি নানা ভাষা ও নানা বর্ণে বহু হাজার নবী নাযিল হতেন তবে তাদের মাঝেও বর্ণ ও ভাষা নিয়ে কোনরূপ বিভেদ হতো না, সংঘাতও হতো না। বিভেদ গড়া তো শয়তানের কাজ। অথচ বাংলাদেশের স্যেকুলার পক্ষটি শুধু বিভেদই গড়েনি, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও বাধিয়েছে। এবং এখনও সেটির বার বার হুংকার দিচ্ছে।

বাংলাদেশের স্যেকুলার পক্ষের আরেক কৌশল, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিবাদ বাড়িয়ে নিজেদের অতীত ব্যর্থতাকে আড়াল করা। সত্তরের দশকে ক্ষমতায় গিয়ে দূর্নীতি ও অযোগ্যতার তারা পাহাড় সমান ইতিহাস গড়েছিল। ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খুঁজতে গরীব মানুষকে কুকুরের পাশে পাঠিয়েছিল। মহিলাদের বাধ্য করেছিল মাছ ধরার জাল পরতে। রাজনীতিতে

প্রতিষ্ঠিত করেছিল ফেনীর জয়নাল হাজারীর ন্যায় বিপুল সংখ্যক সন্ত্রাসী ও খুনিকে। তার মত দুর্বৃত্তকে নিজ দলের টিকেটে এমপিও করেছিল। এমন কদর্য ইতিহাস নিয়ে আবার ক্ষমতায় যাওয়া তাদের জন্য অসম্ভব। এখন কৌশল ধরেছে, মুছে ফেলবে মানুষের স্মৃতি থেকে কদর্যতার সে ইতিহাস। এখন চায়, বিবাদ বাধিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে। কথা হলো, একাত্তরের স্বাধীনতার লড়াই নিয়ে তাদের যে এত অহংকার তাতেই বা তাদের অংশীদারিত্ব কতটুকু? তারা সমগ্র বাংলাদেশ স্বাধীন করা নিয়ে বড়াই করে। জাতির পিতা বানিয়েছে তাদের নেতাকে। অথচ একাত্তরের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর পূর্বের নয় মাসে তারা বাংলাদেশের কোন একটি জেলাকেও কি স্বাধীন করতে পেরেছিল? অথচ অগ্রাসী রুশ ও তাদের আজ্ঞাবহ তাঁবেদার সরকারগুলির হাত থেকে কাবুল মুক্ত করার বহু বছর আগেই আফগান মোজাহিদরা শতকরা ৮০ ভাগের বেশী ভূ- ভাগ স্বাধীন করেছিল। যেমন আজ আফগানিস্তানে মার্কিন ও তার মিত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রন সীমিত হয়ে পড়েছে কাবুল ও প্রাদেশিক রাজধানী গুলোর কয়েক মাইলের মধ্যে। এমনকি পুরাপুরি নিরাপদ নয় কাবুল শহরও। একই ভাবে দেশের সিংহভাগ মুক্ত করেছিল আলজেরিয়া ও ভিয়েতনামের মুক্তি ফৌজ। এবং তাদের পক্ষে কোন বিদেশী শক্তি এসে লড়েনি। অথচ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে মূলতঃ পরাজিত করেছে ভারতীয় বাহিনী। এ যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ১৪ হাজার সৈন্যও নিহত হয়েছে।

যদি মুক্তিবাহিনীই পাকবাহনীকে পরাজিত করে থাকে তবে ভারতীয় বাহিনীকে কেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হল? জয়- পরাজয়ের প্রকৃত লড়াই হয়েছে এ দুটি বাহিনীর মধ্যে। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্দানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ চুক্তিটি সাক্ষর হয়েছিল তাই এ দুই বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডারদের মাঝে। সেখানে কোন বাংলাদেশী সেনা কমান্ডারকে ডাকা হয়নি। ভারত সরকার যে একান্তই নিজ শক্তিবলে পূর্ব পাকিস্তান দখল করেছিল সেটি তারা এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিল। দখলের পর গদীতে পুতুল রূপে বসিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারকে। ফলে কোন আত্মসচেতন জাতি কি এমন পুতুলদের স্বাধীনতার স্থপতি ভাবে? বাংলাদেশের ১৫ কোটি মুসলমানদের জন্যও কি এটি কম অপমানের যে একটি কাফের শাসিত দেশ তাদের স্বাধীনতার জনক

হবে? আওয়ামী-বাকশালী চক্র ইতিহাসের পাতা থেকে সে সত্যকে মুছে দিতে চায়। নিজেদের অবদানকে বড় করে দেখানোর জন্য ভারতীয় বাহিনীর পরিচালিত প্রকান্ড যুদ্ধকে ইতিহাস থেকেই মুছে দিচ্ছে। ইতিহাসের নামে এটি আরেক মিথ্যাচার।

বলা হচ্ছে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল অবধি বাংলাদেশ ছিল ঔপনিবেশিক পাকিস্তানের একটি কলোনী মাত্র। কিন্তু কিভাবে পাকিস্তানের কলোনী রূপে বাংলাদেশের সে পরাধীনতা শুরু হলো সে বিবরণ তারা দেয় না। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার শুরুর জন্য একটি পলাশীও লাগে। ১৭৫৭ সালে বাংলাকে পরাস্ত করতে বহু হাজার ইংরেজ সৈন্য সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পলাশীর রণাঙ্গণে এসেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলা জয়ে এসেছিল কি কোন পাকিস্তানী সৈন্য? এসে থাকলে কোথায় হয়েছিল সে যুদ্ধটি? তখন কে ছিল সিরাজউদ্দৌলা, আর কে ছিল মীরজাফর? কিরূপে প্রতিষ্ঠা পেল সে ঔপনিবেশিক শাসন? পূর্বপাকিস্তানকে বলা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি বা উপনিবেশ। কথা হল, কলোনি বা উপনিবেশ বলতে কি বুঝায় তা কি তারা বুঝেন? ১৯০ বছর বাংলাদেশ ব্রিটিশের কলোনি ছিল। এ দীর্ঘ ১৯০ বছরে এ ব্রিটিশ কলোনি থেকে কোন বাঙ্গালী কি ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রী দূরে থাক কোন ক্ষুদ্র মন্ত্রীও হতে পেরেছে? অথচ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েছেন সে আমলের পূর্ব পাকিস্তান থেকে। তখন রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হত গভর্নর জেনারেল। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কয়েকবার। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি ছিল এটি নেহায়েতই ১৯৭১-পরবর্তী আবিস্কার। ১৯৭০ এর নির্বাচনের পূর্বে এমনকি শেখ মুজিবও এমন কথা একটি বারের জন্যও বলেননি। পাকিস্তানের ২৩ বছরের জীবনে রচিত হাজার হাজার নিবন্ধ, কবিতা বা গল্প ও উপন্যাসেও এমন কথা একটি বারের জন্যও লেখা হয়নি। অথচ সাহিত্য হল একটি দেশের চেতনার প্রতিচ্ছবি। সে সময়ের সাহিত্যে যে চেতনা ও উপলদ্ধিটি ফুটে উঠেছে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক তাদের লেখা থেকে যারা ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশে বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদের প্রধানতম বুদ্ধিজীবী। পাকিস্তান নিয়ে বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন-

“আজাদ পাকিস্তান, লাখো বক্ষের কামনার ধন,আল্লাহর অবদান। কত শহীদের জিগরের খুনে পাক হল এই মাটি, কত অশ্রুতে ধুইয়া জাতির দুর্দিন

একাত্তরের আত্মঘাতের ইতিহাস ফিরোজ মাহবুব কামাল

গেল কাটি। জাগে নিপীড়িত জনগণ সবে গাহি মুক্তির গান, টুটেছে শিকল আঘাতে আঘাতে ভাঙ্গিয়াছে জিন্দান।”

কায়েদে আজমকে নিয়ে বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন-

“কায়েদে আযম,হে মহান নেতা সাড়া দাও দাও দাও সাড়া, তোমরে হেরেনি,শুনেছিল শুধু তোমান কন্ঠবাণী; জেনেছিল তারা,তুলেছে পতাকা তোমার বজ্রপানি। সিকান্দার আবু জাফর পাকিস্তান নিয়ে লিখেছেন- “নূতন মাটিতে নূতন প্রাণের অধিকার কিনে এনেছি, ওক্ত-আঁখির শাসন-বিহী বাধাহীন গতি প্রতি নিশিদিন কত যে মধুর জেনেছি।” ...(মোহে নও, আগষ্ট ১৯৫২)

ডঃ মাযহারুল ইসলাম লিখেছেন-

“সহসা আলোর পরশ লাগলো প্রাণে প্রাণে এক চেতনা জাগলো আঁধার দুয়ার খুলে গেল সম্মুখে কে তুমি নতুন হে নব-পথ-সন্ধানী আলোক দ্রষ্টা? কে তুমি নতুন মাটির স্রষ্টা।”

বরং সত্য হলো, বাংলার মুসলমানগণই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে পাকিস্তানের পতাকা কাঁধে বিপুল আনন্দ করেছে। সে আনন্দ উৎসব হয়েছে গ্রামে গঞ্জে। সে স্বাধীনতার নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নামে দেশের মানুষ নিজেরা বহু প্রতিষ্ঠান গড়ছে। অসংখ্য মানুষ জিন্নাহর নামে সন্তানদের নাম রেখেছে। বাংলাদেশের কবিরা তার প্রশংসায় বহু কবিতা লিখেছে। কোন হানাদার বা দখলদারের নামে কি সেটি হয়? তারা বরং নিজেরাই পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ মনে করে নিজ দায়িত্বে পাহারাদারির ব্যবস্থা করেছে। ১৯৬৫ সালে হানাদার ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সীমান্তে গিয়ে যুদ্ধও করেছে। স্কুলের ছাত্ররা গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সে যুদ্ধের তহবিলে চাঁদা তুলেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যালয়গুলোতে ২৩ বছর যাবত ছাত্ররা পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত গেয়েছে। স্বাধীনতা দিবস রূপে মহাধুমধামে প্রতি বছর পালিত হয়েছে ১৪ই আগষ্ট। স্বাধীনতার গান ও কবিতা লিখেছেন দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পত্রিকাগুলো বের

করেছে ক্রোড়পত্র। ঔপনিবেশিক শাসনে আটকে পড়া কোন পরাধীন জনগোষ্ঠী কি এরূপ স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে?

আরো প্রশ্ন উঠে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ অবধি বাংলাদেশ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক কলোনী রূপে গণ্য হলে শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের দলীয় পুস্তকে সেটির উল্লেখ কই? সেটির উল্লেখ আছে কি বিশ্বের অন্য কোন ভাষার গ্রন্থে? শেখ মুজিব ১৯৭০এর নির্বাচন লড়েছিলেন পাকিস্তানের অখন্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি লিখিত অঙ্গিকার দিয়েই। এমনকি শেখ মুজিব নিজেও পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন। সেটি হয়েছেন পাকিস্তান যে স্বাধীন রাষ্ট্র সে বিশ্বাস নিয়েই। এবং সে স্বাধীনতার সুরক্ষার শপথ নিয়েছিলেন পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে। শেখ মুজিব কোরআন ছুঁইয়ে পাকিস্তান রক্ষার সে কসমের সাথে নিজে গাদ্দারী করেছেন। কিন্তু বাংলার বহু মানুষ তা করেনি, তারা বিশ্বস্থ থেকেছেন। কিন্তু সে বিশ্বস্থ থাকাটিকে কি অপরাধ বলা যায়? অথচ শেখ মুজিব এটিকে অপরাধ গণ্য করে হাজার হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করেছেন। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে।

কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর তার স্থানে যিনি বসেন এবং পাকিস্তানের কর্ণধার হন তিনিও কোন পশ্চিম পাকিস্তানী ছিলেন না, ছিলেন ঢাকার নবাব খাজা নাযিম উদ্দিন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলী এবং বাংলারই আরেক জন জনাব শহিদ সোহরাওয়ার্দী। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের পরাধীন উপনিবেশই হতো তবে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে কি সে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে বসা সম্ভব হতো? পাঞ্জাবীদের গোলাম হলে সে গোলাম কি সুযোগ পেত বাংলাদেশের ভুগোলের চেয়ে কয়েকগুন বৃহৎ পাকিস্তানী ভুগোলের উপর শাসনের অধিকার? বৃটিশের ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে কোন ভারতীয় নাগরিকের কি পেয়েছিল সে সুযোগ? ঔপনিবেশিক শাসনের ফল হলো এক নির্ভেজাল শোষণ, শোষণমূলক সে শাসনে দেশে কোন শিল্প গড়ে উঠে না। ১৯০ বছরের শাসনে বৃটিশ সরকার বাংলাদেশে একটি পাটকলও প্রতিষ্ঠা করেনি। পাটকল প্রতিষ্ঠা করেছে নিজ দেশের ডান্ডি বা অন্যান্য শহরে। স্থাপন করেনি কোন বস্ত্র, ঔষধ, সিরমিক ও অস্ত্র কারখানাও। প্রতিষ্ঠিত করেনি ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল কলেজ। অতি শেষ সময়ে এসে ঢাকাতে প্রতিষ্ঠা

করেছিল ছোট মাপের একটি বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ পাকিস্তানে মাত্র ২৩ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৭০টিরও বেশী পাটকল। একটি ছিল বিশ্বের সর্ব বৃহৎ পাটকল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৬০টির বেশী বস্ত্র কারখানা। নির্মিত হয়েছিল ষ্টীল মিল, নিউজপ্রিন্ট কারখানা, ডকইয়ার্ড, অস্ত্রনির্মাণ কারখানা। ঢাকাতেই নির্মিত হয়েছিল পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ আজ যা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহু বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

সমস্যা হলো ঔপনিবেশিক শাসন কাকে বলে বস্তুতঃ সেটি বুঝতেই রয়েছে তাদের চরম ব্যর্থতা। বরং প্রকৃত সত্য হলো, পাকিস্তানের ন্যায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের উপর শাসন অধিকার পেয়ে বাংলাদেশী মুসলমানেরা সুযোগ পেয়েছিল মুসলিম উম্মাহর রাজনীতি এবং সে সাথে বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাব ফেলার। বিশ্বের বহুদেশ থেকে বাংলাদেশের মানুষ হাত পেতে বহু কিছুই নিচ্ছে, কিন্তু আণবিক শক্তিধারি বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় অংশিদার থাকলে তাদেরকে কিছু দেওয়ারও সুযোগ পেত। নানা ভাষাভাষি হয়েও প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যেমন উম্মাতে ওয়াহেদার জন্ম দিতে পেরেছিলেন, ২৮ কোটি মুসলমানের পাকিস্তানও হতে পারতো তারই সাম্প্রতিক কালের মডেল। চীন ও ভারতের পর এটিই হতো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। তেমনি একটি দূরদৃষ্টি বা ভিশন নিয়ে উপমহাদেশের নানা ভাষাভাষি মুসলমানগণ কংগ্রেসের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তান গড়েছিল। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানগণ জানতো যে তাদের মাতৃভূমি কখনই পাকিস্তানভূক্ত হবে না। কিন্তু তারপরও তারা পেশ করেছেন কোরবানি। কারণ, এতে তারা বিশ্বের মুসলমানদের কল্যাণ দেখেছিলেন। একটি মুসলিম বিশ্বশক্তি গড়ার প্রচন্ড তাড়না নিয়ে নিজেদের বহু শত বছরের পুরনো পৈতৃক ভিটা ও ব্যবসাবাণিজ্য ছেড়ে পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। এমন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শরিকদার থাকায় বাংলাদেশী মুসলমানদের কি ইজ্জতহানি হতো? স্বাধীন বাংলাদেশের ইজ্জত বেড়েছে কি বিশ্বে তলাহীন ভিক্ষার ঝুড়ি বা দূর্নীতিতে প্রথম হওয়াতে? অপর দিকে স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর বাদ দেওয়ায় বিশ্বের দরবারে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির তালিকায় বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে সবচেয়ে তলার একটি জুনিয়র রাষ্ট্রে। আগামী প্রজন্ম কি এ তথ্য পড়ে বিস্মিত হবে না যে তাদের পূর্বপুরুষ এতই

মেরুদন্ডহীন, চেতনাহীন ও কাপুরুষ ছিল যে বার্মা, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, উগান্ডা, ঘানা, কেনিয়ার মত একশতেরও অধিক দেশের পর স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আওয়ামী গোষ্ঠীর ইতিহাস বিকৃত করার কারণে তারা জানতেই পারবে না যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের নির্মাণে তারাই মূল প্রস্তাবক ছিল। ছিল অন্যতম স্রষ্টা ও কর্ণধার। ভিন্নভাষা বা ভিন্ন বর্ণের মানুষের সাথে এক রাষ্ট্রে বসবাসের অর্থ গোলামী নয়, পরাধীনতাও নয়। নিজেদের আশা- আকাঙ্খাকে খাটো করাও নয়। বরং বহু ক্ষেত্রে সেটিই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

ভারতীয় হিন্দুদের কাছে অখন্ড ভারতে একতাবদ্ধ থাকাটাই তাদের রাজনীতি। তাদের মজবুত অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষার এটিই মূল গ্যারান্টি। তাই বাঙ্গালী হিন্দুগণ অবাঙ্গালী হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অনিচ্ছুক। একই কারণে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে সে ভূমিতে বসবাসকারি ইংরেজ, ফরাসী, আইরিশ, ডাচ বা স্পেনিশগণ। নইলে তাদের পক্ষে অসম্ভব হতো বিশ্বশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে আজ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও। নইলে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে তাদের টিকে থাকাই কঠিন। আজকের বিশ্বে যারা শিল্পে ও সামরিক ক্ষেত্রে উন্নত এটি হলো তাদের অবস্থা। এর বিকল্প যেটি হলো সেটি হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাতার, কুয়েত, বাহরাইন হয়ে শত্রুর পদতলে পিষ্ট হওয়া। সামরিক ঘাঁটি নির্মাণে এবং সীমাহীন লুন্ঠনে দরজা খুলে দেওয়া। সাতচল্লিশে এক গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি কাজ করেছিল সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিনের মত বাংলার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রাজনীতিতে। ফলে তারা সেদিন তাড়িত হয়েছিলেন এক অখন্ড পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায়। নইলে শুরু থেকেই ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতো বাংলাদেশ। এবং একাত্তরে সে অভিন্ন চেতনাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রাণপণে বিরোধীতা করেছিল তাবৎ ইসলামি দল ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যে ব্যক্তির সর্বচ্চ যোগ্যতা হলো বাংলাদেশকে একটি তলাহীন ভিক্ষার ঝূড়িতে পরিণত করা, গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা, রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা এবং দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে ভারতের হাতে দেশের বাজার তুলে দেয়া, শেখ মুজিবের ন্যায় তেমন এক ব্যক্তি থেকে কি সে প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি আশা করা যায়? দেশটির অস্তিত্ব অসম্ভব বলা হয়েছে এ কারণে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে

১২ শত মাইলের ব্যবধান। অথচ দেশটি ভেঙ্গে গেল রাজনৈতিক কারণে, যোগাযোগ বা প্রশাসনিক সমস্যার কারণে নয়। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তের দ্বীপটি থেকে পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপের দূরত্ব এর চেয়ে অনেক বেশী। আরো সত্য হলো বাংলাদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল ১৯০ বছর। অথচ দুটি দেশ ছিল দুটি ভিন্ন গোলার্ধে। মাঝের দূরত্ব ছিল বহু হাজার মাইল। কিন্তু এরপরও প্রশাসনে সমস্যা হয়নি। অথচ তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মত এত উন্নত ছিল না। আসা- যাওয়ায় বহু সপ্তাহ কেটে যেত পথে।

আওয়ামী লীগের মূল সমস্য হলো এরা প্রচন্ড ক্ষমতালোভী। এবং সে সাথে প্রচন্ড অঙ্গিকারহীন ইসলামে। ইসলামে অঙ্গিকারহীন হওয়ার কারণে তারা ছিল পাকিস্তানের অখন্ডতায়ও অঙ্গিকারহীন। ইসলাম, মুসলিম এরূপ ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলির সাথেই তাদের শত্রুতা। যারা তাদের মূল সংগঠন আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিম শব্দটিকেই সহ্য করতে পারেনি তারা কি করে মুসলিম স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারে? যে কোন ভাবে ক্ষমতায় যাওয়াটাই তাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। প্রয়োজন দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হলেও। তারা ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে আন্দোলন জোরদার করতে সব সময় লাশ চেয়েছে। কিন্তু এত লাশ পড়ার মূল কারণও তারা। নইলে ঢাকা, কুমিল্লা, চিটাগাং, যশোর ইত্যাদী শহরে সাত চল্লিশ থেকেই বহু হাজার পাঞ্জাবী সৈন্যের অবস্থান ছিল। বাংলাকে বাঙ্গালী শূণ্য করার মতলব থাকলে, যে অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়, তারা সে সময় থেকেই বাঙ্গালী খুনে লাগতো। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও আওয়ামী লীগ সেই অভিন্ন ষড়যন্ত্রে মশগুল। বিএনপি শাসনামলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বই লিখে তারা বিদেশে প্রচার করেছে। নির্বাচিত দলকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ইতিহাস নতুন নয়। পাকিস্তানে সেটি অনেক বার ঘটেছে। খাজা নাজিমুদ্দিনের মুসলিম লীগ সরকারও অগণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে মোহাম্মদ আলী বগুড়া এবং সোহরাওয়ার্দীর সরকারও। বার্মার অং সান সুকি নির্বাচনে জিতেও ক্ষমতায় যেতে পারেননি। অগণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তুরস্কের নাজিমুদ্দিন আরবাকান সরকার। বিপুল ভোটে এগিয়ে থাকা আলজেরিয়ার ইসলামিক সালভেশন পার্টিকেও সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি। এ তালিকা অতি দীর্ঘ। ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে আওয়ামী লীগ যেভাবে বিদেশী শত্রু সৈন্যদের দেশে ডেকে আনলো এবং পাকিস্তানের ভূগোল খন্ডিত

করলো তেমন আত্মবিনাশী কাজ কিন্তু অন্যরা করেনি। তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন কিন্তু আওয়ামী লীগ তা পারেনি। অপরদিকে শেখ মুজিব দ্বৈত খেলা খেলেছেন। বলা হয়ে থাকে, ইয়াহিয়া খানকে শাসনতান্ত্রিক ভাবে প্রেসিডেন্ট করার প্রলোভন দিয়ে তৎকালীন সামরিক সরকার থেকে সব রকমের সাহায্য- সহযোগিতা নিয়েছেন। এর প্রমাণ, অন্য দলগুলির নির্বাচনী প্রচারের উপর সন্ত্রাসী হামলায় তারা পেয়েছে সরকারের পরিপূর্ণ প্রশ্রয়। এ অভিযোগ জোরেশোরে এনেছিলেন মাওলানা ভাষানী। এ অবস্থায় নির্বাচন অহেতুক জেনে তিনি নির্বাচনে অংশই নেননি। সে নির্বাচনে আওয়ামী সন্ত্রাসের নমুনা অনেক।

১৯৭০ সালের ১৮ ই জানুয়ারির পল্টনে ছিল জামায়াতে ইসলামির জনসভা। আওয়ামী লীগের কর্মীরা সেদিন তিন জন জামায়াত কর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করে। আহত করে মফস্বলের বহু জেলা থেকে আগত বহু শত নিরীহ নাগরিককে। অথচ এতবড় একটি ঘটনা ঘটেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ্যাডমিরাল আহসানের বাসভবন থেকে সামান্য কয়েক শত গজ দূরে। কিন্তু পুলিশ কোন কার্যকর ব্যবস্থাই নেয়নি। কাউকে এ অপরাধে গ্রেফতার করা হয়নি এবং সাজাও দেওয়া হয়নি। পরের সপ্তাহে ২৫ জানুয়ারিতে একই স্থানে জনসভা ছিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের। মূল বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরি। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী শুরুতেই সে মিটিং লন্ডভন্ড করে দেয়। গুন্ডাদের হামলা থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরী সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন তার দলীয় কর্মীদের প্রবল প্রতিরোধের কারণে। কোন পুলিশ তার হেফাজতে এগিয়ে আসেনি। সরকার এ সন্ত্রাসীদের কাউকে গ্রেফতার করেনি বা শাস্তিও দেয়নি। এ ঘটনার পর সন্ত্রাসের প্রবল জোয়ার শুরু হয় সারা দেশব্যাপী। সরকার কোথাও সে নির্বাচনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে কোন দলের পক্ষেই সম্ভব হয়নি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সুষ্ঠ নির্বাচন প্রচার চালানো। ফলে নির্বাচনের বহু আগেই বিজয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ। আর সেটি সুনিশ্চিত করেছিল ইয়াহিয়ার সরকার। অপরদিকে শেখ মুজিব গোপনে ব্যবস্থা করেছেন ভারতের অর্থপ্রাপ্তি ও সামরিক সাহায্যপ্রাপ্তিকে। এভাবে দুপক্ষের সমর্থণ তিনি সুনিশ্চিত করেছিলেন। অবশ্য ভারতের সাহায্য পেতে তার কোন বেগ পেতে হয়নি। বরং ভারতই এমন এক ব্যাক্তির প্রতীক্ষায়

ছিল। শেখ মুজিবের প্রলোভনে ইয়াহিয়া খান এতটাই মত্ত ছিল যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দারা তাকে গোপনে সংগ্রহ করা শেখ মুজিবের ক্যাসেট শুনিয়েও মুজিবের আসল মতলব যে পাকিস্তান খন্ডিত করা সেটি বোঝাতে পারেনি। বরং জবাবে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "ইফ হি ব্রেকস হিজ প্রমিজ আই শ্যাল ফিক্স হিম।"- (G.W.Chowdhury,1974)

প্রশ্ন হলো পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়াকে স্বাধীনতার শত্রু বলা হলে যারা পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তাদেরকে কি বলা যাবে? পাকিস্তানের সৃষ্টিতে জড়িত ছিলেন বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং তাদের নেতা ফজলূল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন, সোহরোওয়ার্দি এবং আরো অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তবে তারা কি বাংলাদেশকে পাকিস্তানভূক্ত করে বাংলাদেশীদের পায়ে পরাধীনতার শেকল পরিয়েছিলেন? তারাও কি আত্মবিক্রীত গোলাম ছিলেন? অন্যদের কাছে ঐক্যের বিষয়টি নিছক রাজনীতি, কিন্তু মুসলমানদের কাছে সেটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। একতার হুকুম এসেছে মহান আল্লাহতায়ালা থেকে। তাই ইসলামে এটি ফরয। এর প্রতিফলন ঘটাতে হয় শুধু নামাযের জামাত বা হজ্বের সম্মেলনে নয়, বরং সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনাসহ সর্বক্ষেত্রে। এটি ফরয প্রতিটি মুসলমানের উপর। তাই ইসলামে অঙ্গিকারবদ্ধ মুসলমানগণ বিস্তর ভুগোল বাড়িয়েছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়াননি।

মুসলিম ভূমিতে বার বার ইয়াজিদের ন্যায় বহু দুর্বৃত্তও শাসক হিসাবে জেঁকে বসেছেন, কিন্ত সে কারণে কেউ দেশ ভাঙ্গার কাজে হাত দেননি। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগণিত মানুষের মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক। শুধু বিগত ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাসেই বাংলাদেশের প্রায় ১০ লাখ মানুষ ভেসে গেছে। কিন্তু এত লোকের মৃত্যুতে শেখ মুজিবের ক্ষমতায় যাওয়ায় নেশায় সামান্যতম ফাটল ধরেনি। তিনি নির্বাচন এক দিনের জন্যও পিছিয়ে নিতে রাজী হননি। অথচ অনেকের পক্ষ থেকে দাবী উঠেছিল নির্বাচন থামিয়ে সে সময় রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজ জোরদার করতে। কিন্ত ক্ষমতা পাগল মানুষের কাছে কি মানুষের জীবনের মূল্য থাকে? তারা তো লাশকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম রূপে। তবে আরো বেদনাদায়ক হল, যদি সে অসংখ্য প্রাণহানীর সাথে দেশেরও মৃত্যু ঘটে। সাদ্দাম হোসেনের আমলে ইরাকের কুর্দিদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় বীভৎস ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে কি কুর্দিদের পৃথক রাষ্ট্র গঠন বা ইরাককে

কয়েক টুকরোয় বিভক্ত করায় কোন মুসলমান খুশি হতে পারে? তখন তো শুরু হয় রক্তক্ষয়ী ফেতনা তথা গোলযোগ। ইরাকে মার্কিন দখলদারির ফলে শিয়া- সূন্নী- কুর্দি পরিচয়ে যে ফেতনা বা গোলযোগ শুরু হয়েছে তাতে মারা গেছে দশ লাখের বেশী মানুষ। গৃহহারা হয়েছে প্রায় সিকিভাগ মানুষ। এখনও সে রক্তাক্ষরণ থামার নাম নিচ্ছে না। স্বৈরাচারি ও বর্বর সাদ্দামের চেয়েও বেশী ভয়ানক, বেশী বর্বর ও বেশী রক্তাক্ষয়ী প্রমাণিত হচ্ছে ফেতনার এ নায়েকরা। সাদ্দাম মুসলিম দুষমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং ইসরাইলের ন্যায় শত্রু পক্ষের এতটা আনন্দ বাড়ায়নি যা বাড়িয়েছে এসব ফেতনার নায়কেরা।

আওয়ামী লীগ তেমনি এক বাঙ্গালী- অবাঙ্গালীর রক্তাক্ষয়ী ফেতনা সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানে। উপমহাদেশের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে ভাষা- ভিত্তিক এমন রক্তাক্ষয়ী ফিতনা বা সংঘাত আর কোন মুসলিম সংগঠন করেনি। ফলে তারাও প্রচন্ড আনন্দ বাড়িয়েছিল মুসলিম দুষমন আগ্রাসী ভারতীয়দের। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের পূর্বে একমাত্র কাশ্মিরের শেখ আব্দুল্লাহ ছাড়া আর কোন মুসলিম নেতাই ভারতীয়দের এত আনন্দ বাড়ায়নি। ভারতীয়দের কাছে শেখ মুজিব এবং তার পরিবার ও দল এজন্যই তো এত প্রিয়। ভারতের মুসলমানেরাও চরম মনকষ্টে ভূগেছে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ায়। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়াতে বহির্বিশ্বে যারা খুশি হয়েছিল এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এসেছিল তারা হলো ভারত, ভূটান ও রাশিয়া। কোন মুসলিম দেশ নয়। ঈমানের আলামত তো এটাই যে কোন মুসলিম দেশের এমন বিভক্তিতে মুসলমানের আত্মা বেদনায় কেঁদে উঠবে। পাত্রে ময়লা লাগায় সেটি ভেঙ্গে ফেলা শিশুসুলভ বুদ্ধিহীনতা। বুদ্ধিমানের কাজ হলো, ময়লা ধুয়ে ফেলা। সেটি সত্য রাজনীতির ক্ষেত্রেও। ইসলামে তাই স্বৈরাচারি শাসকের বিরুদ্ধে জ্বিহাদের অনুমতি আছে, কিন্তু ভূগোল খন্ডিত করার অনুমতি নেই। ভূগোল খন্ডিত হলো শক্তিহীন হয় মুসলিম উম্মাহ। ইসলামে মুসলামানের ঘর ভাঙ্গা যেখানে হারাম, মুসলিম দেশকে খন্ডিত করা সেখানে হালাল হয় কি করে? এ কথা এখন আর অস্বীকারের উপায় নেই যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দূর্বলতা হলো তার ভূগোলে। বৃহৎ ভূগোলের বিকল্প নেই। বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু আয় যদি ১০০ গুণ বেড়েও যায় তবু দেশটির পক্ষে বিশ্ব মাঝে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো

অসম্ভব। সে সামরিক সামর্থ তার নেই। ভৌগলিক সামর্থও নেই। একই কারণে পারছে না কুয়েত। যদিও তাদের মাথাপিছু আয় মার্কিনীদের চেয়েও অধিক। বরং কুয়েতের মত ধনী আরব দেশগুলো বেঁচে আছে মার্কিনীদের পদপিষ্ঠ হয়ে। ভারতের মাথাপিছু আয় কুয়েতের সিকি ভাগও নয়, অথচ ভারত আজ বিশ্বশক্তি। শক্তিশালী রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য শুধু অর্থবল ও লোকবলই নয়, সে সাথে বৃহৎ ভূগোলের বলও চাই। অতীতের মুসলমানেরা রাজনীতির এ অতি মামূলী বিষয়টি ভাল ভাবে বুঝতেন। তাই উমাইয়া, আব্বাসীয়, উসমানিয়া আমলে শাসকদের হাতে বহু অন্যায় হয়েছে, কিন্তু সে কারণে কেউ ভূগোলে হাত দেননি। বরং তারা বহু অর্থ ও বহু রক্ত ব্যয়ে সে ভূগোল বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। তখন চেষ্টা হয়েছে সরকারের সংস্কারের। অথচ দায়িত্বশূণ্য এবং ইসলামি চেতনাশূণ্য স্বার্থপর মুসলমান নেতাদের কারণে যখন রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, তখন ইউরোপ, ভারত, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে মুসলমানদের পরাজয়ও শুরু হল। সাম্রাজ্যবাদ কবলিত হলো মুসলিম ভূমি ও শত্রুদের হাতে আরো খন্ডিত হল তাদের ভূগোল। সে খন্ডিত ভূগোলের হেফাজতে প্রতি দেশে বসানো হল তাঁবেদার পুতুল শাসক। এভাবে মুসলিম ভূমির খন্ডিত মানচিত্রকে একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তিবর্গ খলিফা হযরত ওমরের আমলের সিরিয়ার মত একটি মাত্র প্রদেশ ভেঙ্গে সৃষ্টি হলো সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্দান নামের ৪টি পৃথক দেশ। সৃষ্টি করল ইসরাইল। এভাবে একটি প্রদেশের সমান এলাকায় উড়তে শুরু করলো ৪টি মুসলিম দেশের পতাকা। সে সাথে বাড়তি আরেকটি পতাকা ইসরাইলের। ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং পবিত্র আল- আকসা মসজিদ ও মুসলিম ভূমির উপর ইসরাইলী জবর দখল স্থায়ী করার লক্ষ্যে মুসলিম ভূমির এরূপ বিভক্তিটি জরুরী ছিল। যেমন পাকিস্তানের বিভক্তি জরুরী ছিল ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কিন্তু প্রশ্ন হল, মুসলমানগণ সে বিভক্তির লক্ষে রক্ত দিবে? আমুসলমানরা এখন একতা ভূলে রাষ্ট্রীয় পূঁজির সিংহভাগ খরচ করছে সেসব পতাকা ও খন্ডিত ভূগোলের পাহারাদারিতে। এবং এটিকেই বলছে দেশপ্রেম। এভাবেই উপেক্ষিত হলো মুসলিম উম্মাহর একতা এবং নর্দমায় গিয়ে পড়লো তাদের ইজ্জত।

প্রশ্ন হলো, মুসলমানদের এরূপ পারস্পারিক বিবাদে কাফেরদের সহায়তা নেওয়া কি জায়েজ? ঈমানদার মুসলমান কি তার ভাই- এর সাথে সৃষ্ট বিবাদ মেটাতে অমুসলিম বা কাফেরকে বাড়ীর আঙ্গিনায় ডেকে আনে? সর্বকাজে সে তো সমাজ গড়ে ঈমানদারদের সাথে। তেমনি মুসলমানের রাজনীতিও। তাই জায়েজ কি কোন কাফের শক্তিকে মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ করে দেওয়া? জায়েজ কি তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা? মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ঝগড়া- বিবাদ বা যুদ্ধ- বিগ্রহ নতুন নয়। এমন কি রক্তক্ষয়ী লড়াই- বিবাদ সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও হয়েছে। এরপরও মহান আল্লাহতায়ালা তাদের ঈমান ও আমলে এতই সন্তুষ্ট যে সেটি জানিয়ে তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। সর্বকালের মুসলমানদের মাঝে মূলতঃ তারাই শ্রেষ্ঠ মুসলমান। তাদের নামের সাথে পরবর্তীকালের মুসলমানগণ রাযীআল্লাহু আনহু পাঠ করে থাকে। সেটি যেমন হযরত আলী (রাঃ)র উপর, তেমনি হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)র উপর। বহু নেক আমলের পাশে তাদের অন্যতম মহৎ গুণ হলো নিজেদের বিবাদে কাফেরদের নাক গলানোর সুযোগ দেননি। অথচ প্রতিযুগের ন্যায় সে যুগের প্রতিবেশী কাফের রাষ্ট্রও এমন বিবাদে হস্তক্ষেপের জন্য উদগ্রীব ছিল। অথচ আওয়ামী লীগসহ দেশের স্যেকুলার পক্ষের বড় অপরাধ হল তারা ভারতের কাফের সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডেকে এনেছে। তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু এখনও তারাই। অথচ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলিম নিধন, মুসলমানদের সম্পদ লুন্ঠন এবং তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়াই হলো সে দেশের রাজনীতি। মুসলমানদের সে দেশে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। মা- বোনেরা সে দেশে পুলিশের সামনে ধর্ষিত হয় এবং নিহত হয়। একবার দুইবার নয়, এমন ঘটনা ঘটেছে বহু হাজার বার। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে সে দেশে দশ ঘন্টা ধরে প্রকাশ্য দীবালোকে ধ্বংস করা হলো। শত শত পুলিশ সেটি নীরবে দেখলো। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কোন ব্যবস্থাই নিলেন না। এ অপরাধের জন্য কাউকে দেওয়া হল না শাস্তি। মুসলিম জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ, অথচ সরকারি দফতরে শতকরা দুই ভাগ চাকুরিও তাদের দেওয়া হয় না। এবং এসবই হল ভারতের সরকারি নীতি। এমন একটি মুসলিম বিরোধী দেশ মুসলমানের কল্যাণে একটি যুদ্ধ করবে এবং একটি তীর ছুঁড়বে সেটি কি বিশ্বাস করা যায়? তারা তো যুদ্ধ করে মুসলিম দেশ লুন্ঠনে বা মুসলিম দেশ ধ্বংসের লক্ষ্যে। একাত্তরে সেটি তারা

প্রমাণও করেছে। একটি কাফের রাষ্ট্র থেকে আর কিইবা আশা করা যায়? আওয়ামী–বাকশালীদের বড় অপরাধ হল, তারা ভারতকে সে লুন্ঠনে এবং উপমহাদেশে মুসলিম শক্তির খর্ব করণে সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। সন্ত্রাসীদের পেশীবলে এখন তারা পার পেয়ে গেলেও ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাদের দাঁড়াতেই হবে।

এক সময় মীর জাফরকে কাঠগড়ায় তোলা সম্ভব হয়নি। তাকে নিরাপত্তা দিত লর্ড ক্লাইভের ব্রিটিশ বাহিনী। কিন্তু ইতিহাস তার রায় শুনিয়ে দিয়েছে। ইতিহাস রায় দিয়েছে কাশ্মিরের শেখ আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধেও। ফলে তার কবরকে এখন পুলিশ দিয়ে পাহারা দিতে হয়। এ ভয়ে না জানি তারা হাড্ডিগুলোকে কবর থেকে তুলে কেউ পিটানো শুরু না করে। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ইসলামে হারাম। আল্লাহতায়ালার সে সুস্পষ্ট ঘোষণাটি এসেছে এভাবে,

ইয়া আইয়োহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুনাল কাফিরিনা আওলিয়া মিন দুনিল মু'মিনিন,আ'তুরিদুউনা আন তাজয়ালু লিল্লাহি আলাইকুম সুলতানাল মুবিনা।"-(সুরা নিসা ১৪৪)

অর্থঃ "হে ইমানদারগণ! তোমরা মুমিদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও।"

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করাটিকে শুধু হারাম বলা হয়নি, বরং হুশিয়ারিও শুনানো হয়েছে, এমনটি করা হলে সেটি হবে কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য আল্লাহতায়ালার হাতে অকাট্য দলীল তুলে দেওয়া। এ কঠোর হুশিয়ারি শোনার পর যার মনে আল্লাহর ভয় আছে এমন মুসলমান কি ইসলামি প্রজাতন্ত্র দেশ ছেড়ে ভারতের কাফেরদের গৃহে গিয়ে উঠতে পারে? নিতে পারে কি তাদের অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ? এবং সেটিও মুসলিম হত্যার কাজে? এমন হারাম কাজটি যে ইহকালে ও পরকালে আযাব ডেকে আনবে সে ভয়েই বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞ আলেম, মাদ্রাসার কোন শিক্ষক, মসজিদের কোন ইমাম বা ইসলামি সংগঠনের কোন নেতা একাত্তরে ভারতে যাননি। ভারতের অস্ত্র নিয়ে একটি মুসলিম দেশের বিনাশে

যুদ্ধেও নামেননি। অথচ দেশের সে্যকুলার- বাকশালী পক্ষটি ভারতীয় কাফেরদের অস্ত্র নিয়ে সম্পূর্ণ উল্টোটি করেছে। ঈমানদারদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার বদলে যুদ্ধ কালে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে বহু হাজার আলেমকে। ক্ষমতা লাভের পর কারারুদ্ধ করেছিল বহু হাজারকে। সংকুচিত করেছে মাদ্রাসা শিক্ষা।

তবে এর অর্থ এ নয় যে পাকিস্তানের মানুষ ফেরেশতা ছিল। যেমনটি নয় বাংলাদেশের মানুষও। জালেম ফাসেক, জ্বিনাকারি ও খুনি যেমন বাংলাদেশে রয়েছে তেমনি পাকিস্তানেও আছে। বিশ্বের প্রতিদেশেই তা আছে। কিন্তু তাদের কারণে কি একটি রাষ্ট্রকে বিনাশ করা যায়? বরং দেশের নাগরিক হিসাবে মুসলমানের দায়িত্ব হল,নিজ দেশের পরিশুদ্ধির জন্য কাজ করা।দেশকে ধ্বংস করা নয়।ধ্বংসে তো আগ্রহ থাকবে বিদেশী শত্রুদের। তাছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করায় কি ইজ্জত বাড়ে? আওয়ামী লীগ দলীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কোলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী রূপে অভিহিত করা হয়েছে। দেশ পরিণত হয়েছিল তলাহীন ঝুড়িতে। সত্তরের দশকে কুকুরের সাথে খাবার নিয়ে লড়াই করেছে মানুষ। কুকুরের সাথে মানুষের সে লড়াই সারা দুনিয়ার মানুষ টিভিতে দেখেছে এবং পত্রিকায় পড়েছে। বাংলাদেশের বহু হাজার বছরের ইতিহাসে এমন অপমান নেই। এটি কি কম আযাব? অথচ এটিই আওয়ামী- বাকশালীদের বড় অর্জন। কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাববে গ্রহণ করলে এমন আযাব যে অনিবার্য সে ঘোষণা পবিত্র কোরআনে এসেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

“আল্লাযীনা ইয়াত্তাখিযুনাল কাফিরিনা আউলিয়া মিন দুনিল মুমিনিনা আ'ইয়াবতাগুনা ইন্দাহুম ইজ্জাতা ফা ইন্নাল ইজ্জাতা লিল্লাহি জামিয়া।”-(সুরা নিসা ১৩৯)

অর্থঃ “যারা মুমিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর।”

মহান আল্লাহতায়ালা আরো বলেছেন,

“ঈমানদারগণ যেন ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।”-(সুরা আল- ইমরান, আয়াত ২৮)

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নেই, বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সামনে পথ একটিই। তা হল, ঈমানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা। আল্লাহর সাথে মোমেনের সম্পর্ক একমাত্র এ পথেই স্থাপিত হয়। অপর দিকে সে সম্পর্ক ছিন্ন হয় কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ায়। তখন আযাব নেমে আসে নানা ভাবে। এ বিশ্বে পক্ষ মাত্র দুটি: একটি আল্লাহর পক্ষ, অপরটি শয়তানের। মুসলমান হওয়ার অর্থই হল, প্রতি কর্মে আল্লাহর পক্ষ নেওয়া। সেটি রাজনীতি হোক, সমাজনীতি হোক বা জীবন ও জগতের অন্য কোন প্রসঙ্গ হোক। মুসলমানের ইজ্জত তো আসে একমাত্র আল্লাহ থেকে। কাফের ব্যক্তি বা আল্লাহর বিরুদ্ধ- শক্তিকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করায় বাড়ে অপমান। শুধু দুনিয়ায় নয়, আখেরাতেও। এমন ব্যাক্তদের যাত্রা শুরু হয় অন্ধকারের পথে। মহান আল্লাহতায়ালার সে পবিত্র ঘোষণাটি এসেছে এ ভাবেঃ

“আল্লাহু ওয়ালীউল্লাযীনা আমানু ইউখরিযুহুম মিনাল যুলুমাত ইলাননূর। ওয়াল্লাযীনা কাফারু আওলিয়াহুমুত্তাগুত। ইউখরিযুনাহুম মিনান্নূরি ইলায যুলুমাত। উলায়িকা আসহাবুন্নারি হুম ফিহা খালিদূন।”

অর্থঃ “যারা ঈমান আনলো তাঁদের বন্ধু হল আল্লাহ। তিনি তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা (আল্লাহর দ্বীনকে)অস্বীকার করল(অর্থাৎ কুফুরি করল) তাদের বন্ধু হল শয়তান তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারার হল জাহান্নামের আগুনের বাসিন্দা যার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে।”(সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৭)

কোন মুসলমান কি এ কোরআনী সত্যকে অস্বীকার করতে পারে? অতএব ভারতের আগ্রাসী ও মুসলিম দলনকারি হিন্দুদেরকে বা সমাজতন্ত্রী নাস্তিকদের যারা নিজেদের সাহায্যকারি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তারা কি আলোর সন্ধান পায়? পায় কি আল্লাহর সাহায্য? পায় কি ইজ্জত? পায় নি। বাংলাদেশের ইতিহাসই তার সাক্ষী। ফলে মুজিব যেমন নিজের ও নিজ

পরিবারের উপর ধ্বংস ডেকে এনেছে, তেমনি চরম বিপর্যয় ও তলাহীন ভিক্ষার ঝুলির অপবাদ ডেকে এনেছে বাংলাদেশের উপর।

তবে গণতন্ত্রে আযাব শুধু আল্লাহর অবাধ্য নেতার উপরই আসে না, আসে তাদের উপরও যারা তাদেরকে জেনেবুঝে নির্বাচিত করে। আযাব তখন ভাগাভাগি হয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশের উপর এসেছে উপর্যুপরি বন্যা, প্লাবন, ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। সেকুলারগণ আল্লাহর এরূপ আযাবকে বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অথচ ইসলামের পরিভাষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে কিছু নেই। সেটি হলে আদ, সামুদ, মাদায়েনে অধিবাসী, হযরত নুহ (আঃ) এবং হযরত লুত (আঃ)এর কউমের উপর যে মহাবিপদ নেমে এসেছিল পবিত্র কোরআনে সেগুলোকেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হত। অথচ কোরআন সে গুলিকে বলেছে আযাব। অথচ সেকুলারগণ সে কোরআনী পরিভাষাকে মানতে রাজি নয়। সেকুলারিজমের আভিধানিক অর্থ ইহজাগতিকতা; পরকালীন চেতনা তাদের কাছে কুসংস্কার। তাই সমাজকে কুসংস্কারমূক্ত করার নামে ইসলামের এ দুষমনেরা মানুষের মন ও মনন থেকে যেমন আল্লাহ- সচেতনতা ও পরকালের ভয়কে ভূলিয়ে দিতে চায়, তেমনি ভূলিয়ে দিতে চায় আল্লাহর আযাবের ধারণাকেও। এ লক্ষ্যে সেকুলারদের আবিস্কৃত বিকল্প পরিভাষাটি হল "প্রাকৃতিক দুর্যোগ"। মুসলিম সমাজে ইসলামী চেতনা বিনাশে সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের এ হল আরেক অপরাধ। অথচ প্রকৃতির সামর্থ নেই গাছের একটি মরা পাতা ফেলার, যদি না আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটির অনুমোদন না আসে। ইসলামের এটি মৌলবিশ্বাস। তাই মুসলমান হওয়ার অর্থ এই নয়, সে শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর নবী- রাসূল, কেতাব ও আখেরাতে বিশ্বাস করবে। বরং তাকে বিশ্বাস করতে হয় আল্লাহর সর্বব্যাপী ক্ষমতাকে। গাছের পাতা কখন গজাবে এবং কখন ঝড়ে পড়বে সেটিও সে মহান রাব্বুল আ'লামিন নির্ধারণ করেন। এ বিশ্বাসটুকু না থাকলে কেউ কি মুসলমান হতে পারে?

একটি জনপদে আযাব পাঠিয়ে মহান আল্লাহপাক তাঁর বান্দাহর মনে ভয় সৃষ্টি করেন। এভাবে ফিরিয়ে নিতে চান তাঁর যিকর বা স্মরণের দিকে। প্রতিটি মোমেন তাই প্রতিটি দুর্যোগের মাঝে ঈমান ফিরে পায়। কিন্তু সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের কারণে বাংলাদেশ পুনঃ পুনঃ আযাবের দেশে পরিণত হলেও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ সৃষ্টি হচ্ছে না অধিকাংশ মানুষের। তাদের মন থেকে আল্লাহতায়ালার সে আযাবকেই ভূলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে দেশে বার

বার আযাব আসলে কি হবে, বাড়ছে না আল্লাহর ভয়। বাড়ছে না আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অঙ্গিকার। মানুষ ডুবছে পাপের গভীরে। দূর্নীতিতে বিশ্বে পাঁচ বার প্রথম হয়ে পাপাচারে সে বিপুল পারদর্শিতার কথা প্রমাণও করেছে। মানুষ তো নানবিধ দূর্নীতি করে ইহজাগতিক জীবনকে বেশী বেশী আনন্দময় করতে। একমাত্র পরকালের ভয়ই তাকে সে পাপাচার থেকে ফিরিয়ে রাখতে। আল্লাহর উপর ঈমান বান্দাহকে পরিণত করে সার্বক্ষণিক পুলিশে। সে তখন সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যায়কে রুখে। পবিত্র কোরআনের ঈমানদারদের সে বর্ণনাটি এসেছে এভাবে,

"তোমাদের মধ্যে এমন দল মানুষকে অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানুষকে ভাল কাজের দিকে ডাকবে এবং ন্যায় কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজকে রুখবে;এবং তারাই হল সফলকাম।"-(সুরা আল- ইমরান, আয়াত ১০৪)

তাই ঈমানদার হওয়ার অর্থ শুধু নামায পড়া নয়, নিছক রোযা রাখাও নয়। তাকে সমাজে ন্যায়র প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে অবৈতনিক পুলিশের ভূমিকায়ও নামতে হয়। ঈমানদারদের সফলতা তো আসে এ পথেই। তাই ঈমানদারের সংখ্যা যে দেশে বেশী সে দেশ কি কখনও দূর্নীতিতে বিশ্বে রেকর্ড গড়তে পারে? সে দেশ তো রেকর্ড গড়ে সুনীতি ও সৎকর্মে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সে ইতিহাসই নির্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান, কিন্তু ক'জনের মধ্যে সে ঈমান? ঈমান সৃষ্টি হলে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বপালনে প্রবল আগ্রহও সৃষ্টি হয়। দূর্নীতিতে বাংলাদেশের বিশ্ব- রেকর্ডই প্রমাণ করে এ দেশের মুসলমানেরা মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অর্পিত সে পুলিশী দায়িত্ব পালন করেনি। অন্যায়কে না রুখে তারা বরং অন্যায়ের প্রসারে কাজ করেছে।

কথা হল, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন দূর্বৃত্তির পথে বাড়ায় তখন মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রীয় পুলিশ দিয়ে কি তা দমন করা যায়? দেশের জেলখানাগুলোতেই বা এত দুর্বৃত্তের স্থান হয় কি করে? বাংলাদেশীদের মূল সমস্যাঃ তাদের চেতনালোকে বেড়ে উঠেনি পরকালের ভয়। বাড়েনি ইসলামের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের লক্ষ্যে অঙ্গিকার। ফলে ইসলামী বিধান ও মূল্যবোধ পরাজিত হলেও এমনকি নামাযীদের মধ্যেও তা নিয়ে কোন

মাতম নেই। বাংলাদেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের বিরাট সাফল্য মূলতঃ এ ক্ষেত্রটিতে। সাধারণ মানুষের চেতনালোককে তারা যে কতটা পরকালের ভয়শূণ্য করতে পেরেছে সেটি ইসলামের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ে তাদের অঙ্গিকারহীনতাই বলে দেয়। সেকুলারদের দ্বারা বাংলাদেশের মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস বা কোরআনে আগুণ লাগানো না হলে কি হবে, তারা বিধ্বস্ত করেছে সাধারণ মানুষের মনে পরকালের ভয়ের চেতনা। বিনাশ করেছে আল্লাহসচেতনা। এভাবে প্রচন্ড সফলতা পেয়েছে তাদের ডি-ইসলামাইজেশন প্রজেক্ট। ইসলাম রয়ে গেছে শুধু খোলস রূপে। এর ফল দাঁড়িয়েছে, নামায- রোযা পালন করেও মানুষ ঘুষ খায়, সূদ খায়, মিথ্যা কথা বলে এবং ইসলামের পরাজয় সুনিশ্চিত করতে চিহ্নিত দুর্বৃত্তদের ভোট দেয়।

অধ্যায় ১৯: যে ইতিহাস আত্মঘাতি বুদ্ধিবৃত্তির

খুন, মদ্যপান বা ব্যাভিচারের চেয়েও জঘন্য হলো অনৈক্য বা বিভেদ। কারণ খুন, মদ্যপানে বা ব্যভিচারে ধ্বংস হয় কতিপয় ব্যক্তি। অনৈক্যে ধ্বংস হয় একটি দেশ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমগ্র উম্মাহ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ পরস্পরের ভাই। আর সে ভ্রাতৃত্বের নমুনা কি এই,দুই ভায়ের মাঝে অনতিক্রম্য প্রাচীর গড়া হবে? সীমান্ত রেখা তো বিভেদেরই প্রাচীর। মহাসাগর অতিক্রমের ন্যায় বিভেদের এ প্রাচীর অতিক্রম করাও দূরুহ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে বিভক্তি হলো ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা। ইসলামে সেটি হারাম। রাষ্ট্রে বিরাজমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে নাগরিকের প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে, কিন্তু অধিকার নেই মুসলিম ভূগোলকে খন্ডিত করার বা উম্মাহর মাঝে বিভেদ গড়ার। তাই গাধা, ঘোড়া ও উট ছাড়া যখন অন্য কোন যানবাহনই ছিল না, তখনও বহু হাজার মাইলের ব্যবধানে নানা ভাষা ও নানা বর্ণে বিভক্ত মুসলমানরা একতাবদ্ধ থেকেছে। রাজধানি এবং রাষ্ট্রের খলিফা বহু হাজার মাইল দূরে থাকলেও সে কারণে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়নি। ফলে মুসলিম ভূমি খন্ডিত হয়নি। মরক্কো, মিশর, লিবিয়া বা আলজেরিয়ার মুসলমানগণ বহু হাজার মাইল দূরের ইস্তাম্বুলের সাথে অখন্ডতা বজায় রেখেছে।

সে দূরত্ব ইসলামাবাদ থেকে ঢাকার দূরত্বের বহুগুণ বেশী। তখন বিমান ছিলনা। যন্ত্রচালিত জাহাজও ছিল না। কিন্তু ছিল প্যান ইসলামিক চেতনা। ছিল ইসলামি উম্মাহর চেতনা। এ চেতনায় নানা ভাষা ও নানা বর্ণের মুসলমানেরা নিজেদের কল্যাণ- চিন্তায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে কাজ করে। এ চেতনার কারণেই মুসলিম ভূমিকে যখন খন্ডিত করার চেষ্টা হয়, তখন তার বিরোধীতাও হয়। মুসলমান পরাজিত হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রে ঐক্যের পতাকাবাহি ইসলামে অঙ্গিকারপূর্ণ মুসলমান যে বেঁচে আছে সেটি প্রমাণিত হয় ঐক্যবিনাশী কাজের বিরোধীতার মধ্য দিয়ে। ১৯৭১- এ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী দলসমূহ বা আলেমগণ পাকিস্তান থেকে এ প্রদেশটির বিচ্ছিন্নতায় সমর্থণ না দেওয়ার কারণ ছিল এমনই কোরআন- নির্ভর চেতনা। ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার নয়। তাদের সে প্যান- ইসলামিক রাজনীতির মূল্যায়ন আজ যে ভাবেই হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে যতই নিক্ষিপ্ত হোক ইসলামি চেতনাশূণ্য ব্যক্তিদের গালিগালাজ, আজ থেকে অর্ধ শত বা শত বছর পর বাংলার মানুষগণ যখন প্যান- ইসলামি চেতনায় উজ্জিবীত হবে তখন সে নতুন প্রজন্মের বহু মানুষ বিস্ময়ে বলবে, জাতীয়তাবাদের প্লাবনে সবাই যখন শিকড়হীন আগাছার ন্যায় ভেসে যায়, আমাদের পূর্ব পুরুষদের অন্ততঃ কিছু লোক তখন মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করেছে। ভাষা ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে তারা মুসলিম ঐক্যের কথা বলেছে এবং ত্যাগ স্বীকারও করেছে। কাফেরদের অস্ত্র কাঁধে নিয়ে যখন মুসলিম হত্যা ও তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের উৎসব হচ্ছিল, অন্ততঃ কিছু লোক তার বিরোধীতা করেছিল।

মেজর আব্দুল জলিল একজন মুক্তিযুদ্ধা ছিলেন। যে কারণে ইসলামপন্থিগণ একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষ নেননি এবং বিরোধীতা করেছেন বাংলাদেশ সৃষ্টির, সেটি তিনি বুঝেছেন বহু বছর পর। দেখা যাক তাঁর সে পরবর্তী উপলব্ধিটা কি ছিল। তিনি লিখেছেন,

"স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি- ঝুঁকি মারে এ কারণে যে, ২৫ মার্চ সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের

শত্রু হিসাবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? তাহলে কি স্বাধীনতা- বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থি দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল। তাদের শঙ্কা এবং অনুমান সত্য হয়ে থাকলে দেশপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার- আলবদর হিসাবে যারা পরিচিত তারা?”- (মেজর (অবঃ) আব্দুল জলিলঃ অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃষ্ঠা ৭- ৮)

অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ প্রতিদেশেই আযাব ডেকে আনে। পবিত্র কোরআনে আভ্যন্তরীণ গোলাযোগ, বিশৃঙ্খলা ও বিভেদকে বলা হয়েছে ফিতনা। ইসলামে এটি হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। কারণ, হত্যাকান্ডে বেদনাদায়ক মৃত্যু ঘটে কিছু ব্যক্তির। অনৈক্য বা ফিতনায় মৃত্যু ঘটে একটি দেশের বা মিল্লাতের। এতে প্রচন্ড দুর্বলতা ও বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় শত্রুর হামলার মুখে মুসলিম উম্মাহর টিকে থাকা বা বেঁচে থাকার সামর্থে। তখন শত্রুর হাতে বিশাল বিপর্যয় নেমে আসে অগণিত মুসলমানের জীবনে এবং শত শত বছর পিছিয়ে যায় মুসলিম উম্মাহ। ইসলামি আইনে ফিতনা এজন্যই হত্যাযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ। অতীতে আভ্যন্তরীণ ফিতনাই বিজয় তুলে দিয়েছিল বর্বর মোঙ্গলদের হাতে। মোঙ্গালদের সে বিজয়ে মৃত্যু ডেকে এনেছিল লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারীর। ধ্বংস হয়েছিল বাগদাদ ও দামেস্কসহ অসংখ্য মুসলিম জনপদ। রক্তলাল হয়েছিল দজলা- ফোরাতের পানি। এ ফিতনাই ভারতের বুকে উপর্যপরি বিজয় দিয়েছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের। এবং একাত্তরে সে বিজয় দিয়েছিল ভারতীয়দের। অথচ পাকিস্তান এক সময় কোরিয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। কোরিয়া লাগাতর এগিয়ে গেছে, কিন্তু পাকিস্তান পারেনি। কারণ, আভ্যন্তরীন গোলযোগ তথা ফিতনা। ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও মাজহাবের নামে সে ফিতনা আজও অতি প্রবল মুসলিম বিশ্ব জুড়ে। এ ফিতনার কারণে আজও আযাব আসছে নানা ভাবে। পরাজয়, অপমান, শোষণ, নির্যাতন, হত্যা এবং রাজনৈতিক গোলামী হলো তার আলামত। সংখ্যায় বিপুল এবং সম্পদশালী হয়েও মুসলমানেরা আজ শক্তিহীন ও ইজ্জতহীন। বিশ্ব রাজনীতিতে তারা প্রভাবহীন। বিশ কোটির বেশী আরব পরাজিত হচ্ছে অর্ধকোটি ইসরাইলীদের হাতে। কারণ, নানা দেশের নানা ভাষাভাষী ইসরাইলী একতাবদ্ধ হলেও একই ভাষা ও একই ভূখন্ডের আরবগণ তা পারেনি। সেখানেও কাজ করছে গোত্র, ভূগোল, মজহাব ও

রাজনৈতিক আদর্শ- ভিত্তিক ফিতনা। বিশেরও বেশী টুকরায় বিভক্ত হলো তাদের ভূমি।

পাঁচ শত বছর পূর্বেও মুসলমানদের এত পতাকা ছিল না। কিন্তু যতই বাড়ছে পতাকা ততই বাড়ছে শক্তিহীনতা। জাতীয় ঝান্ডা পরিণত হয়েছে আল্লাহর বিরুদ্ধে অবাধ্যতার ঝান্ডা তথা অনৈক্যের প্রতীকরূপে। মুসলমান ফিরে গেছে ইসলাম পূর্ব আইয়ামে জাহিলিয়াতের তথা আদিম অজ্ঞতার দিকে। তখন নানা গোত্রে বিভক্ত হয়ে তারা একই যুদ্ধ শত বছর ধরে করতো। নানা বর্ণ ও নানা ভাষায় মানুষ সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এ নয় যে, ভাষা বা বর্ণভিত্তিক পরিচয়ে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টি হবে। তা হলে একমাত্র ভারতেই শত রাষ্ট্রের জন্ম হতো। বিচিত্র ভাষা ও বর্ণে মানব সৃষ্টির যে কারণটি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে তা হলো,একে অপরকে চিনতে সে ভিন্নতা সাহায্য করবে। রাষ্ট্র নির্মাণে অনুপ্রেরণা আসবে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষে। বর্ণ বা ভাষাভিত্তিক ক্ষুদ্রতা থেকে নয়। হিন্দু ধর্মে একতা প্রতিষ্ঠার প্রতি কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নেই। নেই কোন উম্মাহর ধারণা। বরং আছে জাত- পাতের বিভেদ। অথচ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তারাও অনেক উর্দ্ধে। মুসলমানদের অবস্থান তাদের চেয়ে অনেক নীচে। ফলে মুসলমানদের চেয়ে জনশক্তিতে অর্ধেক হয়েও ভারত আজ বিশ্বশক্তি। অথচ সে সম্মান নেই প্রায় দেড় শত কোটি মুসলমানের। তারা নিহত ও ধর্ষিতা হচ্ছে দেশে দেশে। আবুগারিব ও গোয়ান্তানামোর মত অসংখ্য কারাগার পূর্ণ হচ্ছে তাদের দিয়ে।

মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের চেতনা যতদিন বেঁচেছিল ততদিন বেঁচে ছিল বৃহৎ ভূগোলও। ফলে শত শত বছর ধরে বেঁচেছিল খেলাফত। তখন ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গ তাদের দূর্দান্ত দাপটের দিনগুলিতেও খেলাফতভূক্ত জনপদে হামলা করতে ভয় পেত। অনৈক্য সে শক্তিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। মুসলিম ভূমিতে অনৈক্য সৃষ্টির সে ঘৃণ্য হারাম কাজটিই সমাধা করেছে স্যেকুলার জাতীয়তাবাদী শক্তিবর্গ। মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে এরাই সর্বনাশা কীট। উঁই পোকার ন্যায় তারা ভিতর থেকে নিঃশেষ করেছে প্যান- ইসলামিক চেতনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে আরব ভূমিতে এরাই বৃটিশবাহিনীকে ডেকে এনেছিল। যেমন বাংলাদেশে এরা ডেকে এনেছিল কাফের বাহিনীকে। এরাই দেশকে তলাহীন ভিক্ষার ঝুড়ি এবং দূর্নীতিতে প্রথম স্থানে পৌছে দিয়েছে।

এমন বিশ্বজোড়া অপমান কি একটি দেশের জন্য কম আযাব। এত অপমান নেই যুদ্ধে হেরে যাওয়ায়। কারণ যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও ভৌগলিক কারণসহ অনেক কারণ। কিন্তু তলাহীন ভিক্ষার ঝুড়ি এবং দূর্নীতি প্রথম স্থানে পৌছার বিষয়টি নিতান্তই নৈতিক। এটি মানুষের নিজস্ব অর্জন। দেশের মানুষগুলো নিজেরা যে কতটা খারাপ সে প্রমাণ মেলে এ থেকে। আগুনে বাড়ী পুড়লে বা ঝড়ে ঘর উড়ে গেলেও তাতে অসম্মান নেই। কিন্তু সমাজে দুর্বৃত্ত বা দূর্নীতিবাজ রূপে পরিচিতি পেলে তাতে চরম ইজ্জতহানী হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশীদের মর্যাদাই বা বেড়েছে কতটুকু? বিদেশীদের অস্ত্র নিয়ে যারা ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, সূদান বা কোন মুসলিম ভূমিকে খন্ডিত করবে তাদের মর্যাদাই বা মুসলিম বিশ্বে কীরূপ হবে? তাদের সম্মান কি এতে বাড়বে? তখন বরং বেদনায় ক্রন্দন উঠবে বিশ্বের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সাথে বাংলাদেশের মুসলমানের আত্মায়ও। আর সে ক্রন্দনটুকুই তো ঈমানের লক্ষণ। যে কোন মুসলমানদের কাছে এমন কাজের নায়কগণ চিত্রিত হবে বিশ্বাসঘাতক বা গাদ্দার রূপে। মুজিব সে পরিচিতিটি পেয়েছে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে।

যারা ভারতীয় মুসলমানদের খবর রাখে তারা জানে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরে সে দেশের ঘরে ঘরে কিরূপ মাতম উঠেছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পর তাই স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত, ভূটান, সোভিয়েত রাশিয়ার মত অমুসলিম দেশ, কোন মুসলিম দেশ নয়। এটি সত্য, পাকিস্তানে বৈষম্য ছিল। অবিচারও ছিল। তবে সে বৈষম্য ও অবিচারের সমাধানও ছিল। ভারতের আসাম বা বিহারের সাথে পাঞ্জাবের বৈষম্য কি কম? কিন্তু তা নিয়ে ঘরে চিহ্নিত শত্রুকে ডেকে আনা কি কল্যাণকর প্রমাণিত হয়? তাছাড়া গণতন্ত্রের দোহাই? সেটিই বা কতদূর সত্য? পাকিস্তান আমলে যে নির্বাচন শেখ মুজিব নিজে উপভোগ করেছেন তা কি নিজেও জনগণকে দিতে পেরেছেন? তিনি বরং বহুদলীয় গণতন্ত্রকে কবরে পাঠিয়েছিলেন। রুদ্ধ করেছিলেন বাক স্বাধীনতা।তখন আওয়ামী রক্ষিবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল বহু হাজার রাজনৈতিক কর্মী। ফলে এমন স্বৈরাচারি ও গণতন্ত্র হত্যাকারিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জনক বললে প্রকৃত গণতন্ত্রিকে কি বলা হবে? বাংলার মুসলমানদের এভাবে দ্রুত নীচে নামার ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের

মুসলমানদের সৌভাগ্য যে, বৃটিশ শাসনের শেষপ্রান্তে মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহারের ন্যায় প্যান- ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ বিপুল সংখ্যক জ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছিল। উপমহাদেশের মুসলমানদের এটিই রেনেঁসা যুগ। তারা গড়ে তুলেছিলেন শক্তিশালী মিডিয়া এবং ইসলামি সাহিত্য। ফলে তৎকালীন মুসলিম যুবসমাজকে তারা আলোকিত ও আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন। তারাই উপমহাদেশে গড়ে তুলেছিলেন ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বৃটিশ বিরোধী গণআন্দোলন। যা পরিচিত পেয়েছিল খেলাফত আন্দোলনরূপে। এবং সেটি করেছিলেন কোনরূপ সংগঠন ছাড়াই। মানুষের মাঝে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল প্রচন্ড প্যানইসলামিক চেতনা। ১৯১১ সাল অবধি ভারতীয় মুসলমানদের সে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মের মূলকেন্দ্র ছিল কোলকাতা। কারণ এ শহরটি তখন ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী। এখান থেকেই বের হত ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ইসলামি চেতনা সমৃদ্ধ নানা পত্র- পত্রিকা যা পেশোয়ার থেকে চট্রগ্রাম পর্যন্ত প্রচারিত হতো। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকর্মের এ ব্যাপক জোয়ার তখন সবচেয়ে অধিক আন্দোলিত হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। তারই ফল হলো, বাংলাতে প্রতিষ্ঠা পেল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় তখন বাংলার নানা শহরে অনুষ্ঠিত হতো প্রতিবছর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ক নানা সন্মেলন। বাংলার গ্রামেগঞ্জে এভাবে ব্যাপ্তি পেয়েছিল প্যানইসলামি চেতনা। ফলে বাংলার মুসলমানগণ ১৯৪৭য়ে স্বেচ্ছায় শুধু পাকিস্তানভূক্তই হয়নি বরং সে লক্ষে সমগ্র ভারতে নেতৃত্বও দিয়েছে। মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাবের উপস্থাপনা করেছিলেন বাংলার ফজলূল হক। কি ১৯৪৭এর পর বন্ধ হয়ে যায় কোলকাতা কেন্দ্রীক সে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা শহরে সে কাজটি সে ভাবে শুরুই হয়নি।

কোন জাতি নিছক পানাহারে বাঁচে না। দেহের খোরাকের সাথে মনের খোরাকও অপরিহার্য। দেহের পুষ্টি জোগাতে যেমন লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য লাগে তেমনি মনে স্বাস্থ্য বাঁচাতে লাগে লক্ষ লক্ষ বই, লাইব্রেরী, পত্র- পত্রিকা ও জ্ঞানবান ব্যক্তি। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে এজন্যই নামায রোযার আগে ফরয করা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ছিল দুটিরই দারুন অভাব। নিছক ভাতে- মাছে ঈমান বাঁচে না, তেমনি পুষ্টি পায় না প্যান- ইসলামিক চেতনা। অথচ এটিই ছিল পাকিস্তানের লাইফ লাইন বা প্রাণ। ফলে

অতি দ্রুত তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। পানাহারের ন্যায় মুসলমানের মানসিক পুষ্টির খোরাকও অমুসলিম থেকে ভিন্নতর। এজন্যই সেকুলার সাহিত্যে মুসলমানের ঈমান পুষ্টি পায় না। বাংলার মুসলিম মানস তাই পুষ্টি পায়নি বেদ, উপনিষদ, ভগবতগীতা ভিত্তিক রবীন্দ্র, বঙ্কিম ও অন্যান্য হিন্দু সাহিত্য থেকে। বরং এ হিন্দু সাহিত্য মুসলমানের ঈমানের ভীতই ধ্বসিয়ে দিয়েছে। তাই সহজেই মারা পড়েছে প্যান- ইসলামিজম। রাষ্ট্রভাষার কাজ শুধু এই নয় যে, চিঠিপত্র, কথাবার্তা, সাইনবোর্ড বা দলিল লেখার কাজে সেটি ব্যবহৃত হবে। বরং মানসিক পুষ্টি জোগানোর ন্যায় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকেও সে ভাষায় রচিত সাহিত্যকে জোগাতে হয়। মোকসেদুল মোমেনিন, নেয়ামূল কোরআন, বেহশতি জেওর, বিষাদ সিন্ধূ বা কিছু পুঁথি সাহিত্য দিয়ে সে পুষ্টি মেলে না। আর ভাষার ঐশ্বর্য বাড়তে লাগে শত শত বছর। নিছক তরজমা দিয়ে সে কাজ চলে না। ২৩ বছরের পাকিস্তানী আমলে যে প্রচেষ্ঠা হয়েছে তা দিয়ে বাংলা ভাষার দৈন্যতা পূরণ সম্ভব হয়নি। ভাষার জীবনে এ সময়টি অতি ক্ষুদ্র সময়। কিন্তু মানুষ তো খাদ্যের অপেক্ষায় বসে থাকে না। সুখাদ্য না পেলে তখন সে অখাদ্য ও দুষিত খাদ্যের দিকে ঝুঁকে। গ্রামে গঞ্জে স্কুল- কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বিপুলভাবে বাড়ছিল নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়। তখন পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুধার্ত নতুন প্রজন্ম ছুটেছে হিন্দু, সেকুলার ও মার্কসীয় সাহিত্যের দিকে। তখন সীমান্ত দিয়ে বাধভাঙ্গা প্লাবনের পানির ন্যায় এগুলি ঢুকছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ফলে চেতনায় বেড়ে উঠে ভয়ানক অসুস্থ্যতা। এতে মহামারি লাগে মুসলিম যুবকদের ঈমানী চেতনায়। সেকুলারিজম, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া তখন যুবকদের জন্য ফ্যাশানে পরিণত হয়। আর ইসলামের পক্ষ নেওয়া পরিণত হয় কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়ীকতা রূপে। বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনে ভয়ংকর আত্মঘাতের শুরু মূলতঃ তখন থেকেই। যে কোন জাতির জন্য এ এক হৃদয়বিদারক অবস্থা। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আর কোন ভাষাভাষীর জীবনে নানা মতবাদের বানে ভাসা এমন দুরাবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এমন একটা অবস্থা এড়াতে পাঞ্জাবী, সিন্ধি,বেলুচ ও পাঠানসহ উপমহাদেশের অন্য ভাষাভাষি মুসলমানেরা সমৃদ্ধ উর্দুভাষার সাহায্য নিয়েছে। তাদের দুরদৃষ্টি এখানে প্রচন্ড কাজ দিয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের ভিত্তিহীন অহংকার সে কাজেও প্রচন্ড বাধা দিয়েছে।

উর্দু ভাষার সৌভাগ্য হলো, সে ভাষায় বিস্তর ইসলামি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল বিগত কয়েক শত বছর ধরে। আরব ও ইরানীদের দূর্দিনে এক সময় জ্ঞানচর্চা ভারতে উঠে এসেছিল। সে সময় সমৃদ্ধি এসেছিল উর্দু সাহিত্যে। সে সমৃদ্ধি এসেছিল উপমহাদেশের নানা ভাষাভাষী মুসলমানদের সম্মিলিত উদ্যোগে। তাই সমৃদ্ধিতে এ ভাষাটি আরবী ও ফারসীর সমকক্ষ। এ ভাষাটি পেয়েছে বেশ কিছু উচ্চ শিক্ষিত বিশ্বমানের দার্শনিক কবি, লেখক ও সাহিত্যিক। আল্লামা ইকবাল, হালী, গালিব, শিবলী নোমানী তাদেরই কয়েকজন। বাংলা সাহিত্যে সে মাপের একজনও ছিল না। তারা শুধু লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মনের ভুগোলই পাল্টে দেননি, পাল্টে দিয়েছেন ভারতের বিশাল রাজনৈতিক ভূগোলও। এসব প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই নিজেদের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন উর্দূকে। উর্দু এভাবেই পরিণত হয়েছিল উপমহাদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের সাধারণ ভাষায়। এমন একটি শক্তিশালী উর্দূ সাহিত্যের কারণেই পাকিস্তান সুসংহত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সে অঞ্চলের মুসলিম যুবকদের তাই মনের ক্ষুধা মেটাতে আবর্জনায় হাত দিতে হয়নি। কিন্ত ঢাকাকেন্দ্রীক বুদ্ধিবৃত্তির মূল খেলোয়াড় ছিল রাশিয়া, চীন ও ভারত থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত বামপন্থি ও সেকুলার বুদ্ধিজীবীগণ। তাদের অধিকাংশ ছিল হয় নাস্তিক সমাজতান্ত্রিক অথবা ধর্মে অঙ্গীকারশূণ্য নাম সর্বস্ব মুসলমান। অনেকেই ছিল হিন্দু। সে আমলে এরা ছিল মার্কসবাদ, লেলিনবাদ, মাওবাদসহ নানা আবর্জনার ফেরিওয়ালা। এদের দখলে চলে যায় দেশের মিডিয়া, শিক্ষা- সাহিত্য ও রাজনীতি। ফলে ভিতরে বসে এরা প্যান- ইসলামের শিকড় কাটতে থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয় ভাষাভিত্তিক সেকুলার সাহিত্যের জোয়ার। সে জোয়ার বহুলাংশেই ভাসিয়ে নেয় ১৯৪৭- পূর্ববর্তী প্যান- ইসলামী চেতনা। ফলে দ্রুত দূষণ ঘটতে থাকে মুসলিম চেতনায়। ফলে যারা ১৯৪৬ ও ৪৭- এ “লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” ধ্বণিতে কোলকাতাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের রাজপথে যুদ্ধে নেমেছিল তাদেরই বিরাট অংশ পাকিস্তানের বিনাশে নামে। এমনকি ভারতের সাথে সূর মিলিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টিকে এক অনাসৃষ্টি এবং উপমহাদেশের জন্য অশান্তির মূল কারণ রূপে অভিহিত করতে থাকে। ভুলে যায় পাকিস্তানের সৃষ্টির ফলে তাদের নিজেদের এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের যে অসাধারণ কল্যাণ হয়েছে সে সত্যটিও।

ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার চেয়ে কম মুসলমানের বাস বাংলাদেশে। অথচ মুসলমানের যে সম্পদ একমাত্র ঢাকা শহরে জমা হয়েছে তা সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের নাই। যত জন মুসলমান ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক বা ব্যবসায়ী ঢাকা শহরে বাস করে তা নেই তাদের। পশ্চিম পাকিস্তানে যা অর্জিত হয়েছে সে হিসাব তো বাদই রইলো। অথচ পাকিস্তান আজ আণবিক অস্ত্রধারী দেশ। পাকিস্তান সৃষ্টির এ সুফলগুলোকে কি অস্বীকার করা যায়? সমাজতন্ত্র আজ মৃত। স্থান নিয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। কিন্তু মরণের পূর্বে এ মতবাদের অনুসারিরা সর্বনাশা প্রভাব ফেলে গেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ভূগোলে। এদের কারণে সামরিক যুদ্ধে পরাজয়ের আগেই পাকিস্তান পরাজিত হয়েছিল সংস্কৃতি, রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে। ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে আজও যে নির্মূলের হুংকার,সে প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছিল সে আমলেই। আজও স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে যে বিবাদ তার স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক মূলতঃ তারাই। কোলকাতা কেন্দ্রীক যে বুদ্ধিজীবীদেরকে নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বহুকাল আগেই আত্মঘাতি বলে আখ্যায়ীত করেছিলেন।- (সুত্রঃ তাঁর রচিত বই- আত্মঘাতি বাঙ্গালী)। নীরদ বাবুর অভিযোগ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় (হিন্দুদের) যে রেঁনেসাঁ শুরু হয়েছিল সেটি হত্যা করেছিল কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা। অবশেষে তাদেরই অনুসারিদের দখলে চলে যায় ঢাকার বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গন। ফলে বাংলার মুসলমানদের যে জাগরণ শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে,সেটিও আত্মহননের শিকার হয় এ আত্মঘাতি বুদ্ধিজীবীদের হাতে। ফলে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা দিয়ে তারা যে কাজের শুরু করেছিলের সেটি এ বুদ্ধিজীবীদের কারণে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। মুসলিম লীগ পত্রিকা বের করেছে, কিন্তু সেগুলি পরিকল্পিত ভাবে দখলে নিয়েছে বামপন্থিরা। তারাই আজ আরেক আত্মহনের দিকে ধাবিত করতে চায় বাংলাদেশকে। একাত্তরের হাতিয়ারকে আবার গর্জে উঠার যে বার বার আহবান জানাচ্ছে সেটি তো এমনি এক আত্মঘাতি লক্ষ্যে। ৭১এ তারা বিনাশ করেছিল পাকিস্তানের, এবার বিনাশ করতে চায় বাংলাদেশকে। ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ লড়াইটি তারা এভাবেই শেষ করতে চায়। এবং সেটি হলে একটি গৃহযুদ্ধই অনিবার্য হয়ে উঠবে। তেমন একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হলে সেটি যে একাত্তরের ন্যায় নয় মাসে শেষ হবে না সেটি

সুনিশ্চিত। চলবে বহু কাল ব্যাপী। যেমনটি আলজেরিয়ায় ও আফগানিস্তানে চলছে।

কথা হলো, একটি গৃহযুদ্ধ যে কত ভয়াবহ সে খবর কি তাদের আছে? যুদ্ধবিগ্রহ যে কতটা ভয়ানব সে খবর নাই বলেই একাত্তরের যুদ্ধকে তারা অনিবার্য করে তুলেছিল। এখন আবার এক প্রকান্ড রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে দেশকে ধাবিত করতে চায়। অবিরাম গৃহযুদ্ধে আলজেরিয়ায় দেড় লাখেরও বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। দেশছাড়া হয়েছে বহু লক্ষ। অথচ এখনও সেটি থামছে না। বাংলাদেশে কি তারা সেটিই চায়? তবে বাংলাদেশের বিপদের আশংকা শুধু এ বিভ্রান্ত সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নয়। বিপদের আরো কারণ, ইসলামের লেবাসে যারা রাজনীতিতে নেমেছে তাদের নিয়ে। তার এখন আদর্শিক আত্মসমর্পনের পথে।বলছেন, তারা এবং তাদের কেউ বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধী ছিল না।অথচ সত্য হল,এদেরই অনেকে একাত্তরে অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে লড়েছেন,তাদের পরিবার বা দলের বহু হাজার মানুষ মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহতও হয়েছেন। অথচ সে ভূমিকাকে তারা আজ অস্বীকার করছেন। তাদের উচিত ছিল,পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার দার্শনিক বা তত্ত্বগত বিষয়টিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। পুরোন অতীত নিয়ে এমন একটি তত্ত্বগত বা একাডেমিক আলোচনা বাংলাদেশের আইন বা শাসতন্ত্রের বিরোধীও নয়। এতটুকু সাহস না থাকলে তারা রাজনীতি করবেন কোন সাহস নিয়ে? তাদের বোঝা উচিত,ভেড়া জন্মায় ও বেড়ে উঠে কসাইয়ের ছুরির নীচে যাওয়ার জন্য। তেমনি ভীরুও বেড়ে উঠে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য। ইতিহাসে ভীরুদের জন্য কোন স্থান নেই। তাছাড়া তারা মুখ না খুললেই শত্রুপক্ষের বিরোধীতা দূর হবে, সেটিও ঠিক নয়।

ইসলামবিরোধীদের সাথে ইসলামী পক্ষের শত্রুতা চিরকালের। আলজেরিয়ার মোজাহিদগণ সে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেকুলারদের চেয়ে অধিক রক্ত দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতালাভের সাথে সাথে সেকুলাররা তাদের রাজনীতিকেই নিষিদ্ধ করেছে। একই অবস্থা ঘটেছে তুরস্ক, তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়াসহ আরো অনেক দেশে। ফলে সেকুলারদের কাছে ইসলামি চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির গ্রহনযোগ্য হওয়ার কোন পথ নেই। রাস্তা মাত্র দুইটি। হয় ঈমান- আক্বিদা দূরে ছূঁড়ে ফেলে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অথবা সাহসিকতার সাথে ঈমান যে আছে সে সাক্ষ্য দেওয়া। আল্লাহতায়ালা তো তার

বান্দাহ থেকে সে সাহসিকতাপূর্ণ কোরবানিটুকুই দেখতে চান। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদের ন্যায় প্রবলতম শত্রুপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছিলেন,

"..আমরা তোমাদেরকে মানি না। সৃষ্টি হলো তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের শত্রুতা ও বিদ্বেষ।.. হে আমাদের প্রতিপালক! আমারা তো আপনার উপরই নির্ভর করছি।"- (সুরা মুমতাহিনা,আয়াত ৪)

সে আমলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর কোনরূপ সামরিক বা রাজনৈতিক বল ছিল না। ছিল ঈমানের বল। তিনি নির্ভর করেছিলেন মহান আল্লাহর উপর। বিপক্ষের মন জুগিয়ে কথা বলেননি,বরং সত্য কথাগুলো বলেছেন অকুতোভয়ে। চিরকালের শত্রুতার কথা ঘোষণা করেছেন শত্রুপক্ষের মুখের সামনে। তাঁর সে সাহসী ভূমিকায় আল্লাহতয়ালা এতই খুশি হয়েছিলেন যে পবিত্র কোরআনে তার সে সংলাপকে চিরকালের জন্য সংকলিত করে রেখেছেন, যাতে ইতিহাসের এ মহান শিক্ষক থেকে মানব জাতি কিয়ামত অবধি শিক্ষা নিতে পারে। আল্লাহপাকের সাহায্য তো এভাবেই আসে। ইসলামের বিজয়ের এ ছাড়া ভিন্ন পথ নেই। সত্য গোপন করে বা শত্রুকে ভয় করলে কখনই আল্লাহর সাহায্য আসে না,আসে আযাব। ভয় করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহকে। অথচ সত্য গোপন করাই বাংলাদেশে রাজনীতির হিকমতে পরিণত হয়েছে। ভীরুরা পরিচয় পাচ্ছে বুদ্ধিমান রূপে। এটিই একটি জাতির বড় চরিত্রহীনতা। এমন জাতি দূর্নীতিতে বিশ্বে প্রথম হবে সেটিই কি নয়? সত্যপন্থিদের পরাজয় দোষের নয়,অপমানেরও নয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর মত নবীগণও দেশান্তরিতও হয়েছেন। ওহুদের ময়দানে নবীজী (সাঃ) নিজে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বিপদজনক হলো সত্য থেকে বিচ্যুতি।

একাত্তরে যে বিষয়টিকে সত্য জেনে বাংলাদেশের সকল ইসলামপন্থি দল ও ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের পক্ষ নিলেন এবং অনেকে প্রাণও দিলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সেগুলো মিথ্যা হয় কি করে? সে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাই বা তাদেরকে কি ভাববে? সে সত্যকে গোপন করা কি যথার্থ? বাহাদুরী তো দেশ গড়াতে বা দেশের ভূগোল বৃদ্ধিতে, ভাঙ্গাতে নয়। তাছাড়া

১২০০ মাইলের শত্রু ভূমি দ্বারা বিভক্ত পাকিস্তানের মত একটি দেশ ভাঙ্গা কি এতই কঠিন ছিল? তাছাড়া ঐতিহাসিক সত্য হল, কোন মুসলিম দেশ ভাঙ্গাতে মুসলমানের আদৌ মেহনতের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন নেই একটি তীর ছোঁড়ারও। মুসলিম রাষ্ট্র ভাঙ্গার সে কাজটি ইসলামের বিপক্ষ শক্তিবর্গ নিজ অর্থ, নিজ মেধা, নিজ শক্তি ও নিজ রক্ত ব্যয়ে করে। তারা রাজি মুসলিম দেশ ভাঙ্গার লক্ষ্যে প্রকান্ড যুদ্ধ লড়তেও। এরই প্রমাণ হল, অখন্ড আরব ভূখন্ড ভেঙ্গে বিশেরও বেশী রাষ্ট্রগড়ায় আরবদের রাজপথে সংগ্রাম করতে হয়নি। কোন যুদ্ধও লড়তে হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ নিজ খরচে সেটি করে দিয়েছে। কায়রোর এক চায়ের টেবিলে কলমের খোঁচায় চার্চিল জর্দান নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। (পিটার ম্যান্সফিল্ড, ১৯৮৫) তাদের ঘাড়ে দায়িত্ব দিয়েছে শুধু সে খন্ডিত মানচিত্রকে পাহারা দেওয়ার। যাতে আবার খন্ডিত টুকরোগুলো জোড়া লেগে বৃহৎ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম না হয়। সে পাহারাদারির কাজে কমতি হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ বার বার যুদ্ধ লড়তে রাজী। মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীর ঘাঁটি গেড়ে বসার মূল কারণতো এটি। কারণ এর মধ্যে রয়েছে ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং সে সাথে তেল সম্পদের অবাধ লুন্ঠনের বিষয়। তাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরবদের খন্ডিত মানচিত্রের সংরক্ষণ।

একই কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য শেখ মুজিবকে কোনরূপ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে হয়নি। কোন দলীয় সম্মেলন ডেকে প্রস্তাবনাও পাশ করতে হয়নি। মাঠে ময়দানে সে জন্য জনমত সংগ্রহেও নামতে হয়নি। ভারত নিজ অর্থ ও রক্ত- খরচে সেটি করে দিয়েছে। ফলে সেটি নয় মাসেই সম্ভব হয়েছে। অথচ ১৯৭১এর ৩রা ডিসেম্বরে পাকিস্তানের ভূমিতে ভারতীয় বাহিনীর সর্বাত্মক আগ্রাসনের পূর্বে মুক্তিবাহিনী সমগ্র বাংলাদেশ দূরে থাক,একটি জেলা শহর বা কোন থানা শহরকেও মুক্ত করতে পেরেছিল? বরং সেটি করে দিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। আওয়ামী লীগের নেতাগণ ভারতীয় আশ্রয় থেকে হেলিকপ্টার যোগে এসে মন্ত্রীত্বের আসনে বসেছেন। অথচ বহু বছর ধরে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য। অমুসলিম সরকার পাকিস্তাতনের প্রতিষ্ঠায় সমর্থণ দেয়নি, একটি তীরও ছুড়েনি। কোলকাতার মত বহু শহরে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ একাকী যুদ্ধ লড়তে হয়েছে মুসলমানদের। মুসলিম লীগের বহু লক্ষ কর্মীকে গ্রামে- গঞ্জে ঘুরে ঘুরে

মানুষকে পাকিস্তানের অপরিহার্যতা বোঝাতে হয়েছে। বহু প্রচারপত্র ও বহু বই লিখতে হয়েছে। বিষয়টিকে নির্বাচনী ইস্যু বানিয়ে এ জন্য ভোটযুদ্ধে নামতে হয়েছে। এবং সে যুদ্ধে জিততেও হয়েছে। অথচ নয় মাস পূর্বে অনুষ্ঠিত ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শত শত মিটিং মিছিল করেছে, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের কথা মুখে আনেনি। এ ইস্যুতে কোন নির্বাচনী যুদ্ধ লড়েনি। পাকিস্তান আন্দোলনের ন্যায় তাদের কোন গণসংযোগ আন্দোলনও করতে হয়নি। এমনকি ২৫শে মার্চেও সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়নি। অথচ পাকিস্তান থেকে ফিরে ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানের জনসভায় শেখ মুজিব জোর গলায় বললেন,

"স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু একাত্তর থেকে নয়, শুরু করেছিলাম সাতচল্লিশ থেকে।"

অর্থাৎ পাকিস্তান ভাঙ্গার আসল উদ্দেশ্যটি সযত্নে গোপন রেখে তিনি রাজনীতি করেছেন। অর্থাৎ রাজনীতি করেছেন মুখোশ পড়ে। মুখে এক কথা আর মনে ছিল আরেক কথা। মুখোশ পড়ে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন,কোরআনের কসম খেয়ে পাকিস্তান রক্ষার শপথ নিয়েছেন,পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছেন এবং পাকিস্তানের ঝান্ডা উড়িয়ে সরকারি গাড়িতেও চড়েছেন। এসবই ছিল সাধারণ মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তার বিরুদ্ধে ভারতের সাথে পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু আদালতে তিনি সেটি অস্বীকার করেছিলেন। সে মামলাকে মিথ্যা বলে কারামুক্তির দাবীও তুলেছিলেন। পাকিস্তানের বিখ্যাত আইনবিদ এবং সাবেক আইন মন্ত্রী জনাব এ, কে, ব্রোহীকে উকিল হিসেবে লাগিয়েছিলেন আগরতলা মামলা যে মিথ্যা সেটি প্রমাণ করার জন্য। ফলে প্রশ্ন উঠে,একাত্তরের যুদ্ধের জন্য কে দায়ী? বিপুল প্রাণনাশ ও সম্পদহানীর জন্যই বা কে দায়ী? সর্বসাধারণকে তিনি তার মনের গোপন কথাটি কেন নির্বাচনকালে বললেন না? গণতান্ত্রিক রাজনীতির এটিই কি মূলনীতি নয়? সেটি বললে হয়তো তিনি নিজে জেলে যেতেন, কিন্তু দেশবাসী তো বাঁচতো ভয়ানক যুদ্ধ থেকে।

যুদ্ধ সবসময়ই আত্মঘাতি, যুদ্ধে নামলে নিজ পিতা বা ভাইকেও কেউ ছাড়ে না। ইতিহাসের বহু যুদ্ধে বহু পিতা ও বহু ভাই নিহত হয়েছেন আপন

পুত্র ও আপন ভাইয়ের হাতে। সাহাবাদের হাতে সাহাবা নিহত হয়েছেন। ১৯৪৭ থেকে শেখ মুজিব কি সংগোপনে ভারতীয়দের সাথে নিয়ে এমন একটি ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যা তিনি ১৯৭২এর জানুয়ারিতে এসে বললেন? তিনি কি জানতেন না,পাকিস্তান ভাঙ্গার এমন চেষ্টা হলে যুদ্ধ অনিবার্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ্য হলে সে ইস্যুতে ১৯৭০এর নির্বাচন-জয় জরুরী ছিল। পাকিস্তানের জনগণ ও সেনাবাহিনী তখন সেটিকে গণরায় রূপে বুঝতে পারতো। জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে নির্বাচনে রায় দিলে তখন সবাই সেটি মেনে নিত। ফলে সৃষ্টি হতো না একাত্তর- পরবর্তী স্বাধীনতার পক্ষ- বিপক্ষের বিবাদ। যেমনটি হয়নি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে। দেশ বেঁচে যেত ভয়াবহ রক্তক্ষয় থেকে। পাকিস্তান বাঁচানোর ওয়াদা দিয়ে নির্বাচন জিতে ভারতীয় অস্ত্র হাতে যুদ্ধ শুরু করলে অনেকেই যে সেটিকে গাদ্দারি বলবে তা নিয়ে কি কোন সন্দেহ ছিল? পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দেশভাঙ্গার এমন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করবে সেটি কি শেখ মুজিবের অজানা ছিল? তিনি কি জানতেন না যে পাকিস্তান ভাঙ্গার এমন মুহূর্তে সেদেশের সেনাবাহিনী নিশ্চয়ই ডুগডুগি বাজাবে না? যে কোন মুসলিম সৈনিক দেশের এমন ক্রান্তিলগ্নে যুদ্ধের জন্য কোরআন হাতে নিয়ে শপথ নেয়। নিজ দেশের ঐক্য ও অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার এমন মুহূর্তে যে কোন নীরবতা বা পিছুটান দেওয়াকে দেশপ্রেমিক সৈনিক মাত্রই গাদ্দারি ভাবে। শেখ মুজিব না হয় সে কসমের কথা বেমালুম ভূলে যেতে পারেন,কিন্তু সবাই কি তা পারেন? একটি দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে অবস্থা যে কতটা রক্তাক্ষয়ী হতে সে হুশ কি মুজিবের ছিল? এমন কি নিরোদ চন্দ্র চৌধুরির মত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীও এমন উদ্দ্যোগ যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে সে হুশিয়ারি বার বার দিয়েছিলেন। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড পত্রিকায় তার সে নিবন্ধগুলো সে সময় ছাপাও হয়েছে। নিরোদ চৌধূরীর অভিযোগ ছিল, আওয়ামী লীগের নেতাদের ইতিহাস জ্ঞান নেই। সামরিক অভিযান কাকে বলে এবং সেটি কত ভয়ানক সেটি উত্তর- ভারতীয়রা বার বার দেখেছে। কারণ সেপাহী বিদ্রোহসহ বৃটিশ বিরোধী নানা বিদ্রোহ সেখানে হয়েছে। বৃটিশ বাহিনীর পদভারে সেখানকার জনপদগুলি বার বার প্রকম্পিত হয়েছে। বহু হাজার মানুষকে বৃটিশ বাহিনী হত্যা করেছে। লাঠির মাথায় লাশ ঝুলিয়ে সেগুলিকে পঁচে পঁচে নিঃশেষ হতে দিয়েছে। অথচ সে যুদ্ধগুলো ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ন্যায্য স্বাধীনতা যুদ্ধ। অথচ বাংলাদেশে সে

রূপ অভিযান পূর্বে হয়নি। গ্রামে- গঞ্জে কোন কালে মিলিটারি ঢুকেনি। ফলে এসব নেতারা কখনও দেখেনি সামরিক অভিযান বলতে কি বুঝায়। না জানার কারণেই তারা একাত্তরে একটি সেনাবাহিনীকে গ্রামে- গঞ্জে ডেকে আনে।

একাত্তরে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতেছিল। কিন্তু সেটি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার পক্ষে গণরায় ছিল না। নির্বাচন হয়েছিল সংবিধানিক ইস্যু নিয়ে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান তৈরী করা, দেশ বিভাজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়। শেখ মুজিব যে লেগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কে দস্তখত করে ৭০- এর নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তার শর্ত্ব ছিল নির্বাচনের পর নির্বাচিত সদস্যদের প্রথম কাজ হবে দেশের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করা। শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর তারা পাবে শাসনক্ষমতা। কিন্তু শেখ মুজিব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নিজের স্বাক্ষরিত দলিলের সাথে। তার দলের নির্বাচনকে ঘোষণা করে বাঙালীর স্বাধীনতার পক্ষে রায় রূপে। অথচ তার দলের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে কোথাও স্বাধীনতার কথা তুলে ধরা হয় নি। জনগণকে সে বিষয়ে ওয়াদাও দেওয়া হয়নি। তাছাড়া কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সংখ্যালঘুদের থেকে আলাদা হয় না। আলাদা হয় হওয়ার দাবী তোলে তারা যারা সংখ্যালঘু। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হওয়াটি ছিল তাই ইতিহাসের রীতি বিরুদ্ধ। তাছাড়া নির্বাচনে বিজয়ই বড় কথা নয়। হিটলারের সৃষ্টি হয়েছিল নির্বাচনের মধ্য দিয়েই। নির্বাচনের উপর প্রভাব ফেলে বহু বিষয়। ফলে ফলাফল ভিন্নতর হয় প্রায় প্রতিবছর। আওয়ামী লীগ তাই ১৯৭০ জিতলেও এখন বার বার হারছে। তাই নির্বাচিতদের উপর দেশের ভূগোল পাল্টানোর দায়িত্ব দিলে তাতে সমূহ বিপদ আছে। এ বিষয়ে মুসলমানের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো কোরআনের নির্দেশ। পার্লামেন্টের শতকরা ১০০ ভাগ সদস্যও ভোট দিয়ে মদ্যপান, পতিতাবৃত্তি ও সূদের ন্যায় পাপকে হালাল করতে পারে না। তেমনি হালালরূপে ঘোষণা দিতে পারে না একটি মুসলিম দেশের বিভক্তিকেও।

একজন ভারতীয় হিন্দুর কাছে তার দেশের সংহতির সুরক্ষা যেখানে রাজনীতি, মুসলমানের কাছে সেটি ইবাদত। দেশের বিভক্তি ও বিচ্ছন্নতা সেখানে হারাম। ফলে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য হয়েও সে পারে না দেশকে বিক্রয় করে দিতে। জনগণ কোন নির্বাচিত দলকে বা সে দলের সদস্যকে এ

অধিকার দেয় না। আওয়ামী লীগকে দেয়নি একাত্তরেও। এমনকি আওয়ামী লীগ জনগণ থেকে সে লক্ষ্যে ভোটও চায়নি। মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সংসদের সিদ্ধান্তকে তাই কোরআন- হাদিস ও ইসলামি মূল্যবোধ সম্মত হওয়াটিও পূর্বশর্ত। নইলে মুসলমান সেটি মানবে কেন? সে জন্য তাদের পিছনে যুদ্ধই বা লড়বে কেন? বরং এমন আত্মঘাতি পদক্ষেপের জন্য নির্বাচিত সরকারের সাথেও মুসলমানের লড়াই যে অনিবার্য তা নিয়ে সন্দেহ আছে কি? মুসলিম দেশে অসংখ্য সূদী ব্যংক,অগণিত পতিতাপল্লী ও মদের দোকানের অর্থ এই নয় যে সেগুলি হালাল বা বৈধ। তেমনি মুসলিম বিশ্বের বহুধা বিভক্ত খন্ডিত মানচিত্র দেখে কি বলা যায় এটিও কল্যাণকর ও ইসলাম- সম্মত? বস্তুতঃ বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভারতের আগ্রহটিই ছিল মূল। শেখ মুজিব ব্যবহৃত হয়েছেন দাবার গুটি হিসাবে। প্রকৃত নেতারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জনগণকে সাথে নেয়, অথচ তিনি সাথে নিয়েছেন ভারতীয়দের। নিজের মনের কথাটি তাই তিনি জনগণকে না বলে বলেছিলেন দিল্লির নেতাদের। এবং সেটি সাতচল্লিশেই। বাংলাদেশীদের বলেছিলেন ১৯৭২এর ১০ই জানুয়ারিতে। তার লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের হাতে সোনার ফসল তুলে দেওয়া এবং দিয়েছিলেনও। এতে ভারতের লাভ হয়েছে নানা ভাবে।

এক. পাকিস্তান ভাঙ্গায় তাদের প্রধান শত্রুর শক্তিহানী হয়েছে।

দুই. হাতের মুঠোয় পেয়েছে বাংলাদেশের ন্যায় বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম একটি দেশের বাজার।

তিন. অনুগত রাজনৈতিক নেতা- কর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত করতে পেরেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি।

চার. বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের মধ্য দিয়ে দূর্বল করতে পেরেছে বিশ্বে ইসলামের পুনঃজাগরণ।

আর এগুলি কি ভারতের জন্য কম বিজয়? সিকিমের নেতারা একই খেলা খেলেছেন নিজ দেশের জনগণের সাথে। তারাও নিজেদের মনের গোপন কথাটি জনগণকে না বলে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু

নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদে বসে পুরা দেশকে তুলে দিয়েছেন ভারতের হাতে। আর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী সিকিম রাজার প্রাসাদ ঘিরে ফেলে। সে কাজের জন্য তারা পূর্ব থেকেই যেন প্রস্তুত ছিল। ভারতীয় অর্থে যে লক্ষ্যে তারা প্রতিপালিত হয়েছিলেন সেটিই তারা সেদিন ষোল আনায় ভারতের ঘরে তুলে দিয়েছিলেন। আর এসবই হলো প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভারতের বিশাল অংকের রাজনৈতিক পুঁজি বিনিয়োগের ফল। এবং সেটি আজও চলছে বাংলাদেশে।

ইতিহাসের সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা নিতান্তই বুদ্ধিহীনতা। কারণ, সত্য ধামাচাপা দেওয়ার বিষয় নয়। বরং শক্তি বাড়ে এর প্রচারে। এবং এ পথেই বাড়ে সত্যপন্থিদের ইজ্জত। সত্য গোপন করলে বরং শত্রুপক্ষ সে বিষয়ে রঙ- চঙ চড়িয়ে নানারূপ মিথ্যা বলে। বাংলাদেশে সেটিই হয়েছে। ইসলামপন্থিরা তাদের একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে মুখ বন্ধ রেখেছে। আর ঘাদানী বুদ্ধিজীবী ও বাকশালী রাজনীতিবিদেরা তাদেরকে নারী ধর্ষণকারি এবং পাক- সেনাদের নারী সরবরাহকারিরূপে চিত্রিত করছে। এভাবে দুষিত ও বিষাক্ত করেছে নতুন প্রজন্মের চেতনা। অপর দিকে ইসলামপন্থি বহু নেতা- কর্মীর ধারণা, নির্বাচনে তাদের বার বার পরাজয়ের কারণ, একাত্তরে তাদের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকা। ফলে তাদের বিশ্বাস, সে ভূমিকার কথা না বলাই ভাল। অথচ ধারণাটি অসত্য। বরং ভারত থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মোহাজির অধ্যুষিত সীমান্তের জেলাগুলিতে ঘটছে এর উল্টোটি। তাছাড়া দেশের ইসলামে অঙ্গিকারপূর্ণ জনগণের কাছে এটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হতে পারতো। কারণ যে প্যান- ইসলামিক চেতনা সাতচল্লিশে বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক বিজয় এনেছিল সে চেতনা এত সহজে হাওয়া হয়ে যাওয়ার নয়। দেশে কোরআন চর্চা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কারণে বরং সে চেতনা আবার বেগবান হচ্ছে। কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লাহর পরিনতি থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। শেখ আব্দুল্লাহ ছিলেন শেখ মুজিবের মতই সেকুলার, বিশ্বাস করতেন না দ্বিজাতি তত্ত্বে। ১৯৪৭য়ে পাকিস্তানে কাশ্মিরে যোগ দেওয়ার সুযোগও ছিল। কারণ কাশ্মিরের শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসি মুসলমান। কিন্তু শেখ আব্দুল্লাহর বন্ধুত্ব ছিল কংগ্রেস ও তার নেতা নেহেরুর সাথে। ১৯৪৭য়ে কাশ্মিরের হিন্দু রাজা কাশ্মিরের ভারতে যোগ দেওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়,শেখ আব্দুল্লাহ ও তার দল ন্যাশনাল কনফারেন্স সে সিদ্ধান্তকেই

সমর্থণ করেন। বিণিময়ে তিনি কাশ্মিরের মুখ্যমন্ত্রী হন। সে সময় কাশ্মিরের জনপ্রিয় নেতা চৌধুরি গোলাম আব্বাসকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারণ তিনি ও তাঁর দল মুসলিম কনফারেন্স কাশ্মিরের পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার পক্ষ নেয়। শেখ আব্দুল্লাহ সে সময় কাশ্মিরে জনপ্রিয় ছিলেন। তাকে শেরে কাশ্মিরও বলা হত। কিন্তু এখন তাঁর কবরকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে পাহারা দিতে না। এ ভয়ে, না জানি কররের অসম্মান না হয়। এখন তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন হয় কুশপুত্তলিকা পুড়ানোর মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলির নির্বাচনী পরাজয়ের কারণ, তাদের নানাবিধ পেশাগত, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক অযোগ্যতা। তারা যদি একাত্তরে আওয়ামী লীগের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজেও নামতো তবুও এ ধরণের অযোগ্যতা নিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া অসম্ভব ছিল। ইসলামপন্থিরা পাকিস্তানেও জিতছে না একই কারণে । লক্ষ্যণীয়, বাংলাদেশের ইসলামপন্থি দল ও বুদ্ধিজীবীগণ এখনও পরিস্কার করে বলেনি, কেন তারা ৭১- এ অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষ নিল। কোন কোন দল তো ৭১- য়ে তারা যে বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিল সেটিও অস্বীকার করতে চায়। শুধু তাই নয়, ইসলামপন্থি দলের কোন কোন নেতা ও কর্মী একাত্তরে পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে মাফ চাওয়ার পক্ষে। বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের এটি এক বড় রকমের আদর্শিক পরাজয়। আর এর কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে তাদের নিদারুন স্থবিরতা। অনেকের চেতনা রাজ্য প্লাবিত হয়েছে সেকুলার দর্শনে। ফলে তারা জায়েজ বলছে জাতীয়তাবাদকেও। প্যান- ইসলামিক চেতনার কথা শুনলে এদের অনেকে বরং বিস্মিত হয়। অথচ একাত্তরের ভূমিকা নিয়ে সঠিক অবস্থানটি তুলে ধরলে তারা দেশজুড়ে অন্ততঃ একটা আদর্শিক পরিচয় পেত। তাছাড়া একাত্তরে পাকিস্তানে অখন্ডতায় সমর্থন দেওয়াটি বাংলাদেশের আইনে কোন অপরাধও নয়। কারণ সে সময় পাকিস্তানের নাগরিকরূপে সে দেশের অখন্ডতায় সমর্থন দেওয়া বা তার পক্ষে কাজ করা বিশ্বের কোন আইনেই দোষনীয় ছিল না। একই কারণে ১৯৪৭এর পূর্ব পর্যন্ত যে সব কংগ্রেসকর্মী অখন্ড ভারতের পক্ষে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল তাদের কোন নেতা বা কর্মীকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। একদিনের জন্যও কাউকে কারারুদ্ধ করা হয়নি। কংগ্রেসকর্মীদের নির্মূলে নির্মূলকমিটিও গড়া হয়নি। বরং কংগ্রেসী নেতারা স্বাধীন পাকিস্তানে পূর্ণ

স্বাধীনতার সাথে রাজনীতির অধিকার পেয়েছেন,সংসদের সদস্য হয়েছেন এবং অনেকে মন্ত্রীও হয়েছেন। অথচ আওয়ামী লীগের আজও অবিরাম আব্দার, পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার কারণে ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং নির্মূল করতে হবে তাদের নেতাদের। একাত্তরে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ তাই সকল ইসলামী দলকে নিষিদ্ধ করেছিল। কারারুদ্ধ করেছিল তাদের নেতাদের। এমনকি অনেকের নাগরিকত্বও কেড়ে নিয়েছিল। জন্মগত নাগরিক অধিকার দিতেও তার রাজি ছিল না। তারা যে কতটা দানবীয় ও বর্বর, এ হল তার প্রমাণ।

অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হয়েছে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ায়। আওয়ামী লীগের ৪ বছর ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছিল তা ইতিহাসের অন্য সময়ে কয়েক যুগেও হয়নি। সীমান্ত খুলে দিয়ে তারাই দেশটিকে ভারতীয় বাজারে পরিণত করে। ধ্বসিয়ে দেয় দেশের শিল্প ও অর্থনীতিকে। কারেন্সী নোট ছাপতে দিয়ে ভারতকে সুযোগ করে দেয় কয়েক গুণ অধিক নোট ছেপে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুন্ঠনের। অথচ একাত্তরে পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষ নিয়েছেন এমন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রি বা প্রেসিডেন্ট হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি,স্বার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতা বিপদে পড়েনি। এর প্রমাণ শাহ আজিজুর রহমান এবং আব্দুর রহমান বিশ্বাস। শাহ আজিজুর রহমান একাত্তরে পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে জাতিসংঘে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সংসদ নির্বাচনে তিনি নিজ জেলা কুষ্টিয়া থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা নিয়েছিলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস। সে অপরাধে শেখ মুজিব তাকে কারারুদ্ধও করেছিলেন। অথচ তিনি বার বার নির্বাচিত হয়েছেন বরিশাল থেকে। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। কিন্তু তাতে সামান্যতম ক্ষতি হয়েছে কি বাংলাদেশের? বৃহত্তর খুলনার তিন- তিনটি আসনে এক যোগে নির্বাচিত হয়েছেন মুসলিম লীগ নেতা আব্দুস সবুর খান। এভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মত আরো অনেকে। স্বাধীনতার একমাত্র ইজারাদার ভাবেন এমন আওয়ামী প্রার্থীগণ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছেন তাদের কাছে। আওয়ামী লীগ যতই স্বাধীনতার শত্রু বলে চিহ্নিত করুক না কেন জনগণ তাদেরকে মিত্র ভেবেছে। ফলে বিপুল ভোটে নির্বাচিতও করেছে।

তারা বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন যেমন একাত্তর- পূর্বে, তেমনি একাত্তর- পরবর্তীতেও। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুরক্ষায় প্রশাসনে অংশ নিতে তাদের কোন রূপ অসুবিধা হয়নি।

আত্মসমর্পণে আত্মসন্মান বাড়ে না। বাড়ে আত্মভ্রষ্টতা। বাড়ে অপমান। এবং সে আত্মসমর্পণ কাদের কাছে? সমাজের শিকড়হীন ভারতনির্ভর কিছু আত্মবিক্রীত ঘাদানী বুদ্ধিজীবী ও বাকশালী রাজনৈতিক নেতাদের কাছে? এরা নিজেরাই তো রাজনীতির পরাজিত শক্তি। ভীরুতায় ব্যক্তি ও দেশের কোন কল্যাণ নেই। যে সাহস নিয়ে দেশের ধর্মশূণ্য স্যেকুলার পক্ষ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে সেরূপ সাহস নিয়ে ইসলামের পক্ষশক্তি যদি ময়দানে নামতো তবে স্বাধীনতার পক্ষ- বিপক্ষের এ বিতর্ক বহু আগেই বিলুপ্ত হত। এখন জাগরণের সময়। মুসলমানগণ জাগছে বিশ্বের সর্বত্র। সেকুলারিজমের প্রতিষ্ঠা যে মুসলিম দেশটিতে সর্ব প্রথম ঘটেছিল সে তুরস্কের মাটিতেই সেটি এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। বহু দেশের বহু লক্ষ মুসলমান এখন ইসলামের বিজয়ে অকাতরে অর্থ ও রক্ত দিচ্ছে। লড়াই করছে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে। আমরা কি সাহসিকতার সাথে নিজেদের ইতিহাস নিয়ে সত্য কথাগুলোও বলবো না? অথচ সাহসিকতাই ইসলামের বড় শিক্ষা। হযরত মুসা (আঃ) ফিরাউনের রাজ প্রাসাদে সত্য কথাগুলো নির্ভয়ে বলেছিলেন। ইসলাম ভীরু ও কাপুরুষদের জন্য আসেনি। দেশের চলমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্রোতে ভেসে যাওয়া গোলামদের জন্যও আসেনি। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টিই মূল,বান্দাহর কাছে নয়। অথচ ভোটার বেজার হবে, এমপি বা মন্ত্রী হওয়া কঠিন হবে এ ভয়েই অনেক ইসলামি দলের নেতা সত্য কথা বলতে ভয় পায়। এটি কি ঈমানদারি? মন্ত্রীত্ব, সংসদ সদস্যপদ ও নানারূপ ইহজাগতিক কল্যাণ- চিন্তা যাদের রাজনীতির প্রধান বিষয় এ ভয় একমাত্র তাদের। এমন ইহজাগতিকতাই তো সেকুলারিজমের মূল কথা। অথচ অতিশয় পরিতাপের বিষয়, সেরূপ ইহজাগতিক লাভ লোকসানের চিন্তা ঢুকেছে বাংলাদেশের কোন কোন ইসলামি দলে। ফলে তারা কথা বলেন আখেরাত বা ইসলামের শ্বাস্বত শিক্ষার দিকে চেয়ে নয়, বরং নির্বাচনে ভোটপ্রাপ্তি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে হিসাবে রেখে। এভাবে সেকুলারিজম ঢুকছে ইসলামি দলে।

কথা হলো, এমন সেকুলারাইজড ইসলামি দলের ক্ষমতালাভে মুসলমানের কল্যাণ আছে কি? হিকমতের কথা বলে কি এমন ইহজাগতিক লাভ- লোকসানের রাজনীতিকে জায়েজ করা যায়? বাংলাদেশের মাটিতে সেকুলারিজমের হেলে পড়া দেয়ালে এখন শক্ত ধাক্কা দেওয়ার সময়। এতে গুড়িয়ে যাবে এর অস্তিত্ব। ইহজাগতিকতা বা সেকুলারিজমের মোহ থেকে মুক্তি দিতে না পারলে শুধু এ দুনিয়ায় নয়, পরকালের মুক্তিও অচিন্তনীয়। কারণ ইহজাগতিকতায় মৃত্যূ ঘটে আল্লাহ ও পরকালের ভয়। তখন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি ভাসে ব্যক্তিস্বার্থ, গোত্রীয় বা ভাষা ও বর্ণগত স্বার্থের ক্ষুদ্রতায়। তখন গুরুত্ব হারায় উম্মাহর কল্যাণ চিন্তা। নিজ স্বার্থে তখন অন্য ভাষা ও অন্য ভাষার মুসলমানদের হত্যা বা তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য দখলের ন্যায় জঘন্য পাপকর্মকেও উৎসবযোগ্য মনে হয়। ১৯৭১ এ বাংলাদেশে তেমন পাপকর্মই মহাধুমধামে হয়েছে। কয়েক লাখ অবাঙ্গালী পরিবারকে নর্দমার পাশে বস্তিতে পাঠিয়ে তাদের বাড়িগুলোকে দখল করা হয়েছে। সাতচল্লিশে কোন কংগ্রেসী পরিবারের বাড়ি এভাবে দখল করে তাদেরকে বস্তিতে পাঠানো হয়নি। আরো লক্ষণীয় হলো, বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্বরতার যে নব্য ইতিহাস রচিত হলো তারও কোন প্রতিবাদ উঠলো না দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহল থেকে। দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণ যে কতটা মানবতাশূণ্য ও হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য এটি হলো তারই জ্বলন্ত নজির। একাত্তর- পরবর্তী সরকারও যে কতটা দুর্বৃত্ত কবলিত ছিল সেটির প্রমাণ তারা রেখেছে সে জবর দখলকে বৈধতা দিয়ে। এভাবে ঘরে ঘরে পাপের বীজ বপন করা হয়েছিল পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে। সেদিন যে বীজ বপন করা হয়েছিল বস্তুতঃ সেটিই পরবর্তীতে দূর্নীতির মহীরুহে পরিণত হয়। দেশটিকে পৌঁছে দেয় দুর্নীতে বিশ্বের প্রথম স্থানে। রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতারা দলবেঁধে তখন দস্যুবৃত্তিতে নেমেছিল। কোন ব্যবসা- বাণিজ্য, চাষাবাদ বা চাকুরিবাকরি না করেও তারা বহু ঘরবাড়ির ও দোকানপাটের মালিক হয়েছেন। অবাঙ্গালী ও পাকিস্তানপন্থিদের লক্ষাধিক ঘরবাড়ি ও দোকানপাট তাদের দখলে গেছে। জবরদখলকারি প্রতিটি পরিবার পরিণত হয়েছে দূর্নীতির ইন্সটিটিউশনে। ফলে ঘরে ঘরে বসেছে পাপের পাঠশালা। অথচ সুনীতি ও সুশিক্ষার জন্য প্রথমে যেটি চাই সেটি হলো সুনীতিসম্পন্ন সুস্থ্য পরিবার। পরিবারই হলো শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে- তাবেয়ীনের ন্যায় মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা মানুষগুলো সৃষ্টি হয়েছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয় বরং সে আমলের মুসলিম পরিবারগুলি থেকে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাক, স্কুলই বা ছিল কয়টি? তখন ঘরে ঘরে বসেছিল বিদ্যালয়। ফলে কয়েক দশকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার। অথচ ভাল মানুষ গড়ার সেরূপ ইন্সটিটিউশন সন্ত্রাসী রাজনৈতিক নেতা, বাড়ী দখলকারি দুর্বৃত্ত ক্যাডার বা ঘুষখোর চাকুরিজীবির ঘরে গড়ে উঠে না। এমন ঘরে বেড়ে উঠে পাপাচারি দুর্বৃত্ত। এদের নামায- রোযা বা ইবাদত বন্দেগীর মূল্য আছে কি? ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত্ব হল হালাল বাসস্থান ও হালাল রেযেক। জবর দখল করা বাড়ীতে জায়নামায বিছিয়ে সারা রাত নামায পড়লেই কি সে নামায কবুল হয়? ডাকাতির অর্থে যেমন দানখয়রাত হয় না, তেমনি নামাযও হয় না অন্যায়ভাবে দখল করা বাড়ীতে। কিন্তু সেকুলারিজম বা ইহজাগতিকতায় অতি অপ্রাসঙ্গিক হলো নীতি নৈতিকতার এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামের এ সুনীতি তাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা। অপর দিকে সেকুলারিজম বা ইহজাগতিকতায় যেটি জন্ম নেয় সেটি হলো ভোগবাদী এক চরম উম্মাদনা। সে উম্মাদনায় ধর্মশূণ্য ব্যক্তি তখন অপরের পকেটে, সম্পদে বা ইজ্জতে হাত দেয়। নামে নারী অপহরণ ও ধর্ষণে। এমনকি প্রাণনাশও করে। এমন দূর্বৃত্তিতে সফল হওয়াকে সে জীবনের বড় অর্জন মনে করে। উৎসবযোগ্যও মনে করে। এরাই অফিস- আদালতে ভদ্রবেশী ডাকাত এবং রাস্তা বা মহল্লার সন্ত্রাসী ক্যাডার।

বাংলাদেশে আজ যারা সন্ত্রাস, নারি ধর্ষণ ও দূর্নীতিতে নেমেছে তারা কোন জংগলে বেড়ে উঠেনি, বরং পরিচর্যা ও প্রতিপালন পেয়েছে এরূপ পরিবারগুলিতে। কারণ যে পরিবার বেড়ে উঠেছে অন্যের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, চাকরি, ব্যবসা- বাণিজ্য জবরদখল করার মধ্য দিয়ে সেখানে সুনীতি, সুসংস্কৃতি ও সুচরিত্র পরিচার্য পায় কি? বাংলাদেশের সেকুলার পক্ষটি তাই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। ফলে জন্ম নিয়েছে দেশবিনাশী এক চরম অপশক্তিতে। অথচ এরাই নিজেদেরকে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি রূপে তুলে ধরছে। ঘোষণা দিচ্ছে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের যার মধ্য দিয়ে নির্মূল করতে চায় ইসলামি চেতনার লোকদের। এমন একটি যুদ্ধে তারা সুযোগ পাবে বিপক্ষ শক্তির গৃহ ও

ব্যবসা- বাণিজ্যে নতুন ভাবে হত্যাকান্ড ও লুটপাটের। একপাল ক্ষুধার্ত দুর্বৃত্ত এজন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে। তারা ভাবছে, এতে দেশের ভাগ্যে যাই হোক তাদের ভাগ্যে বিশাল পরিবর্তন ঘটবে। ফলে একাত্তরের পর যেভাবে অল্প সময়ে তারা দেশটিকে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছিল সে অবস্থায় আবার ফিরিয়ে নিতে চায়। এভাবে জন্ম দিতে চায় সন্ত্রাসের আরেক সয়লাবের। সন্ত্রাস ও সীমাহীন দূর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক মহলেই কি কম অপমান জুটেছে? আগুনে বাড়ি পুড়লে সে দূর্ঘটনাতে সবাই সমবেদনা জানায়। কিন্তু দূর্বৃত্ত রূপে পরিচয় পেলে কি ইজ্জত থাকে? জলচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়াতে বা দুর্ভিক্ষে লক্ষ মানুষের মৃত্যুতে বাংলাদেশের মানুষের তেমন অসম্মান ছিল না। কিন্তু বিশ্বজুড়ে অসম্মান বেড়েছে দূর্নীতিতে বিশ্বে বার বার প্রথম হওয়ায়। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে এসব ব্যর্থতার কোন বিবরণ নেই। যে ব্যক্তি আত্মহত্যার লক্ষ্যে বিষপানে উদ্দ্যত তার কাছে গুরুত্ব হারায় জীবনে ব্যর্থতার কারণ গুলো খুঁজে বের করার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। গুরুত্ব হারায় সে ব্যর্থতা থেকে মুক্তির চিন্তাও। তার ব্যস্ততা তখন আত্মবিনাশে। তেমনি অবস্থা একটি আত্মবিনাশী জাতিরও। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ করে একাত্তরের ইতিহাসে এজন্যই নিজেদের অতীত আত্মঘাতি কর্মকান্ডের বিবরণ নেই।

অধ্যায় ২০: আসল রূপে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ

শেখ মুজিবের আসল রূপ প্রকাশ পায় ১৯৭১- এর পর। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের ধুম্রজালে তিনি তার আসল চরিত্র বহুলাংশে লুকিয়ে রাখতে পারলেও সেটি বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় প্রকাশ পায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন। সে নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ মুজির ২৮শে অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টিভি ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি বহু অসত্য কথা বলেন। তার একটি নমুনা, "তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল (পাকিস্তান মুসলিম লীগ) সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সেই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করি।"-(২৯ অক্টোবর ১৯৭০, দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা) এ তথ্যটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য হল, পাকিস্তান মুসলিম লীগ কখনই দেশকে একদলীয় রাষ্ট্র করার চেষ্টা করেনি। তার প্রমাণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যখন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ থেকে এই নতুন দলটির প্রতিষ্ঠায় কোন রূপ বাধাই সৃষ্টি করা হয়নি।

পাকিস্তান কোন কালেই একদলীয় রাষ্ট্র ছিল না। সে দেশের কোন গণতান্ত্রিক সরকার দূরে থাক, এমন কি কোন সামরিক সরকারও এমন সিদ্ধান্ত নেয়নি। শুধু আওয়ামী লীগ কেন, আরো বহু দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই পাকিস্তানে কাজ করছিল। এমন কি যে কংগ্রেস পাকিস্তান সৃষ্টির প্রচন্ড বিরোধীতা করেছিল সে দলটিরও স্বাধীন ভাবে কাজ করার পূর্ণ অনুমতি ছিল। সংসদে এ দলটির সদস্যও ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশটির যে গণ- পরিষদ তথা পার্লামেন্ট গঠন করা হয় তার সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে। সে গণপরিষদ থেকে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের সদস্যপদও হরণ করা হয়নি। বহু দলীয় রাজনীতি চলেছে আইউব ও ইয়াহিয়া খানের আমলেও। খোদ আওয়ামী লীগও সে বহু দলীয় রাজনীতি থেকে পুরা ফায়দা নিয়েছে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে

যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেটি ছিল অতি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। মুসলিম লীগে সে নির্বাচনে প্রচন্ড ভাবে হেরে গিয়ে প্রমান করেছিল, তারা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার কোন চেষ্টা করেনি। সে ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ আওয়ামী লীগ তাদের শাসনামলে কোন কালেই দেয়নি। একদলীয় রাজনীতির শুরু পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার পর এবং সেটি বাংলাদেশে। সেটিও স্বয়ং শেখ মুজিবের হাতে। এবং সেটি বাকশাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ফলে প্রমাণ মেলে, শেখ মুজিব ১৯৭০- এর নির্বাচনের শুরুটিই করেছিলেন ঢাহা মিথ্যা কথা রটনার মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিব আবির্ভূত হন একজন স্বৈরাচারি ফ্যাসীবাদী নেতা রূপে। শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়,শুধু সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নেতা যিনি একদলীয় শাসনের ঘোষণা দেন। এমন স্বৈরাচারি পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানে যেমন কোন কালে হয়নি; ভারত, শ্রীলংকা ও নেপালেও হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপী দেশগুলি ও চীনের ন্যায় বাংলাদেশেও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারি একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিরেব হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেওয়ার স্বার্থেই ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুযারিতে শাসনতন্ত্রে আনা হয় সংশোধনী। মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে ২৯৪জন পার্লামেন্ট সদস্যের ভোটে “পার্লামেন্টারী কেবিনেট ফরম” রূপান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সিয়াল ফরমে । শেখ মুজিব হন ৫ বৎসরের জন্য- অর্থাৎ ১৯৮০ সাল অবধি- নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারি প্রেসিডেন্ট এবং সে সাথে একদলীয় রাজনীতির সর্বেসর্বা। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য শেখ মুজিব জনতার আদালতে তথা ভোটে যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেননি। প্রতিষ্ঠা করেন, দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল বাকশাল। তালা ঝুলিয়ে দেন অন্যান্য দলের দফতরগুলিতে। ফরমান জারি করেন, ১৯৭৫ সালের ২৫শে মে’র মধ্যে সকল সংসদ সদস্যকে বাকশালে যোগ দান করতে হবে নইলে বাতিল ঘোষিত হবে তাদের সংসদ সদস্যপদ। তার দলীয় সদস্যরা তাকে আজীবন প্রেসিডেন্ট করার পাকা বন্দোবস্তও করছিল। ১৯৭৫এর ১৫ আগষ্ট মারা না গিলে সে রেকর্ডও যে তিনি প্রতিষ্ঠা করতেন তা নিয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার দলীয় নেতা ও কর্মীরা মাঠে ময়দানে এক নেতা- একদেশেরর ধারণা জোরেশোরে প্রচার করছিল। যে দলের কর্মীরা শেখ মুজিবকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে

প্রবল বিশ্বাস রাখে তারা সে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীকে আজীবনের জন্য যে প্রেসিডেন্ট করতে চাইবে তাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে?

দেশে কি গণতন্ত্র চর্চা বাড়াবে, গণতন্ত্র মৃত্যুবরণ করেছিল দলটির নিজের মধ্যেই। আওয়ামী লীগের কোন নেতাই সেদিন শেখ মুজিবের একদলীয় স্বৈরাচারি রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। নেতা ও কর্মীগণ পরিণত হয়েছিল বিবেকহীন চাটুকারে। গণতন্ত্রের নামে একটি দল কি ভাবে একদলীয় ফ্যাসীবাদের দিকে ধাবিত হতে পারে তারই নমুনা পেশ করে আওয়ামী লীগ। মুজিব পরিণত হয় বাংলাদেশের হিটলারে। সেদিন একমাত্র জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন - এ দুই ব্যক্তি তার একদলীয় বাকশালী নীতির বিরোধীতা করে পদত্যাগ করেছিলেন। লক্ষণীয় হল, এ দু’জনের কেউই আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ছিলেন না। অথচ যারা ছিল আওয়ামী লীগের নিজ ঘরানার পুরনো নেতা ও কর্মী, গণতন্ত্র নিয়ে যাদের ছিল প্রচন্ড গলাবাজি - তারা সেদিন কোন রূপ নৈতিক মেরুদন্ডের প্রমাণ রাখতে পারেননি। সংসদের ২৯৪জন সদস্যের মাঝে দুইজন বাদে আর কোন ব্যক্তিই সেদিন প্রতিবাদ করেনি। মনের ক্ষোভে দল থেকে পদত্যাগও করিনি। অথচ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম অঙ্গিকার থাকলে কোন ব্যক্তি কি এমন একদলীয় শাসনকে সমর্থণ করতে পারে? কারণ এটি তো ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্রকে কবরে পাঠানোর মত অপরাধ। অথচ সেদিন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ও নেতা- কর্মীগণ স্বৈর- শাসনের শুধু সমর্থণই করেনি, সেটির পক্ষে প্রচন্ড ওকালতিও করেছে। সেটি নিয়ে সামান্যতম অনুশোচনা দূরে থাক, আওয়ামী লীগের নেতা- কর্মীদের আজও তা নিয়ে প্রচন্ড অহংকার। গণতান্ত্রিক চেতনা- বিবর্জিত মেরুদন্ডহীন কর্মী ও নেতা উৎপাদনে এ দলটি যে কতটা সফল কারখানায় পরিণত হয়েছিল, সেটির প্রমাণিত সেদিন হয়েছিল। এমন মেরুদন্ডহীন নেতা- কর্মীরাই সেদিন দলে দলে এবং উৎসব- ভরে আত্মসমর্পণ করেছিল শেখ মুজিবের একদলীয় স্বৈর- শাসনের কাছে। ছলে- বলে- কৌশলে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতায় থাকায় ছাড়া এ দলটির আর যে কোন মহত্তর লক্ষ নেই এবং স্বপ্নও নেই সেটি তারা সেদিন প্রমাণ করেছিল। গণতন্ত্রের বুলি পরিণত হয়েছিল ক্ষমতায় উঠার সিঁড়ি রূপে। নিজেরা ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথে সে সিঁড়িটাই দূঁরে ছুড়ে ফেলেছে। স্মরণযোগ্য, পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে

কোনদিন এমন ফ্যাসীবাদের প্রবর্তন ঘটেনি। এমনকি জেনারেল আইউব ও জেনারেল ইয়াহিয়ার ন্যায় জেনারেলগণও গণতন্ত্রের এতবড় শত্রুতে পরিণত হয়নি। তাদের আমলেও বহুদলীয় রাজনীতি ছিল, বহু বিরোধী দলীয় পত্রিকাও ছিল। অথচ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ৪ বছরের মধ্যেই বহুদলীয় রাজনীতির কবর রচিত হল এবং সেটি আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবের হাতে। দেশ পরিনত হয়েছিল পুলিশী রাষ্ট্রে। সেদিন নিষিদ্ধ হয়েছিল সকল বিরোধী পত্রিকা। প্রকাশনের অধিকার পেয়েছিল একমাত্র সে সব পত্রিকাই যে গুলি মুজিব- বন্দনাকে নিজেদের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানী শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবকে যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছিল সেটি শেখ মুজিব ও তার দল অতি নিষ্ঠুর ভাবে কেড়ে নিল বাংলাদেশীদের থেকে । একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বস্তুতঃ তিনি গণতন্ত্রকে সেদিন কবরস্থানে পাঠিয়েছিলেন। দেখা যাক, মুজিব সম্বন্ধে এ নিয়ে তার অতি কাছের লোকেরা কি বলেন।

"১১ই জানুয়ারি (১৯৭২) টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। রিসিভার তুলিয়া একটি পরিচিত কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত কন্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কন্ঠস্বরটি গণপ্রজাতন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের। কলেজ জীবন হইতে বন্ধূ; ..টেলিফোনে তাজউদ্দিন কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমাকে বলেন, "শেখ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি এবং প্রস্তাবও করিয়াছি। কারণ তিনি যে কোন পদেই বহাল থাকুন না কেন, তাঁহার ইচ্ছা- অনিচ্ছাতেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালিত হইবে। শেখ শাহেবের মানসিক গড়ন তুমিও জান; আমিও জানি। তিনি সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্থ। অতএব ক্ষণিকের ভূল সিদ্ধান্তের জন্য পার্লামেন্টারী কেবিনেট পদ্ধতির প্রশাসন প্রহসনে পরিণত হইবে। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকিলে নিয়মান্ত্রিক নাম- মাত্র দায়িত্ব পালন না করিয়া মনের অজান্তে কার্যতঃ ইহাকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রশাসনে পরিণত করিবেন। এই দিকে প্রেসিডেন্ট পদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নির্বাচনের কথা ভাবিতেছি। তোমার মত কি?" তদুত্তরে তাঁহাকে বলি, "তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। নামমাত্র প্রেসিডেন্টের ভূমিকা পালন শেখ সাহেবের শুধু চরিত্র বিরুদ্ধ হইবে না; বরং উহা হইবে অভিনয় বিশেষ। কেননা, ক্ষমতার লোভ তাঁহার সহজাত।" তাজউদ্দিন টেলিফোনের অপর

প্রান্তে সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি জানিতাম, মৌলিক প্রশ্নে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হইবে না।" -(অলি আহাদ)।

উল্লেখ্য, জনাব অলি আহাদ ছিলেন পঞ্চাশের দশকে পূর্ব- পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। সে সময় শেখ মুজিব ছিলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক।

নিরংকুশ ক্ষমতা দখলই ছিল শেখ মুজিবের প্রধান খায়েশ - তা নিয়ে এমন কি তাজউদ্দিন আহমদেরও কোন সন্দেহ ছিল না। ক্ষমতার নেশায় তিনি কখনও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, কখনও প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কখনও বা জরুরী আইন জারী করে জনগণের সকল নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন এবং সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। শেষের দিকে এসে সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করেন। হরণ করেন বাক স্বাধীনতা। একমাত্র সামরিক ক্ষমতা বলে অপসারণ ছাড়া রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আর কোন পথই তিনি খোলা রাখেননি। অবশেষে সে পথেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এই হল তার রাজনৈতিক জীবন। কথা হল, তাঁর এ ক্ষমতালোভী ও স্বৈরাচারি রাজনৈতিক জীবন কি কোন সভ্য দেশের ও সভ্য মানুষের জন্য মডেল হতে পারে? অথচ বাংলাদেশের আওয়ামী- বাকশালী মহল তার সে রাজনীতি নিয়েই গর্বিত। তাদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিব সর্ব কালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী। তার সে রাজনীতির মডেল তারা পুনরায় বাস্তবায়ন করতে চায়। তবে যুগে যুগে স্বৈরাচারি শাসকদের সমর্থক চাটুকার মোসাহেবদের আচরণ অবিকল এমনটিই ছিল। এজন্য সেসব স্বৈরাচারি শাসকদের অতি মানব বা মহামানব হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। যুগে যুগে দস্যু চরিত্রের বহু নৃশংস মানুষও এসব চাটুকরদের থেকে শ্রদ্ধা পেয়েছে, এমনকি পুজাও পেয়েছে। দুর্বৃত্ত ফিরাউনকে তো তার তাঁবেদার প্রজারা ভগবান মনে করতো। খোদার আসনে বসিয়ে তাকে শুধু আনুগত্য ও রাজস্বই দিত না, প্রাণও দিত। তারাই তার স্মৃতিকে স্মরণীয় করতে বছরের পর বছর ধরে বহু অর্থ ব্যয়ে ও বহু প্রাণের বিণিময়ে পিরামিড নির্মাণ করেছিল। আর এরাই হযরত মূসা (আঃ)কে মনে করতো দুর্বৃত্ত। হযরত মূসা (আঃ)র হত্যায় ফিরাউনের নেতৃত্বে তারা সাগর পর্যন্ত ধেয়ে গিয়েছিল। অবশেষে মহান আল্লাহপাক এ দুর্বৃত্ত ফিরাউন ও তার সাথীদের সমূদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করেছিলেন। হিটলারকেও তার ভক্তরা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জার্মান মনে করতে। তার হুকুমে তারা লাখে লাখে প্রাণ

দিয়েছে। মানুষ যখন আল্লাহতে অজ্ঞ ও ঈমানশূণ্য হয়, তখন তার আচরণ যে কতটা বিস্ময়কর ভাবে নীচে নামতে পারে সে উদাহরণ তো ইতিহাসে প্রচুর। মানুষ কেন, মানবেতর শাপ- শকুন- গরু- বাছুড়কেও এসব জাহেলেরা তখন দেবতার আসনে বসায়। শাপ- শকুন- গরু- বাছুড়ের তুলনায় ফিরাউন, হিটলারেরা তো অনেক শক্তিধর ছিল। তারা বড় বড় যুদ্ধ জয় করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যায় প্রচন্ড সামর্থ দেখিয়েছে এবং বড় বড় রাষ্ট্রও নির্মাণ করেছে। তাই যারা আজ শেখ মুজিবকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে, তাদের আচরণেও বিস্ময়ের কিছু আছে কি?

দেখা যাক, কীরূপ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে শেখ মুজিবের নিজের ধারণা। একাত্তরে ৯ মাস যুদ্ধচলা অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনের মুজিব নগর সরকার ছিল ভারতের আশ্রীত সরকার। এমন সরকারের কোন মেরুদন্ড থাকে না। জনাব তাজউদ্দিন ও তার মন্ত্রীদের প্রতিদিনের থাকা, খাওয়া- দাওয়া ও ভরন- পোষনের সমুদয় ব্যয় বহন করত দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী সরকার। খাঁচার পাখির নিজে শিকার ধরার সামর্থ থাকে না, মনিব যা দেয় তাই খেতে হয়। মনিব মন জোগাতে তখন তার শেখানো বুলিও তখন গাইতে হয়। তাজউদ্দিন সরকারের অবস্থাও তাই ছিল। ফলে তাকে দিয়ে ভারত সরকারও খুশী মত চুক্তিও সই করিয়ে নেয়। কোন স্বাধীন দেশ এমন চুক্তি কখনও স্বাক্ষর করে না। তাজউদ্দিনের স্বাক্ষরিত তাই ৭ দফা চুক্তিনামাটি হল নিম্নরূপঃ

১। ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হইবে। গুরুত্বের দিক হইতে এবং অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যায় এই বাহিনী বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী হইতে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ হইবে। (পরবর্তীকালে এই চুক্তির আলোকে রক্ষী বাহিনী গড়া হয়)।

২। ভারত হইতে সমরোপকরণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শানুযায়ী তাহা করিতে হইবে।

৩। ভারতীয় পরামর্শেই বাংলাদেশের বহিঃবাণিজ্য কর্মসূচী নির্ধারণ করিতে হইবে।

৪। বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতীয় পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

৫। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুরূপ হইতে হইবে।

৬। ভারত- বাংলাদেশ চুক্তিগুলি ভারতীয় সম্মতি ব্যতীত বাতিল করা যাইবে না।

৭। ডিসেম্বর পাক- ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোন সময় যে কান সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

উপরে বর্ণিত চুক্তিগুলিতে মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তাজউদ্দিনের বদলে যখন শেখ মুজিব ক্ষমতা হাতে নিন তখনও কি ভারতের প্রতি এ নতজানু নীতিতে সামান্য পরিবর্তন এসেছিল? আসেনি। তাজউদ্দিন যে দাসখতে স্বাক্ষর করেছিলেন সেগুলো শেখ মুজিবও মেনে নেন। "১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার বুকে বঙ্গভবনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান স্বাক্ষরিত ২৫ সাল বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তিতে সেগুলি সন্নিবেশিত করা হয়।" - (অলি আহাদ) পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব বাংলার মানুষের বহু অর্থনৈতিক কল্যানের বড় বড় কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি ও তার দল কি করেছে সেটি দেখা যাক। প্রতিটি দেশের দেশপ্রেমিক সরকার শুধু দেশবাসীকে বিদেশী শক্তির সামরিক আগ্রাসন থেকেই রক্ষা করে না, রক্ষা করে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হামলা থেকেও। প্রতিদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক সরকারই এমন একটি অঙ্গিকার নিয়েই সেদেশে কঠোর ভাবে দিবারাত্র সীমান্ত পাহারা দেয়, যাতে বিদেশী পণ্যের সয়লাবে নিজ দেশের পণ্যগুলো বাজার না হারায়। একাজটি যাতে সুচারু ভাবে হয় সে জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক সরকারই বিপুল অর্থ ভাবে সীমান্ত রক্ষি বাহিনী গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে আপোষ চলে না। সামরিক প্রতিরক্ষার চেয়ে অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষার বিষয়টি কোন দেশের জন্যই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বহীন ছিল না বাংলাদেশের জন্যও। কারণ, নিজদেশের পণ্য বাজার হারালে সে পণ্যের উৎপাদনকারি শ্রমিকগণ তখন বেকার হয়। এজন্যই প্রতিদেশের দেশ- প্রেমিক সরকার শুধু নিজদেশে নয়, বিপুল উদ্যোগে বিদেশেও বাজার খুঁজে।

একাজে ব্যর্থ হলে ভিখারি হওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তাই থাকে না। মুজিব আমলে বাংলাদেশের ভাগ্যে সেটিই জুটেছিল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মুজিবের কোন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গিকার ছিল না। ফলে সেদিন বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছিল "তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি" রূপে। মুজির আমলের এটিই ছিল সবচেয়ে বড় অর্জন। আগামী হাজার হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষকে এ বদনামের বোঝা ও কলংক বইতে হবে। অথচ দেশটির অতীত ইতিহাসে এ পরিচয় কোনকালেই ছিল না। বরং বাংলার মসলিন শিল্প তখন বাজার পেয়েছে নানা দেশের নানা জনপদে।

ভারত শুরু থেকেই চাচ্ছিল, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূগোল বিলু করা যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ অর্থনৈতিক সীমান্ত লোপ পাক। যাতে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশের বাজারে অবাধে প্রবেশাধিকার পায়। এটি ছিল ভারতীয় বিদেশ নীতির গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজী। আর এ লক্ষ্যে ভারতকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবের ফেরে আসার তিন মাসের মধ্যে ভারত তার থেকে সে অধিকার আদায় করে নেয়। রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে একটি দেশের দেশপ্রেমিক সরকারের যে প্রবল রাজনৈতিক অঙ্গিকার থাকে, সেটি শেখ মুজিব ও তার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের ছিল না। প্রতিদেশের ভারত ১৯৭২ সালের ২৭ই মার্চ মুজিব সরকারের সাথে সীমান্তের ২০ মাইল অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। আর এ চুক্তি মোতাবেক ভারতীয় পণ্যের জন্য সমগ্র সীমান্ত খুলে দেন। ফলে ভারত অনায়াসেই পায় বৃহৎ বাজার। ভারত পূর্ব পাকিস্তানেরও প্রতিবেশী ছিল। কিন্তু অখন্ড পাকিস্তান তার ২৩ বছরে একটি দিনের জন্যও ভারতীয় পণ্যের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়নি। প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা খরচ করে বরং সীমান্ত পাহারা দিয়েছে যাতে নিজ দেশের পণ্য বিদেশী হামলার মুখে না পড়ে। ফলে সে আমলে ভারতের চেয়ে দ্রুত গতিতে বেড়েছে শিল্পোন্নায়ন। বেড়েছিল কুঠির শিল্প। তখন বিড়ি তৈরী করেই লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। ব্যাপক ভাবে বেড়েছিল তাঁতশিল্প। অথচ মুজিব সে নিরাপত্তা দিতে পারেনি দেশের সে ক্ষুদ্র শিল্পকে। ফলে দ্রুত ধ্বস নেমেছে দেশের অর্থনীতি। দেশের কলকারখানা বন্ধ হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে কুটির শিল্প। শুধু ভারতীয় পণ্যের জন্য বাজার করে দেওয়ার লক্ষ্যে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন বেকার হয়েছে। নেমে এসেছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

আর এতে প্রাণ হারিয়েছে বহু লক্ষ। মুজিব শুধু নিজের গদীর স্বার্থে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য এমন ভয়ানক মৃত্যু ও বিপদ ডেকে আনে।

১৯৭১- এর যুদ্ধে বিজয়ে ভারতের প্রভূত রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা হয়েছিল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তারা নিজেরা যে শুধু বিপুল আনন্দ পেয়েছে তা নয় গভীর আনন্দ দিয়েছে বিশ্বের তাবত ইসলামের দুশমন কাফেরদের। ভারত তার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বিখন্ডিত করে নিজে দক্ষিণ এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দি হয়েছে সেটি সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় লাভটি হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের বাজার লাভটি ছিল তার সবচেয়ে বড় বিজয়। এটি ছিল ভারতের পশ্চিম বাংলা, বিহার ও আসামের সম্মিলিত আভ্যন্তরীন বাজারের চেয়েও বিশাল। এক কালে এ বাজার দখলের জন্যই ইংরেজেরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এ দেশটিতে ছুটে এসেছিল। তবে ভারত শুধু বাজার দখল করেই ক্ষান্ত দেয়নি। বাংলাদেশের পণ্য যাতে নিজ দেশে এবং বহিঃবিশ্বে ভারতীয় পণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা না করতে পারে তারও পাকা ব্যবস্থা করেছিল। ইংরেজেরা তাদের পণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা নির্মূল করতে বাংলাদেশের মসলিন শিল্পের তাঁতীদের হাত কেটেছিল। সে অভিন্ন লক্ষে ভারত বাংলাদেশের তাঁতীদেরই শুধু নয়, পুরা শিল্পকেই ধ্বংস করেছিল। আর সে শিল্প ধ্বংসে ভারতকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীবাহিনা। এবং সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা দিয়েছিলেন শেখ মুজিব নিজে। শেখ মুজিব দেশের সমস্ত শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেছিলেন, সেগুলিকে কেড়ে নিয়েছিলেন তাদের আসল মালিকদের থেকে। এবং তুলে দিয়েছিলেন তার অযোগ্য ক্যাডারদের হাতে। আর এ ক্যাডারগণ যে শুধু শিল্প- পরিচালনায় অযোগ্য ছিল তাই নয়,সীমাহীন দুর্নীতি পরায়নও ছিল। অন্যের কোল থেকে কেড়ে আনা সন্তানের প্রতি অপহরনকারি ব্যক্তির দরদ থাকে না। তেমনি বাংলাদেশের শিল্পের প্রতি দরদ ছিল না এসব আওয়ামী ক্যাডারদের। এরা নিজেদের শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে দেশে কোন শিল্পই গড়েনি, পাকিস্তান আমলে গড়া শিল্পকে তারা দখলে নিয়েছিল মাত্র। ফলে তাদের দরদ ছিল না সেসব প্রতিষ্ঠিত শিল্প কলকারখানার উপর। দেশের স্বার্থের চেয়ে তাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছিল।

সে অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও শিল্পধ্বংসের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাকঃ

“আদমজী জুট মিল ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাটকল। পাটজাত দ্রব্যে বিদেশে রফতানি করে এ মিলটি শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মূদ্রা আয় করেছে। ভারতের পাটকলগুলির সামর্থ ছিল না তার সাথে প্রতিযোগিতার। অথচ মুজিব সরকার এত বড় একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লোকশানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। শেখ মুজিব এ মিলের দায়িত্বে বসিয়েছিলেন তারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। উৎপাদন বাড়ানোর চেয়ে এ মিলের মূল কাজ হয় আওয়ামী কর্মীদের এ মিলে চাকুরি দিয়ে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা। ১৯৭৪ সালের ২২ই মার্চ ইত্তেফাক এ মর্মে খবর ছেপেছিল যে পাট শিল্পে ২৫ হাজার বাড়তি ও ভূয়া শ্রমিক এবং ৩ হাজার ৬ শত ভূয়া কর্মকর্তা রয়েছে।” -(মুনির উদ্দীন আহমদ, ১৯৮০)

কথা হল, একটি মাত্র মিলে যদি ২৫ হাজার ভূয়া শ্রমিক দেখিয়ে রাজনৈতিক ক্যাডার পালনের ব্যবস্থা করা হয় তবে সে কারখানা যত লাভজনকই হোক তা কি টিকে থাকতে পারে? এসব কর্মীরা লুটপাট ছাড়া এ মিলের আর কোন খেদমতই করেনি। সে লুটপাটেরই এক করুন চিত্র ছেপেছিল সে সময়ের দৈনিক গণকন্ঠ ১৯৭২ সালের ২৭ অক্টোবর সংখ্যায়। শিরোনামটি ছিল, “আদমজী জুট মিলের ওয়ার্কশপে এলাহী কান্ডঃ প্রায় দেড় লক্ষ টাকার খুচরা যন্ত্র গোপনে বিক্রি।” বিরামহীন লুটের মাধ্যমে এ বিশ্ববিখ্যাত মিলটি তারা অচল করে দিয়েছে। অথচ এ মিলের মুনাফা দিয়ে এক সময় দেশে আরো অনেক কলকারখানা গড়া হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বহু স্কুল- কলেজ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের দূর্নীতি ও ভারত- তোষণ নীতির অসম্ভব হয় এ মিলটির নিজের পক্ষে বেঁচে থাকাটিই। শুধু আদমজী জুটমিলই নয়, ধ্বংসের মুখোমুখি হয় অন্যান্য কলকারখানাগুলিও। একের পর এক পাটের গুদামে আগুন লাগানো হয়েছে। বাংলাদেশের পাট শিল্প এভাবে ধ্বংস হওয়াতে রম- রমা হয়েছে ভারতীয় পাটকলগুলো। তারা তখন সহজেই দখল করে নেয় পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার। এমন কি বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে ভারতের সাথে চুক্তি করে পাট রপ্তানির অধিকার ভারতের হাতে সঁপে দেয়। আর এর ফলে ৫৯ হাজার জুটবেলিং শ্রমিক বেকার হয়ে যায়।- (গণকন্ঠ জুন ১২, ১৯৭৪)

পাকিস্তান আমলে ভারত এমনটি ভাবতেও পারেনি। শুধু বড় বড় কলকারখানাই নয়, একই রূপ দূর্নীতির মাধ্যমে ধ্বংসা করা হয়েছিল বাংলাদেশের কুটির শিল্প। সূতা আমদানি ও তার বিতরণ আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে দিয়ে প্রকৃত তাঁতীদের হাতে ন্যায্য দামে ও সঠিক মূল্যে সূতা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেনি। ফলে ভারতীয় সস্তা ও নিম্নমানের কাপড়ের সাথে প্রতিযোগীতার সামর্থ হারা বাংলাদেশের তাঁতীরা। ফলে বেকার হয়েছিল এবং দূর্ভিক্ষের মুখে পড়েছিল পাকিস্তান আমলের স্বচ্ছল তাঁতীরা। মুখে যাই বলুক, বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ ছিল আওয়ামী লীগের প্রকৃত অবদান।

শেখ মুজিব বাংলাদেশকে নিয়ে কীরূপ স্বপ্ন দেখতেন সেটি জনগণের জানার উপায় ছিল না। সেটি তার অদৃশ্য মনজগতের বিষয়। তবে বাংলাদেশকে তিনি যেখানে নিয়ে গেছেন সেটি শুধু বাংলাদেশের মানুষই শুধু দেখেনি, বিশ্ববাসীও দেখেছে। দেশটির বহু হাজার বছরের ইতিহাসে এমন দুস্থ্যদশা মূলতঃ নজিরবিহীন। এতটা দুরবস্থায় বাংলাদেশের কোন কালেই পড়েনি। তবে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীগণ নিজেদের এ ব্যর্থতা লুকাতে অন্যদের গায়ে কালীমা লেপনের চেষ্টা করেছে। এজন্যই একাত্তরের মিথ্যা ইতিহাস রচনায় আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের এত উদ্যোগ। একাত্তরের কতজন মারা গেল সে হিসাবটুকু না নিলে কি হবে, বহু হাজার পৃষ্ঠার বহু লিখেছে নিছক বিরোধীদের খুনী ও দালাল রূপে চিত্রিত করতে। ১৯৭০য়ের নির্বাচনের পূর্বে এ আওয়ামী বাকশালী পক্ষটি “পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন?” শিরোনামে পোষ্টার ছেপে সারা দেশে প্রচার করেছিল। কিন্তু তাদের কথিত সে শ্মশান আমলে পূর্ব বাংলার মানুষ কি কখনও দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছিল? কাপড়ের অভাবে কি মহিলা মাছধরা জাল পড়েছিল? এক দিনের জন্যও কি দেশ ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়েছিল? পাকিস্তান আমলের পূর্ব পাকিস্তানকে যারা শ্মশান বলল, তারাই একাত্তরের পর দেশটিকে বদ্ধভূমি ও শ্মশান বানিয়ে বিশ্বের সামনে পেশ করেছিল।

শেখ মুজিব যে শুধু গণতন্ত্র হত্যা করেছেন,দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছেন বা জাতিকে ভারতের গোলাম বানিয়েছেন তা নয়, তার চেয়েও বড় ক্ষতি করেছেন জাতির মেরুদন্ড ধ্বসিয়ে দিয়ে। শিক্ষাই হল জাতির মেরুদন্ড। এখানে কোন ফাঁকি- বাজি চলে না। জ্ঞানার্জনের কোন সহজ রাস্তা

নেই। একটি দেশের মেরুদন্ড ভাঙতে হলে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়াটাই সে জন্য যথেষ্ট। এ কাজ শত্রুদের। তাই দেশের কল্যাণে কোন নেতার সামান্যতম আগ্রহ থাকলে শিক্ষাব্যবস্থার সামান্যতম ক্ষতি হবে এমন সিদ্ধান্ত তিনি নেন না। কিন্তু শেখ মুজিব নিয়েছিলেন। একাত্তারের যুদ্ধ চলাকালীন ৯ মাসে বাংলাদেশের স্কুল- কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়নি। কিন্তু লেখাপড়া না হলে কি হবে শেখ মুজিব ছাত্রদের নাম- মাত্র পরীক্ষা নিয়ে বা পরীক্ষা না নিয়েই পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশনের ব্যবস্থা করলেন। ফলে যুদ্ধকালীন নয় মাসে ছাত্রদের যা শেখা উচিত সেটা শেখা ও শেখানোর আর কোন সুযোগই থাকল না। সরকার শেখানোর ব্যবস্থাও করল না। এমনকি মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা না নিয়ে পাসের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে প্রচুর সার্টিফিকেট বিতরণ হল, কোন জ্ঞান বিতরণ ছাড়াই। তার আমলে পরীক্ষার হলে ব্যাপক ভাবে নকল শুরু হয়। নকল সরবরাহকারিরা তখন বই নিয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে হাজির হত। মুজিব সরকার সেটি রুখবার কোন ব্যবস্থাই নিল না। দায়িত্বহীনতা আর কাকে বলে?

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে চুরি বা দূর্নীতি শুরু হলে তার চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে। তখন সে চুরিবিদ্যার প্রয়োগ শুরু হয় অফিস- আদালত ও ব্যবসা- বাণিজ্যে। একটি জাতির জন্য এরচেয়ে বড় আত্মঘাতি আর কি হতে পারে? কিন্তু আত্মঘাতি রাজনীতি যাদের আজীবনের পেশা তাদের কাজে এত বড় অপরাধ কোন অপরাধই মনে হয়নি। ছাত্রদেরকে তিনি ও তার বশংবদেরা সচারচরই ব্যবহার করেছেন সন্ত্রাসী রাজনীতির অবৈতনিক লাঠিয়াল রূপে। তার আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার দলীয় ছাত্রনেতাদের দ্বারা ছাত্র খুণ হয়েছে প্রকাশ্যে। কিন্তু এজন্য কারো কোন শাস্তি হয়নি। বরং মুজিবের দ্বারাই সরকারি ভাবে শুরু হয় বিচারবহিঃর্ভূত হত্যার ঘটনা। তার আমলে বিচার ছাড়াই শুধু বন্দী সিরাজ সিকদারকেই হত্যা করা হয়নি, রক্ষী বাহিনী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে হাজার ছাত্র ও যুবককে। বহু কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বসানো হয়েছিল আওয়ামী লীগের দলীয় ক্যাডারদের।অপর দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সীমাহীন অরাজকতা, দূর্নীতি ও শিক্ষাদানে চরম অবব্যবস্থা তিনি সৃষ্টি করেছিলিন সেটি বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ সাংঘাতিক খবর ছড়িয়ে পড়িছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। ফল দাঁড়ালো, বাংলাদেশী ডিগ্রি বিদেশে মূল্য হারালো, এবং এভাবে ইজ্জত হারালো

শিক্ষিতরা। ইংল্যান্ডসহ অনেক দেশই বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়। এভাবে বহিঃবিশ্বে বেইজ্জতি বাড়ে বাংলাদেশী ডাক্তারদের এবং সে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থারও। শেখ মুজিব এভাবে কালিমা লেপন করলেন, বাংলাদেশী শিক্ষিতদের মুখে। মুজিবামলে ট্রান্সপ্যারেনসী ইন্টারন্যাশনাল জন্ম নেয়নি। সেটির জন্ম হলে দূর্নীতি পরিমাপের সে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশ যে সে আমলেও বিশাল ব্যবধানে বিশ্বে প্রথম হত, তা নিয়ে সন্দেহ আছে কি? বাংলাদেশ পরবর্তীতে যে ভাবে দূর্নীতিতে বিশ্বে বার বার প্রথম হয়েছে তার বিশাল চর্চা তো শুরু হয়েছিল মুজিব আমল থেকেই।

কারো সততা তার কথায় ধরা পড়ে না। সমাজের অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তিটিও নিজেকে সৎ ও নির্দোষ বলে দাবী করে। তবে প্রতি সমাজেই সততা পরিমাপের কিছু গ্রহনযোগ্য মাপকাঠি আছে। তা হল, তার আয় এবং গচ্ছিত সম্পদের হিসাব। একজন ভদ্রলোকের পক্ষে তার আয় ও সম্পদ কোনটাই লুকানোর বিষয় নয়। চাকুরি, ব্যবসা- বাণিজ্য বা চাষাবাদ যাই সে করুক না কেন তা থেকে যেমন তার সমুদয় আয়ের একটি হিসাব যে কেউ বের করতে পারে। তেমন তার ঘরবাড়ি ও গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ কত সেটিরও একটি হিসাব বের করা যায়। আযের সাথে সম্পদের সে অসঙ্গতিই বলে দেয় তার আসল সততা। তখন বেড়িয়ে আসে সে কতটা দুর্বৃত্ত। এ বিচারে বিশাল আদালত বসানো লাগে না। তাই মোটা বেতনের চাকুরি নাই, বিশাল ব্যবসা- বাণিজ্য নেই, পিতার জমিদারীও নাই এমন ব্যক্তি যদি ধানমন্ডি, গুলশান বা বনানীতে বিশাল বাড়ীর মালিক হন, তখন কি গবেষণার প্রয়োজন পড়ে এটুকু বুঝতে যে লোকটি আর যাই হোক সৎ হতে পারে না? শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর তার গৃহে প্রাপ্তসম্পদের একটি তালিকা করা হয়। ৩০ শে অক্টোবর (১৯৭৫) দৈনিক ইত্তেফাক মোতাবেক শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং সড়কের ব্যক্তিগত বাসভবনে প্রাপ্ত সম্পদের বিররণ হলঃ

০ হীরা, মুক্তা, প্লাটিনাম ও স্বর্ণালঙ্কর - ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা

০ নগদ বাংলাদেশী টাকা- ৯৪ হাজার ৪ শত ৬১ টাকা

০ ব্যক্তিগত মোটর গাড়ী - ৩ টি

০ বৈদেশিক মুদ্রা ১৭ হাজার ৫ শত টাকা (সমমূল্যের)

০ বিদেশী রাষ্ট্র প্রদত্ত ১ লক্ষ টাকার উপহার

০ বাতিলকৃত শতকী নোট - ৬ শত ২১ খানা

০ ১টি ভারী মেশিনগান, ২টি হালকা মেশিনগান, ৩টি এস,এম,জি, ৪টি স্টেনগান, ৯০ টি গ্রেনেডসহ গোলাবারুদ ইত্যাদি।

মুজিবের রাজনৈতিক সততা যাচাইয়ের বহু দলীল রয়েছে, বহু প্রমাণও রয়েছে। কোটি কোটি মানুষ তার রাজনৈতিক কর্ম ও আচরণ স্বচোক্ষে দেখেছে। রাজনৈতিক চরিত্রের পাশাপাশি অকাঠ্য প্রমাণ রয়েছে তার অর্থনৈতিক চরিত্র বিচারেও। মানুষ মারা যায় এবং রেখে যায় সম্পদ। আর সে গচ্ছিত সম্পদের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় তার প্রকৃত চরিত্র। বস্তুতঃ ব্যক্তির চরিত্র পরিমাপে এ সম্পদই হল প্রকৃত গজ- ফিতা। তাই চরিত্র লুকানো যায় না, যেমন লুকানো যায় না গচ্ছিত সম্পদ। একারণেই যে কোন দেশে এবং যে কোন সমাজে সততা বা ন্যায়পরায়নতা যাচাইয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল নাগরিকের গচ্ছিত সম্পদের তথ্য। তাই বহু দেশের সরকারই কড়া নজরদারি রাখে নাগরিকদের গচ্ছিত সম্পদের উপর। তাই মুজিবের চরিত্র বিচারে এ গচ্ছিত সম্পদ যে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় সেটি কি অস্বীকার করা যায়? মুজিব ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ। তার কোন ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না। তার পিতাও কোন বিত্তশালী লোক ছিলেন না। তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সে সুবাদে কিছু সরকারি বেতনও পেয়েছেন। কিন্তু কথা হল, সে বেতন যত বিশালই হোক, তা দিয়ে কি এরূপ গচ্ছিত সম্পদ গড়ে উঠে? কেনা যায় কি তিনটি মোটর গাড়ি? জমে উঠে কি লাখ লাখ টাকার সম্পদ? নির্মিত হয় কি ধানমন্ডির বিশাল বাড়ী? বাংলাদেশে যিনি সর্বোচ্চ সরকারি বেতন পান তার পক্ষেও কি এত সম্পদের মালিক হওয়া সম্ভব? তাই প্রশ্ন, কোথা থেকে পেলেন তিনি এ বিশাল সম্পদ? এ সম্পদ যে সৎ উপায়ে অর্জিত হয়নি তা নিয়ে কি সন্দেহ থাকে? আর যে ব্যক্তি সম্পদ- অর্জনে সৎ নন তিনি কি রাজনীতিতেও সৎ হতে পারেন? কথা হল, এমন ব্যক্তিকে কি

শ্রেষ্ঠ বাঙালীর আসনে বসানো যায়? আর সেটি করলে কি একটি জাতির ইজ্জত থাকে? থাকে না বলেই, বহু পাশ্চাত্য দেশে মিথ্যা বললে বা আয়ের সাথে সঙ্গতি নাই এমন গচ্ছিত সম্পদ ধরা পড়লে এমন ব্যক্তিকে কোন দলই মন্ত্রীত্ব দেয় না, এমন কি দলীয় সদস্যপদও দেয় না। কোন দুর্বৃত্তকে নেতা বানালে দুর্বৃত্তের ক্ষতি হয় না, ভয়ানক ক্ষতি এবং সম্মানহানী হয় তাদের যারা তাকে নেতা বানায়। এটি অনেকটা গলিত আবর্জনা মাথায় করে বিশ্ব- দরবারে দাঁড়ানোর মত। তাই কোন বিবেকমান জাতিই দুর্বৃত্তের দায়ভার মাথায় নেয় না, বর্জ- আবর্জনার ন্যায় তাকেও তাই ইতিহাসের আবর্জনার স্তুপে ফেলে। দূর্নীতিপরায়ন ব্যক্তির প্রকৃত স্থান তাই জেলে, সমাজে নয়। দূর্নীতিই একটি ব্যক্তির চরিত্রের সবচেয়ে বড় কলংক। আর এমন ব্যক্তিকে সম্মান দিলে অসম্মান ও অপমান বাড়ে জাতির। আর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অপমান বাড়িয়েছে শুধু দেশকে তলাহীন ভিক্ষার ঝুলি বানানোর মধ্য দিয়ে নয়, বরং সবচেয়ে বড় অসম্মান বাড়িয়েছে দূর্নীতিবাজদের মাথায় তুলে।

অধ্যায় ২১: যে আত্মঘাত শুরু হয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে

মুজিবামলে বাংলাদেশে যে ভয়ানক দূর্ভিক্ষ নেমে আসে তাতে মৃত্যু হয় বহু লক্ষ মানুষের। ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস যত মানুষ মারা গিয়েছিল এ সংখ্যা ছিল তার চেয়েও বেশী।কারণ এ দুভিক্ষ আঘাত হেনেছিল সমগ্র বাংলাদেশে।সভ্যদেশ মাত্রই সেদেশের মানুষ কেন পশু কোন দুর্যোগে মারা গেলেও হিসাব রাখে। কিন্তু অগণিত মানুষ মরলেও শেখ মুজিব তার হিসাব নেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। তাই একাত্তরের যুদ্ধে নিহত মানুষের যেমন হিসাব করেনি তেমনি ১৯৭৪ সালের দূর্ভিক্ষে নিহত মানুষের সংখ্যাও গণনা করিনি। মশা- মাছি ও শিয়াল- কুকুরের ন্যায় মানুষ মানুষ পথে ঘাটে মারা গেছে। সরকারি বিভাগের কোন কর্মচারির পদধুলি যেমন তাদের ঘরে জীবত অবস্থায় পড়েনি,তেমনি তাদের লাশের পাশেও পড়েনি। আর এ দুর্যোগ হঠাৎ আসেনি, এসেছিল একটি পরিকল্পনার অংশ রূপে। সে ভয়াভহ দুর্ভিক্ষর নেমে এসেছিল মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ শেখ মুজিব সরকারের

সীমাহীন দূর্নীতি ও অযোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ ভারতের সীমাহীন শোষণ। নিজেদের দূর্নীতি ও অযোগ্যতার পাশাপাশি ভারতের শোষনেও মুজিব সরকার সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

শুরু থেকেই ভারতের কাছে এটা অজানা ছিল না যে,বাংলাদেশে ভারত ও ভারতীয় স্বার্থের যারা প্রকৃত বন্ধু হল শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ নয়। সেটি প্রকাশ পেয়েছে এমন কি একাত্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র কথা থেকেও। তিনি বলেছিলেনঃ

"যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়,তাহলে ভারতের আশ্চার্য হবার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈনিকেরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি উপলব্ধি করি,বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদের সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের সাথে আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মত আচরণ করেছেন।"- (দৈনিক স্টেট্সম্যান, কোলকাতা, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮)

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক বিজয় যে বেশী দিন থাকবে না সে ভয় ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদদের শুরু থেকেই ছিল। ভারতীয় স্ট্রাটেজিস্টদের অতি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল, কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতে না দেওয়া। সে সাথে সব সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা জিইয়ে রাখা। সে কৌশল শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই নয়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও। ভারত চায় তার চারপাশে ভূটান ও নেপালের ন্যায় দুর্বল রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। ১৯৪৭ সাল থেকেই সেটি করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করেছে ১৯৭১ থেকেই। প্রতিবেশীর সামরিক শক্তিতে ভারত যে কতটা স্পর্শকাতর তার একটা উদাহরন দেয়া যাক। প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে বাংলাদেশ কয়েকখানি মিগ-১৭ কিনেছিল চীন থেকে। তা নিয়ে প্রতিবাদ উঠেছিল ভারতে। ভারতের

প্রভাবশালী ইংরেজী সাপ্তহিক পত্রিকা "ইন্ডিয়া টুডে"-এ মিগ ক্রয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মূলক নিবন্ধ ছেপেছিল। কোথায় ভারতের সামরিক শক্তি আর কোথায় বাংলাদেশের!ভারত আনবিক বোমা বানানোর অধিকার রাখে, অথচ বাংলাদেশকে পুরনো আমলের মিগ কিনতে দিতেও রাজী নয়। বাংলাদেশকে তারা যে কতটা শক্তিশালী দেখতে চায় এ হল তার নমুনা। একই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পিত ভারতীয় লুটপাটের শিকার হয়েছিল ১৯৭১ থেকেই। তাই পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র লুন্ঠন করে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতে।

পাকিস্তান আমলে গাজীপুরে চীনের সহয়তায় একটি অস্ত্র কারখানা গড়া হয়। ভারতীয় বাহিনীর সে অস্ত্রকারখানার অস্ত্রনির্মানকারি যন্ত্রাপাতি খুলে নিয়ে যায়। সে সময় আওয়ামী নেতা ও মুক্তিবাহিনীর কাজ ছিল সে লুটপাটকারী ভারতীয় সৈনিকদের স্যালুট করা। শুধু তা নয়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেনানিবাসগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে যেসব সোনা-রুপা ও দামী জিনিষপত্র ছিল সেগুলোও লুটে ভারতে নিয়ে যায়। ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র "অমৃত বাজার"-এর ১২ই মে ১৯৭৪ সাল-এর রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার দুই হতে আড়াই শত রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে স্থানান্তরিত করে। অথচ ১৯৭৩ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে,"ভারতে কোন অস্ত্রশস্ত্র পাচার হয় নাই বা লইয়া যায় নাই"। প্রশ্ন জাগে, যদি জনাব তাজ্উদ্দিন সত্য বলে থাকেন তবে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া কয়েক শত ট্যাংক গেল কোথায়?

১৯৭৫ সালে মুজিব সরকারের অপসারণে সামরিক বাহিনীর তরুন অফিসারগণ যে ট্যাংক ব্যবহার করেছিল সেগুলি ছিল মিশর সরকারের দেওয়া। তখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পাকিস্তান আমলের কোন ট্যাংকই ছিল না। অতএব তাজউদ্দিন যা বলেছেন সেটি সত্য ছিল না, ছিল ডাহা মিথ্যা। আর জাতির সাথে যারা এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যা বলেন, সে সব মিথ্যাবাদীদের থেকে জনগণ কি আশা করতে পারে? অপর দিকে ১৯৭৪ সালের ১৭ই জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর বলেন, ভারতে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশকে ফেরত দেওয়া শুরু হইয়াছে। দুই মন্ত্রীর দুই ধরনের বক্তব্য। যদি ভারত কোন ট্যাংক ফেরত দিয়েই থাকে

তবে কোথায় রাখা হল সে ফেরতপ্রাপ্ত ট্যাংকগুলো? দুইজনের কেউই সত্য বলেন নি। আর এই হল আওয়ামী লীগের মিথ্যানির্ভর রাজনীতির নমুনা। একই ভাবে পরিকল্পিত লুন্ঠনের শিকার হয় বাংলাদেশের শিল্প। একাত্তরের পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমান বৈদিশিক মূদ্রা উপার্জন করতে তার ৯০% ভাগ আসতো কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানী করে। বাঁকিটা আসতো চা ও চামড়া রপ্তানী করে। আর এ তিনটি খাতই ছিল আন্তজার্তিক বাজারে ভারতের সাথে প্রতিযোগিতা মূলক। ভারত এ তিনটি খাতই পরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করে দেয় এবং প্রতিদ্বন্দিতার ময়দান থেকে বাংলাদেশী পণ্যকে বের করে দেয় যা পাকিস্তান আমলে তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। আর এর ফলে চরম আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার যারা পাট থেকে তাদের উৎপাদন খরচও পাচ্ছিল না। আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিব সবসময়ই নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যদের ঘাড়ে চাপাতে অভ্যস্থ। শিল্পের এ দূর্গতির জন্যও তারা একাত্তরের যুদ্ধকে দায়ী করে। কিন্তু সেটি সঠিক ছিল না। এ ব্যাপারে ১৯৮০ সালে দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছিল,

"একাত্তরের যুদ্ধের বছর নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে তেমন কোন শিল্প প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। আসলে যুদ্ধটা একটা অজুহাত মাত্র। তাছাড়া জাতিসংঘের ত্রাণ কমিটির এক হিসাব থেকেও জানা যায়,বাংলাদেশের যুদ্ধজনিত সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বাংলাদেশে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল তেরগুণ বেশী।"-(ইত্তেফাক সেপ্টম্বর ৩, ১৯৮০)

দেশী শিল্প চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুজিবামলে। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত হল পাট শিল্প। কিন্তু এ শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে এবং সেটি ভারতের স্বার্থে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল এই ২০ বছরে পাটকলগুলোতে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় শূণ্য থেকে ২১,৪০০। পাকিস্তানের চতুর্থ ৫ সালা পরিকল্পনায় তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৭৫ সাল নাগাদ ৪০ হাজার করার পরিকল্পনা ছিল। তাঁতের সংখ্যা ৪০ হাজারে পৌঁছলে বিপুল ভাবে বাড়তো বৈদিশীক মূদ্রার উপার্জন। তখন বিদেশের বাজারে কাঁচা পাটের স্থলে সম্ভব হত পাটজাত পণ্যের রপ্তানি। কিন্তু

পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ায় সে আশা আর পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ বাংলাদেশে আমলে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সালে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫,৭০০। অর্থাৎ ৯ বছরে বেড়েছে মাত্র ৪ হাজার। তবে তাঁতের সংখ্যা কিছু বাড়লেও প্রচন্ড ধ্বস নামে উৎপাদনে। উৎপাদন নেমে যায় ১৯৬৯- ৭০ সালেরও নীচে। মুজিব সরকারের পাটমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান প্রতিদ্বন্দি ভারতের সাথে এমন এক চুক্তি করে যার ফলে বাংলাদেশের পাট শিল্পের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। অথচ পাকিস্তান আমলে পাটশিল্প ছিল দেশের সবচেয়ে লাভজনক খাত। মুজিব সরকার এটিকে লোকসানের খাতে পরিণত করে। একাত্তরের আগে পূর্ব পাকিস্তানের পাটের সরকারি ও বেসরকারি গুদামে আগুণ লেগেছে এটি ছিল অতি বিরল ঘটনা। কিন্তু মুজিবের শাসনামলে পাটের গুদামে আগুণ লাগার ঘটনাটি অতি ঘন ঘন ঘটতে থাকে। তখন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অতি দ্রুত বিলুপ্ত হতে থাকে বাংলাদেশী পাট, সে বাজার সহজেই দখল করে নেয় ভারত। অথচ পাকিস্তান আমলে ভারত তা ভাবতেও পারেনি। আর শেখ মুজিব সেটি তাদের ঘরে তুলে দেয়। মুজিব সরকারের আমলে ভারত সরকার কিভাবে বাংলাদেশের পাট লুন্ঠন করে তার এক বিবরণ দিয়েছেন জনাব অলি আহাদঃ

"স্মরণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরর বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত- বাংলাদেশে সীমান্ত একাকার হইয়া যায়। বিনা অনুমতিতে বা বিনা দলিলেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় জনতা ও পণ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। বাংলাদেশ বাস্তবে ভারতের বাজারে পরিণত হয়। বাংলাদেশ হতে লক্ষ লক্ষ গাইট পাট অবাধে সীমান্ত পারের পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় পাটকলগুলির পূর্ণোদ্যমে দুই- তিন শিফটে কাজ চালু হইয়া যায়। এমন কি বাংলাদেশের পাট- লোপাট করিয়া ভারত নূতন করে বিদেশে কাঁচাপাট রফতানী শুরু করিয়া দেয়।স্মর্তব্য, কাঁচাপাটের অভাবে ইতিপূর্বে ভারতীয় পাটকলগুলি অতি কষ্টে এক শিফটে কাজ করিত এবং ১৯৬৫ সালে পাক- ভারত যুদ্ধের পর পাক- ভারত বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভারতকে বাধ্যতঃ সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে প্রতি বৎসর ১০ থেকে ১৫ লক্ষ বেল পাকিস্তানী পাট চড়ামূল্যে ক্রয় করিতে হইত।..অথচমুজিবের শাসনামলে ভারত অবাধে বাংলাদেশের পাট লুন্ঠন শুরু করিয়া চলিল।সেই পাটজাত পণ্য দ্বারাই ভারত বাংলাদেশের

পাটজাত পণ্যের বাজার দখল করিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশী কাঁচাপাট রফতানী দ্বারা ভারত নিয়মিত ভাবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিয়া চলিল। অথচ শেখ মুজিব টু শব্দটি উচ্চারণ করিলেন না।ইহা কোন স্বার্থের বিনিময়ে কিংবা কোন বিশেষ কারণে? তিনি কি জ্ঞাত ছিলেন না যে,ভারতের পাটশিল্পজাত পণ্য রফতানীপ্রসূত অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাত্র ১৫% থেকে ১৭% ; কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি কাঁচাপাট ও পাটশিল্পজাত পণ্য রফতানী আয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।”

১৯৭২ সালের ২৭শে মার্চ শেখ মুজিব সরকার ভারতের সাথে সীমা বাণিজ্য চুক্তি নামে যে চুক্তিটি সাক্ষর করে তার ফলে ভারত সরকার বাংলাদেশে লুটপাটের একটি বৈধ ভিত্তি পায়। তখন ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান থেকে বৈদেশিক অর্থে আমাদানিকৃত উন্নতমানের পণ্য ভারতে পাচার করা শুরু হয়। সে স্রোতের সাথে যাওয়া শুরু করে সোনা- রূপা, তামা, পাকিস্তানী আমলের ধাতব মুদ্রা, কলকারখানার যন্ত্রপাতি, সার, আমদানিকৃত বিদেশী ঔষধ এবং বাংলাদেশী মাছ।” – (অলি আহাদ)

মুজিবের হাতে অর্থনীতির বিনাশের যে কাজ শুরু হয়েছিল, সেটি শুধু পাটশিল্পে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ধ্বংস নেমে আসে চা এবং চামড়া শিল্পেও। শিল্পের এ দুটি খাতও ছিল বিদেশের বাজারে ভারতের সাথে প্রতিদ্বন্দিতামূলক। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের কোন ইচ্ছাই ছিল না ভারতের সাথে কোন রূপ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় নামার,ফলে একাত্তরের পূর্বে বিদেশে বাংলাদেশের চা ও চামড়ার যে বাজার ছিল ভারত তা অতি সহজেই দখলে নিয়ে নেয়।মুজিবামলে দ্রব্যমূল্যের যে উর্ধ্বগতি ঘটে তার বিবরণ জনাব অলি আহাদ দিয়েছেন এভাবেঃ

“(পাকিস্তান আমলের) এক টাকার গামছার দাম হয় সাত টাকা।পাঁচ টাকার শাড়ীর দাম হয় পঁয়ত্রিশ টাকা। তিন টাকার লুংগি পনের টাকা বা কুড়ি টাকায়, দশ আনা বা বার আনা সেরের চাউল হয় দশ টাকায়। আট আনা সেরের আটা ছয়- সাত টাকা। দুই আনা সেরের কাঁচা মরিচ চল্লিশ- পঞ্চাশ টাকা। তিন- চার টাকা সেরের শুকনা মরিচ আশি- নব্বই টাকা।আট আনা সেরের লবন চল্লিশ- পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ টাকা সেরের সরিষার তৈল তিরিশ- চল্লিশ টাকা। সাত

টাকা সেরের নারিকেল তৈল চল্লিশ- পঞ্চাশ টাকা। সাত টাকার লাঙ্গল ত্রিশ- চল্লিশ টাকা।”

বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসের লক্ষ্যে ভারত আরেকটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেয় বাংলাদেশের ক্যারেন্সি নোট ছাপানোর মধ্য দিয়ে। আর সে ভারতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে মহা সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় শেখ মুজিব নিজে। তিনি বাংলাদেশের জন্য নতুন ক্যারেন্সি নোট ছাপানো দায়িত্ব কোন নিরপেক্ষ দেশকে না দিয়ে সেটি ভারতের হাতে তুলে দেন। মুজিব ভারতকে যে পরিমাণ নোট ছাপতে বলেছিল তার চেয়ে বহু শত কোটি টাকার বেশী নোট ছেপে বাংলাদেশী টাকার চরম অবমূল্যায়ন ঘটায়। একাত্তরে পাকিস্তানী মূদ্রার বাজার দর ভারতীয় মূদ্রার চেয়ে অনেক বেশী ছিল, কিন্তু মুজিব আমলে বাংলাদেশী মূদ্রার বিণিময় হার ভারতীয় মূদ্রার অর্ধেকেরও কমে এসে দাঁড়ায়। ভারত যে অতিরিক্ত নোট ছেপে বাংলাদেশী অর্থনীতির সর্বনাশ করছে সেটি অন্যরা বুঝলেও সেটি শেখ মুজিব বুঝেছিল অনেক দেরীতে। হয়ত জেনেশুনেও বুঝতেই চায়নি। এবং যখন বুঝলো তখনও সে মূদ্রাকে সাথে সাথে অচল ঘোষনা না করে দুই মাস সময় দেয়। ফলে ভারতীয়রা বাড়তি সময় পায় আরো বেশী বেশী নোট ছেপে বাংলাদেশের বৈদেশিক মূদ্রায় অর্জিত সোনা- রোপা ও বিদেশী যন্ত্রাংশ কিনে ভারতে পাচারের। আর এটি ছিল বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের অতি সুস্পষ্ট দুর্বৃত্তী। কিন্তু আওয়ামী বাকশালী চক্রটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কৃত এ মহা অপরাধের বিষয়টি তাদের রচিত ইতিহাসের পাতা থেকেই বাদ দিয়েছে। অথচ ভারতের এ অপরাধের কারণেই বাংলাদেশে নেমে আসে দূর্ভিক্ষ এবং তাতে মৃত্যু ঘটে লক্ষ লক্ষ মানুষের। এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাড়ে প্রচন্ড অপমান বাড়ে। ২৩ বছরের পাকিস্তান আমলে সেটি ঘটেনি। এত মৃত্যু ও এত অপমান ৯ মাস যুদ্ধকালীন সময়েও ঘটেনি।

অধ্যায় ২২: তীব্রতা পায় ইসলামের বিরুদ্ধে অসহনশীলতা

১৯৪৭- এ পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠা পায়,হিন্দুদের নামে ও হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান ছিল। যেমন ভারতেশ্বরী হোম, রামকৃষ্ণ মিশন, জগন্নাথ হল, জগন্নাথ কলেজ, আনন্দ মোহন কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ, ভোলানাথ হিন্দু এ্যাকাডেমী (রাজশাহী) এরকম অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। দেশ জুড়ে শত শত রাস্তাঘাটের নাম ছিল হিন্দুদের নামে। বলা যায়,শহর এলাকার অধিকাংশ রাস্তার নামই ছিল হিন্দুদের নামে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়নি। সে সময় বহু কংগ্রেস নেতা ও বহু হিন্দু জমিদার বাড়িঘর ফেলে হিন্দুস্থানে চলে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি রূপে সরকারি নথিভূক্ত হয়। কোন কোন দালানকোঠা সরকারি অফিস বা সরকারি কর্মচারির বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কারো হাতে ব্যক্তিগত মালিকানার দলিল তুলে দেয়া হয়নি। সেটি করা সরকারি নীতি ছিল না। অথচ বাংলাদেশ হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানপন্থিদের ঘরবাড়ী ও দলীয় অফিস জবর দখল শুধু আওয়ামী লীগের নীতি নয়, সরকারি নীতিতে পরিণত হয়।

মুসলিম লীগের ঢাকার শাহবাগের প্রাদেশিক প্রধান দফতরটি কেড়ে নেওয়া হয়।বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কায়েদে আযম বা ইকবালের নামই শুধু অপসারিত হয়নি,যেখানে ইসলাম ছিল সেখানেও হাত পড়েছে। নজরুল ইসলামের নাম থেকে ইসলাম কেটে দেওয়া হয়েছে। তাই ঢাকার নজরুল ইসলাম কলেজ হয়ে যায় নজরুল কলেজ। অথচ আরবী ভাষায় শুধু নজরুল বলে কোন শব্দই নাই। আছে নজর বা নজরুল ইসলাম। নিছক ইসলাম বাদ দেওয়ার স্বার্থে নজরুল ইসলামের নামও বিকৃত করা হয়েছে। ঢাকার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইসলামিয়া শব্দটি বিলোপ করা হয়।আক্রোশ শুধু ইসলামের উপর নয়, গিয়ে পড়ে মুসলিম শব্দটির উপরও। তাই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি কেটে ফেলা হয়। অথচ আল্লামা ইকবাল শুধু পাকিস্তানের কবি নন, তিনি বাস্তাবিক অর্থেই বিশ্বকবি। তিন ছিলেন অতি উদার ও প্রশস্থ মনের কবি। তার স্বপ্নের মানচিত্র শুধু জন্মভূমি পাঞ্জাব ছিল না তিনি স্বপ্ন দেখতেন সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের নিয়ে।এমনকি সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে। মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের থেকে

আলাদা এক স্বতন্ত্র দেশের ধারণা তিনিই প্রথম দেন। নিজের মাতৃভাষা পাঞ্জাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কবিতা লিখেছেন উর্দু ও ফার্সী ভাষায়। তার কবিতা বাঙলার বহু লোকের কাছে অতি প্রিয়। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, ছিলেন একজন বিশ্বমানের দার্শনিক। তিনি বুঝতেন, মুসলমানের দারিদ্র্যতা খাদ্যে বা বস্ত্রে নয়, বরং দর্শনে। এবং সেটি ইসলামি দর্শনে। দর্শনই জাতীয় উন্নয়নে পাওয়ার হাউসের কাজ করে। দর্শনই বিপ্লব আনে মানুষের চরিত্রে ও কর্মে। আনে সামাজিক এ রাজনৈতিক বিপ্লব। সে দর্শনকে বেশী বেশী মানুষের কাছে পৌছানের লক্ষ্যে সে আমলের দুইটি প্রসিদ্ধ ভাষাকে তিনি কবিতার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। ফলে তাঁর প্রভাব ছিল সুদুর প্রসারী। দক্ষিণ এশিয়ার বুকে মুসলিম জাগরণে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক উর্ধে। তার মত একজন বিশাল ও উদার মনের কবিকে আজও সম্মান দেখায় বহু দেশের মানুষ। কিন্তু সে রূপ নৈতিক ও মানবিক সামর্থ ছিল না আওয়ামী বাকশালীদের। ইকবালের নামে বিশ্বের নানা দেশে নানা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তা ঘাট আছে। অথচ আওয়ামী লীগ এতটাই সংকীর্ন ও ছোট মনের যে তাঁর মত এহেন মহান ব্যক্তির নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইকবাল হল ছিল সেটি থেকে তার নাম মুছে দেয়। আর কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ? তিনি শুধু বর্তমান পাকিস্তানের নেতা ছিলেন না, ছিলেন সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমানদের নেতা। তিনি হলেন সেই মহান নেতা যিনি নানা ভাষায়, নানা আঞ্চলিকতায় ও নানা মজহাবে বিভক্ত মুসলমানদের একতাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। সে সময় এমন একতা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নইলে কি সেদিন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব হত?

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা যে উপমহাদেশের মুসলমানদের কতবড় কল্যাণ করেছে সেটি ভারতীয় মুসলমানদের পরাজিত দুরাবস্থা দেখলে কি আর বুঝতে বাঁকি থাকে? পাকিস্তান না হলে কি সম্ভব হত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা? জিন্নাহর নামেও বিশ্বের নানা দেশে নানা রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্ঠান আছে।কিন্তু মুজিব সরকার এ মহান নেতার নাম কোন প্রতিষ্ঠানেই বরদাস্ত করেনি। জিন্নাহর নাম কেটে কোথাও কোথাও মুজিবের নাম বসানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহতায়ালার কালামের উপরও আওয়ামী লীগ কাঁচি চালিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে ছিল পবিত্র কোরআনের আয়াত। আল্লাহর সে

অতি গুরুত্বপূণ বাণীটি হল "ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাযী খালাক” পড় সেই মহান প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে। এটিই হল পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী। আর এতে “পড়া” বা জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।অথচ কোন কাফের সরকার নয়,মুজিব সরকার সে আয়াতটি মুছে দেয়। যার মধ্যে সামান্য ঈমান আছে এমন কোন ব্যক্তি কি কোরআনের আয়াতের উপর হাত দিতে সাহস পায়? শেখ মুজিব ও তাঁর দল আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে এতটাই বিদ্রোহী ছিল যে সে গর্হিত কাজে সামান্যতম দ্বিধাও করেনি। দলের অন্য কোন সদস্যদের পক্ষ থেকেও কোন প্রতিবাদ উঠেনি। যে দেশের ৯০% ভাগ মানুষ মুসলমান, সে দেশের মানুষ যদি আল্লাহর এ আয়াতটিকে বরদাশত না করতে পারে তবে কি আল্লাহতায়ালা সে দেশের উপর প্রসন্ন হতে পারেন? মুসলমান রূপে এটি তো দায়িত্ব ছিল, আল্লাহর প্রতিটি আয়াতের প্রতি সম্মান দেখানো। আওয়ামী লীগ সেটি করেনি। সেটি বিলুপ্ত করে শুধু একটি আয়াতের অবমাননা করেনি,প্রচন্ড অবমাননা করেছে মহামহীমাময় মহান আল্লাহর। এই একটি মাত্র অপরাধই কি শেখ মুজিব ও তার দলের উপর আল্লাহর আযাব নাযিলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট ডলারের নোটের উপর “We trust in God” (অর্থঃ আমরা গডের উপর বিশ্বাস করি”) লিখতে লজ্জা বোধ করে না। অথচ তারা ধর্মভীরু জাতি হিসাবে পরিচিত নয়। তাই প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে কোরআনের আয়াত লিখতে শেখ মুজিব ও দলের কেন এ হীনমন্যতা? এরূপ ইসলাম- বিরোধীতাই কি তাদের ধর্ম- নিরপেক্ষতা। সেকুলারিজমকে মাথায় তুলতে গিয়ে এভাবেই তারা আল্লাহ ও তাঁর মহান বাণীর প্রতি অবমাননা বাড়িয়েছে। এরই আরেক নজির, আওয়ামী লীগ সরকার রেডিও থেকে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াতও বাদ দিয়েছিল। কিন্তু তাতে বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে ঢাকা রেডির কর্মচারীরা। ফলে জনতার রোষে পড়ার ভয়ে আওয়ামী সরকার কোরআন তেলাওয়াত পুণরায় শুরু করতে বাধ্য হয, কিন্তু শুরু হয় গীতা, বাইবেল ও ত্রিপাঠক পাঠের সাথে সমতা বিধান করে।

মুসলিম সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হল, একাকী বা সমাবেশে কাউকে দেখা মাত্র আসসালামু আলাইকুম বলা।এটি এক পবিত্র দোওয়া এবং এর অর্থঃ আপনার উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শান্তি বর্ষিত হোক। প্রতিটি ঈমানদার তাই কারো সাথে দেখা মাত্র তার প্রতি এ দোওয়া পাঠের মধ্য দিয়ে

সে অন্য কথা শুরু করে। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা এটি বলে থাকে। এই একটি মাত্র সাংস্কৃতিক উপাদানই একজন মুসলমানকে অমুসলমান থেকে আলাদা করে। মহান নবীজী (সাঃ) সেটি মুসলমানদের শিখিয়ে গেছেন। অথচ আওয়ামী লীগ ধর্মহীন একটি সেকুলার সংস্কৃতি নির্মাণ করার লক্ষ্যে নবীজীর (সাঃ) সে মহান শিক্ষা ও মুসলিম সংস্কৃতির এ মৌলিক উপাদানকেই বাদ দিয়েছিল। এ লক্ষ্যে তারা রেডিও এবং টিভি থেকে বাদ দিয়েছিল আসসালামু আলাইকুম বলা। শুরু করেছিল সুপ্রভাত জাতীয় সেকুলার শব্দ। চিন্তা- চেতনায় আওয়ামী- বাকশালী চক্র যে কতটা ইসলাম বিরোধী, এ হল তার নমুনা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই দেশের সকল ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আইন করে নিষিদ্ধ করে ইসলামের নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার যে কোন প্রচেষ্ঠা। অথচ কম্যুনিজম, সমাজবাদসহ নানা ইসলাম বিরোধী মতবাদ নিয়ে দলগড়ার ছিল পূর্ণ অধিকার।

ইসলামের প্রতি অঙ্গিকার নিয়ে বহু দল বিশ্বের নানা অমুসলিম দেশে এমনকি ভারতেও কাজ করে, অথচ সেটি নিষিদ্ধ করা হল বাংলাদেশে। এটি কি শেখ মুজিবের গণতন্ত্র প্রীতি? শেখ মুজিব যে শুধু স্বৈরাচারি ছিলেন তা নয়, মনেপ্রাণে প্রচন্ড রকমের ইসলাম বিদ্বেষীও ছিলেন। তার সে স্বৈরাচারি চেতনা থেকেই জন্ম নেয় বাকশাল এবং নিষিদ্ধ হয় সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল। আর ইসলামের প্রতি তার অন্ধ- বিদ্বেষের কারণে বাকশাল প্রতিষ্ঠার বহু আগেই নিষিদ্ধ হয় সকল ইসলামি দল। তার কর্মীরা এখনও যে লগি- বৈঠা নিয়ে রাজপথে দাড়ি- টুপিধারীদের পিটিয়ে হত্যা করে সে শিক্ষা তো তারা পেয়েছে শেখ মুজিবের ইসলাম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের প্রতি চরম ঘৃণাবোধ থেকে। মুসলমানদের মাঝে একতা গড়া ও তাদেরকে সংগঠিত করা নামায- রোযার ন্যায় ইসলামে ফরয। এব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,“তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধর, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না”-(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১০৩) এ হুকুম মহান আল্লাহর। আর এ হুকুম মোতাবেক একতাবদ্ধ হওয়া ফরয। তাই একতার যে কোন প্রয়াসই হল ইবাদত। আর বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতার যে কোন প্রয়াসই হারাম। বিভেদ সৃষ্টি তাই মহা পাপ। আল্লাহর রশি সমবেত ভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হল,কোরআনকে আঁকড়ে ধরা। দুনিয়ার বুকে কোন কিতাব যদি বিশুদ্ধ ভাবে একমাত্র আল্লাহর হয়ে থাকে,তবে সেটি আল কোরআন। এটিই মহান

আল্লাহর মহান নেয়ামত। মুসলমানের উপর দায়িত্ব হল, কোরআনের সে শিক্ষা বাস্তবায়নে জামাত বদ্ধ হওয়া। একাকী দেশ গড়া বা সমাজ গড়া দূরে থাক, একখানি ঘর গড়া বা দেওয়াল গড়াও সম্ভব নয়। ঘর গড়তে বা দেওয়াল গড়তেও অন্যের সাহায্য চাই। এজন্যই ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মানের সংগঠিত হওয়া ফরজ। কিন্তু শেখ মুজিব আইন রচনা করে আল্লাহর সে কোরআনী হুকুম পালনে বাধা দিয়েছেন। ইসলামের নামে সংঘবদ্ধ হওয়াকে দন্ডনীয় অপরাধে পরিণত করেছেন। অথচ বহু অমুসলিম দেশেও সে বিধিনিষেধ নেই। অপর দিকে পূর্ণ আজাদী দিয়েছেন দুনিয়ার সকল কুফরী তথা ইসলামবিরোধী মতবাদের অনুসারিদের সংগঠিত ও একতাবদ্ধ হওয়ার। ফলে তার আমলে নাস্তিক কম্যুনিষ্ট ও চিহ্নিত কাফেররাও পেয়েছে নিজ নিজ মত প্রচারের অবাধ সুযোগ। এবং সে সাথে সহযোগীতাও। তাদের অনেককে তিনি তার নিজ দল এবং দেশের একমাত্র দল বাকশালেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

অধ্যায় ২৩: বাংলাদেশী পত্রিকায় মুজিব- আমল

ইতিহাস রচনার নামে বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু যে মিথ্যাচার ঢুকানো হয়েছে তা নয়, মুজিব ও তার দলের দুঃশাসনের বিবরণগুলো ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে অতি সতর্কতার সাথে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং তা ছিল আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতির স্বার্থে। তবে কোন অপরাধী তার অপরাধ কর্মগুলো লুকানোর যত চেষ্টাই করুক না কেন, সম্পূর্ণ লুকাতে পারে না। সাক্ষী রেখে যায়। শেখ মুজিবও তার সহচরগণও অসংখ্য সাক্ষী রেখে গেছে। আর সেগুলি হল, সে সময়ের দেশী ও বিদেশী পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া মুজিব আমলের বিবরণ। আগামী দিনের ইতিহাস রচনায় এবিবরণগুলোই গণ্য হবে গুরুত্বপূর্ণ দলীল রূপে। শেখ মুজিব ও তার দল বাংলাদেশকে যে কতটা বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছিল সে পরিচয় পাওয়া যাবে সে আমলের ঢাকার পত্রিকাগুলো পড়লে। নিজ ঘরে নিরপত্তা না পেয়ে বহু মানুষ তখন বনেজঙ্গলে লুকিয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১৭ আগষ্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম ছিল,"নিরাপত্তার আকুতি গ্রাম- বাংলার ঘরে ঘর"। মূল খবরটি ছিল এরূপঃ "সমগ্র দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির ফলে এবং মানুষের জান- মাল ও ইজ্জতের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অভাবে গ্রাম- গঞ্জ ও শহরবাসীর মনে হতাশার মাত্রা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং আইন রক্ষাকারী সংস্থার প্রতি মানুষের আস্থা লোপ পাইতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে,চুরি- ডাকাতি, লুঠ- তরাজ তো আছেই, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক কারণে শত্রুতামূলক হত্যাকান্ডের ভয়ে মানুষ বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতেছে। যাহারা বিত্তশালী তাহারা শহরের আত্মীয়- স্বজনদের বাড়ীতে এমনকি শহরের আবাসিক হোটেগুলিতে পর্যন্ত আসিয়া উঠিতেছেন। যাঁহাদের শহরে বাস করিবার সঙ্গতি নাই,তাহার বনে- জঙ্গলে অথবা এখানে- ওখানে রাত্রি কাটাইতেছেন"।

১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের কিছু খবরের শিরোনাম ছিলঃ "ঝিনাইদহে এক সপ্তাহে আটটি গুপ্তহত্যা"(০১/০৭/৭৩); "ঢাকা- আরিচা সড়কঃ সূর্য ডুবিলেই ডাকাতের ভয়" (০২/০৭/৭৩) "বরিশালে থানা অস্ত্রশালা লুটঃ ৪ ব্যক্তি নিহত" (৪/০৭/৭৩); "পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্তঃ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লুট" (১২/০৭/৭৩); "লৌহজং থানা ও ব্যাঙ্ক লুট"(২৮/০৭/৭৩); "দুর্বৃত্তের ফ্রি

স্টাইল” (০১/০৮/৭৩); “পুলিশ ফাঁড়ি ও বাজার লুটঃ লঞ্চ ও ট্রেনে ডাকাতি”(৩/০৮/৭৩); “এবার পাইকারীহারে ছিনতাইঃ সন্ধা হইলেই শ্মশান”(১১/০৮/৭৩);“চট্টগ্রামে ব্যাংক ডাকাতি,লালদীঘিতে গ্রেনেড চার্জে ১৮ জন আহত, পাথরঘাটায় রেঞ্জার অফিসের অস্ত্র লুট” (১৫/০৮/৭৩); “খুন ডাকাতি রাহাজানিঃ নোয়াখালীর নিত্যকার ঘটনা,জনমনে ভীতি” (১৬/০৮/৭৩); “২০ মাসে জামালপুরে ১৬১৮টি ডাকাতি ও হত্যাকান্ড” (১৭/১১/৭৩); “আরও একটি পুলিশক্যাম্প লুটঃ সুবেদরসহ ৩ জন পুলিশ অপহৃত” (১৩/০৭/৭৩); “যশোরে বাজার লুটঃ দুর্বৃত্তের গুলীতে ২০ জন আহত” (১৮/০৪/৭৪); “রাজশাহীতে ব্যাংক লুট” (২১/4/৭৪) মুজিব আমলের পত্রিকাগুলো পড়লে চোখে পড়বে এরূপ হাজার হাজার ঘটনা ও বহু হাজার বিয়োগান্ত খবর।

পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে দুর্বৃত্তির যত না ঘটনা ঘটেছে মুজিবের ৪ বছরে তার চেয়ে বহু গুণ বেশী ঘটেছে। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে “ভিক্ষার ঝুলী”-এ খেতাব জুটিনি, কিন্তু মুজিব সেটি অর্জন করেছে। অথচ কিছু কাল আগেও গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষের গৃহে কাঠের দরজা-জানালা ছিল না। ঘরের দরজায় চট বা চাটাই টানিয়ে অধিকাংশ মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে রাত কাটাতো। কিন্তু মুজিব শুধু খাদ্যই নয়,সে নিরাপত্তাটুকুও কেড়ে নেয়। নিরাপত্তার খোঁজে তাদেরকে ঘর ছেড়ে বন-জঙ্গলে আশ্রয় খুঁজতে হয়। থানা পুলিশ কি নিরাপত্তা দিবে? তারা নিজেরাই সেদিন ভুগেছিল চরম নিরাপত্তাহীনতায়। দুর্বত্তদের হাতে তখন বহু থানা লুট হয়েছিল। বহু পুলিশ অপহৃত এবং নিহতও হয়েছিল। মুজিবের নিজের দলীয় কর্মীদের সাথে তার নিজের পুত্রও নেমেছিল দুর্বৃত্তিতে। সে সময় দৈনিক পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছিলঃ “স্পেশাল পুলিশের সাথে গুলী বিনিময়ঃ প্রধানমন্ত্রীর তনয়সহ ৫ জন আহত”। মূল খবরটির ছাপা হয়েছিল এভাবেঃ “গত শনিবার রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকার কমলাপুর স্পেশাল পুলিশের সাথে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রধানমন্ত্রী তনয় শেখ কামাল,তার ৫ জন সাঙ্গপাঙ্গ ও একজন পুলিশ সার্জেন্ট গুলীবিদ্ধ হয়েছে। শেখ কামাল ও তার সঙ্গীদেরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নয়,দশ ও তেত্রিশনম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে। আহত পুলিশ সার্জেন্ট জনাব শামীম কিবরিয়াকে ভর্তি করা হয় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে।” -(গণকন্ঠ ১৯/১২/৭৩)

ছাত্রলীগের ক্যাডারগণ প্রকাশ্য মানুষ খুন করত -সে বিবরণ বহু পত্রিকায় বহু ভাবে এসেছে। যাদেরকে আওয়ামী লীগ বাঙালীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে তুলে ধরছে এ ছিল তাদের আসল চরিত্র। বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর এসেছে তিনবার। এর মধ্যে দুই বার এসেছে ব্রিটিশ আমলে। এবং তা ১৭৬১ সালে এবং ১৯৪৩ সালে। তৃতীয়বার এসেছে মুজিব আমলে। পাকিস্তানী আমলে একবারও আসেনি। অথচ এ পাকিস্তান আমলটিকেই আওয়ামী-বাকশালী বুদ্ধিজীবী ও নেতা-কর্মীগণ চিত্রিত পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপনিবেশিক শোষনের আমল রূপে। অথচ ১৯৪৭-এ পাকিস্তান আমলের শুরুটি হয়েছিল অনেকটা শূন্য থেকে। তখন অফিস আদালত ছিল না, কলকারখানা ছিল না। সহযোগী প্রতিবেশীও ছিল না। বরং ছিল ভারত থেকে তাড়া খাওয়া লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের ভিড়। মুজিবামলের ন্যায় সেসময় বিদেশ বিদেশ থেকে শত শত কোটি টাকার সাহায্যও আসেনি। কিন্তু সে দিন কোন দুর্ভিক্ষ আসেনি। অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ এসেছিল মুজিবামলে। দুর্ভিক্ষ এসেছিল শেখ মুজিবের দূর্নীতি পরায়ন প্রশাসন এবং দলীয় ও ভারতীয় লুটপাটের কারণে।

সে সময়ে ঢাকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু খবরের দিকে নজর দেওয়া যাক। বাংদেশের ৭০ জন বিশিষ্ঠ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেনঃ বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সঙ্কট অতীতের সর্বাপেক্ষা জরুরী সঙ্কটকেও দ্রুতগতিতে ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং ১৯৪৩ সনের সর্বগ্রাসী মন্বন্তর পর্যায়ে পৌছাইয়া গিয়াছে।তাঁহারা সরকারের লঙ্গরখানার পরিবেশকে নির্যাতন কেন্দ্রের পরিবেশের শামিল বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেনঃ “দুর্ভিক্ষ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর অবাধ লুন্ঠন ও সম্পদ-পাচারের পরিণতি”। তাঁরা বলেনঃ “খাদ্য ঘাটতি কখনও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হইতে পারে না। সামান্যতম খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রেও শুধু বন্টন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যায়। যদি দেশের উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থা নিম্নতম ন্যায়নীতি উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত,দেশের প্রশাসন,ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিচারকে নিশ্চিত করার সামান্যতম আন্তরিক চেষ্টাও থাকিত তাহা হইলে যুদ্ধের তিন বছর পর এবং

দুই হাজার কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক সাহায্যের পর ১৯৭৪ সনের শেষার্ধে আজ বাংলাদেশে অন্ততঃ অনাহারে মৃত্যুর পরিস্থিতি সৃষ্টি হইত না।" (ইত্তেফাক, অক্টোবর ১, ১৯৭৪) সে সময়ের পত্রিকার কিছু শিরোনাম ছিলঃ "চালের অভাবঃ পেটের জ্বালায় ছেলেমেয়ে বিক্রি"-(গণকন্ঠ আগষ্ট ২৩,১৯৭২) "লাইসেন্স- পারমিটের জমজমাট ব্যবসা; যাঁতাকলে পড়ে মানুষ খাবি খাচ্ছে; সিরাজগঞ্জ, ফেণী, ভৈরব, ইশ্বরগঞ্জ ও নাচোলে তীব্র খাদ্যাভাব,অনাহারী মানুষের আহাজারীঃ শুধু একটি কথা, খাবার দাও"-(গণকণ্ঠ আগস্ট ২৯,১৯৭২) "গরীব মানুষ খাদ্য পায় নাঃ টাউটরা মজা লুটছে; গুণবতীতে চাল আটা নিয়ে হরিলুটের কারবার"-(গণকন্ঠ সেপ্টেম্বর ১৯,১৯৭২) "একদিকে মানুষ অনাহারে দিন যাপন করিতেছেঃ অপরদিকে সরকারি গুদামের গম কালোবাজারে বিক্রয় হইতেছে"-(ইত্তেফাক এপ্রিল ৭,১৯৭৩); "এখানে ওখানে ডোবায় পুকুরে লাশ।"(সোনার বাংলা এপ্রিল ১৫,১৯৭৩); "চালের অভাবঃ পেটের জ্বালায় ছেলেমেয়ে বিক্রি; হবিগঞ্জে হাহাকারঃ অনাহারে এ পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু"-(গণকন্ঠ মে ৩,১৯৭৩); "কোন এলাকায় মানুষ আটা গুলিয়া ও শাক- পাতা সিদ্ধ করিয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করিতেছে"-(ইত্তেফাক মে ৩,১৯৭৩); "অনাহারে দশজনের মৃত্যুঃ বিভিন্নস্থানে আর্ত মানবতার হাহাকার; শুধু একটি ধ্বনিঃ ভাত দাও"-(গণকন্ঠ মে ১০,১৯৭৩); "লতাপতা, গাছের শিকড়, বাঁশ ও বেতের কচি ডগা, শামুক, ব্যাঙার ছাতা, কচু- ঘেচু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যে পরিণতঃ গ্রামাঞ্চলে লেংটা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি"-(ইত্তফাক মে ১০,১৯৭৩); "পটুয়াখালীর চিঠিঃ অনাহারে একজনের মৃত্যু;সংসার চালাতে না পেরে আত্মহত্যা"-(গণকন্ঠ মে ১০, ১৯৭৩); "ওরা খাদ্যভাবে জর্জরিতঃ বস্ত্রাভাবে বাহির হইতে পারে না"-(ইত্তেফাক মে ৩০,১৯৭৩) "আত্মহত্যা ও ইজ্জত বিক্রির করুণ কাহিনী"-(গণকন্ঠ জুন ১,১৯৭৩) "স্বাধীন বাংলার আরেক রূপঃ জামাই বেড়াতে এলে অর্ধ- উলঙ্গ শ্বাশুরী দরজা বন্ধ করে দেয়"- (সোনার বাংলা জুলাই ১৫,১৯৭৩) "গ্রামবাংলায় হাহাকার, কচু- ঘেচুই বর্তমানে প্রধান খাদ্য"-(ইত্তেফাক এপ্রিল,১৯৭৪); "দুঃখিনী বাংলাকে বাঁচাও"-(ইত্তেফাক আগষ্ট ৪,১৯৭৪); "জামালপুরে অনাহারে ১৫০ জনের মৃত্যুর খবর"-(ইত্তেফাক আগষ্ট ১৩,১৯৭৪) "১০দিনে জামালপুর ও ঈশ্বরদীতে অনাহার ও অখাদ্য- কুখাদ্য খেয়ে ৭১ জনের মৃত্যু"-(গণকন্ঠ আগস্ট ২৭, ১৯৭৪)

১৯৭২ সনের ২১ অক্টোবর তারিখে দৈনিক গণকন্ঠে একটি খবর ছিলঃ "পেটের দায়ে কন্যা বিক্রি"। ভিতরে সংবাদটি ছিল এরকমঃ "কিছুদিন পূর্বে কুড়িগ্রাম পৌরসভার সন্নিকটস্থ মন্ডলের হাটনিবাসী রোস্তম উল্লাহর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন তার আদরের দুলালী ফাতেমা খাতুনকে (৭ বছর) পৌরসভার জনৈক পিয়ন জমির উদ্দীনের কাছে মাত্র ছয় টাকায় বিক্রি করে দেয়"।১৯৭৩ সালে ৮ই জুলাই সোনার বাংলা "ফেন চুরি" শিরোনামায় এ খবরটি ছাপেঃ "বাঁচার তাগিদে এক মালসা ফেন। দু'দিন না খেয়ে থাকার পর এক বাড়ীর রান্না ঘর থেকে ফেন চুরি করলো সে। চুরি করে ধরা পড়লো। শুকনো মুখো হাড্ডীসার ছেলেটির গালে ঠাশ ঠাশ পড়লো সজোরে থাপ্পর। চোখে অন্ধকার দেখলো সে এবং মাথা ঘুরে পড়ে গেল। গ্রামের নাম দরগাপুর, থানা আশাশুনি,জেলা খুলনা। গাজী বাড়ির বাচ্চা। বয়স সাত- আট বছর। গুটি বসন্তে পিতা মারা গেছে। মা কাজ করে যা পায় তাতে কোলের ভাই- বোন দুটোর হলেও বাকী দুই বোন আর বাচ্চার হয় না। বাচ্চা তাই প্রতিদিন একটা ভাড়া নিয়ে বের হয়। দ্বারে দ্বারে ফেন মাগে, এই ভাবেই তিন ভাই বোন চলে"। ১৯৭৪ সনের ২৩শে মার্চ ইত্তেফাক খবর ছাপে, "মরা গরুর গোশত খাইয়া ভোলা মহকুমার বোরহানুদ্দিন থানার ১০ ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং ৬০ জন অসুস্থ্য হইয়া পড়িয়াছে, -এই খবরে বিস্মিত হইবার না ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিবার কিছু নাই। স্বয়ং সরকারদলীয় স্থানীয় এম. পি.সাংবাদিকদের এই খবর দিয়াছেন। জান বাঁচানোর জন্য মানুষ মরা গরু খাইতে আরম্ভ করিয়াছে,তবু বাঁচিতে পারিতেছে না, বরং মরা গরুর গোশত খাইয়া আরও আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। এ খবর বড় মর্মান্তিক, বড় সাংঘাতিক"।

১৯৭৪ সালের ৪ আগষ্ট সোনার বাংলায় ছাপা হয়, "ঢোল পিটিয়ে মানুষ বিক্রিঃ মানবশিশু আজ নিত্য দিনের কেনা- বেচার পণ্য"। মূল খবরটা ছিল এরূপঃ "হাটের নাম মাদারীগঞ্জ। মহকুমার নাম গাইবান্ধা। সেই মাদারীগঞ্জ হাটে ঘটেছে একটা ঘটনা। একদিন নয়, দু'দিন। ১০ই এবং ১৩ই জুলাই। ১০ই জুলাই এক হাটে এক ব্যক্তি মাত্র একশ টাকার বিণিময়ে তার ৬/৭ বছরের শিশু পুত্রকে বিক্রি করে। দ্বিতীয় দিনে ১৩ জুলাই একই হাটে ৫- ৬ বছর বয়সের একটি মেয়ে বিক্রি হয়েছে মাত্র ২৮ টাকায়। প্রথমে বাজারে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয় মেয়ে বিক্রি করার ঘোষণা। ঢোল পিটানোর

মেয়ে কিনতে ও দেখতে অনেক লোক জমা হয়। অবশেষে আটাশ টাকা দামে মেয়েটি বিক্রি হয়”।

সে সময়ে প্রকাশিত বহু খবরের মধ্যে এ খবরগুলিও ছাপা হয়ঃ ঈশ্বরদীতে ৬ কোটি টাকার তামার তার বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। দু'চার জন যারা ধরা পড়েছে, এবং তারা সবাই মুজিব বাহিনীর লোক। তারা পুলিশ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী (পূর্বদেশ: ১১ মে, ১৯৭২) পটুয়াখালী থানার বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতির হিড়িক পড়ে গেছে। কোন গ্রাম- বন্দরে দিনের বেলা ডাকাতি হয়। পুলিশকে খবর দিলে শেষ করে দেব বলে ভয় দেখায়। ফলে থানায় খবু কমই এজাহার হয়। ডাকাতদের দু'একজন এলএমজি হাতে থানার গেটে মোতায়েন থাকে যাতে দারগা- পুলিশ ডাকাতদের জারিক্রিত কারফিউ লংঘন করতে না পারে। - (পূর্বদেশ : ৩১ মে '১৯৭২) সম্প্রতি পাবনার সুজানগর থানাধীন ছয়টি গ্রামের ১১৮টি বাড়িতে ডাকাতি সংঘটিত হয়। পাবনার পল্লীর লোকগুলো বাড়ি- ঘর ছেড়ে জঙ্গলে রাত কাটায়। (দৈনিক বাংলা : ৩০ আগষ্ট ১৯৭২) দিনমজুর ছাবেদ আলীর স্ত্রী মাত্র ৫ টাকা দামে পেটের দায়ে তার সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। (সাপ্তাহিক বিচিত্রা: ২০ জুলাই '১৯৭৩) শেষ পর্যন্ত শ্রীমঙ্গলের হেদায়েত উল্লাহকে কাফন ছাড়াই কলাপাতার কাফনে কবরখানায় যেতে হল (বঙ্গবার্তা: ৪ অক্টোবর ১৯৭৩) দেশের ঘরে ঘরে যখন বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার তখন বৈদেশিক মুদ্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের তাস আমদানি করা হয়েছে। (বঙ্গবার্তা: ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৩) স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৪ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভারতে পাচার হয়ে গেছে। - (জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খানের বক্তৃতা: ২৭ জানুয়ারি '১৯৭৪) কয়েকদনি আগে জয়পুরহাটের মাংলীপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের কবর থেকে কাফন চুরি হয়ে গেছে। - (সাপ্তাহিক অভিমত : ২৭ মে ১৯৭৪)

আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের সচিব বলেছেন, ১৯৭৩ সালের জুন থেকে ১৯৭৪ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরে ঢাকা শহরে তারা ১৪০০ বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে। আর ১৯৭৪ এর জুলাই হতে১৯৭৫ এর জুলাই পর্যন্ত দাফন করেছে ৬২৮১টি বেওয়ারিশ লাশ। - (ইত্তেফাক: ২১ অক্টোবর ১৯৭৫) সারা দেশে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রতি ৪৮ ঘন্টায় একজনের আত্মহত্যা। - (হক কথা : ১৯ মে ১৯৭৪) গাইবান্ধায়

ওয়াগন ভর্তি ৬শ' মণ চাল লুট। রংপুরে ভুখা মিছিল।- (আমাদের কথা : ১৯ এপ্রিল ১৯৭৪) ক্ষুধার্ত মানুষের ঢলে ঢাকার রাজপথ নরকতুল্য। - (হলিডে: ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

১৯৭৪ সালে ৮ই সেপ্টম্বর সোনার বাংলা আরেকটি ভয়ানক খবর ছাপে। খবরের শিরোনাম ছিলঃ“রেকর্ড সৃষ্টিকারী খবরঃ “জঠর জ্বালায় বমি ভক্ষণ”। খবরে বলা হয়,একজন অসুস্থ্য ব্যক্তি গাইবান্ধার রেলওয়ে প্রচুর পরিমাণে বমি করে। বমির মধ্যে ছিল ভাত ও গোশত। দু’জন ক্ষুধার্থ মানুষ জঠর জ্বালা সংবরণ করতে না পেয়ে সেগুলো গোগ্রাসে খেয়ে ফেলেছে। ১৯৭৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইত্তেফাকের একটি খবরের শিরোনাম ছিলঃ “রাজধানীর পথে পথে জীবিত কংকাল।” উক্ত শিরোনামে ভিতরের বর্ননা ছিলঃ “শীর্নকায় কঙ্কালসার আদম সন্তান। মৃত না জীবিত বুঝিয়া ওঠা দুস্কর। পড়িয়া আছে রাজধানী ঢাকা নগরীর গলি হইতে রাজপথের এখানে সেখানে। হাড় জিরজিরে বক্ষে হাত রাখিয়াই কেবল অনুভব করা যায় ইহারা জীবিত না মৃত।”১৯৭৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক খবরের শিরোনাম দেয়, “ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচীৎকারে ঘুম ভাংগে”।খবরটি ছিল,“নিরন্ন, অভুক্ত,অর্ধভুক্ত,অর্ধনগ্ন ও কঙ্কালসার অসহায় মানুষের আহাজারি ও ক্ষুধার্ত শিশুর আর্তচীৎকারে এখন রাজধানীর সমস্যা পীড়িত মানুষের ঘুম ভাঙ্গে। অতি প্রত্যুষে হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে করুণ আর্তিঃ “আম্মা! একখানা রুটি দ্যান। গৃহিনীর কখনো বিরক্ত হন,আবার কখনও আদম সন্তানের এহেন দুর্দশা দেখিয়া অশ্রুসজল হইয়া ওঠেন”।

এ এক হৃদয়বিদারক চিত্র!বাংলাদেশের হাজারো বছরের ইতিহাসে বহু শাসক, বহু রাজা- বাদশাহ ক্ষমতায় বসেছে। সুলতানী আমল এসেছে, মোঘল আমল এসেছে, এসেছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল। কিন্তু কোন আমলেও কি মানুষকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে এতটা নীচে নামতে হয়েছে যা হয়েছে মুজিব আমলে? বাংলা এক কালে সোনার বাংলা রূপে পরিচিত ছিল। দেশটিতে এক সময় প্রচুর প্রাচুর্য ছিল। শেখ মুজিব পাকিস্তান আমলে প্রশ্ন তুলেছেন, “সোনার বাংলা শ্মশান কেন?” পাকিস্তানী শাসকবর্গ সোনার বাংলাকে শ্মশান করেছে - এ অভিযোগ এনে লাখো লাখো পোস্টার ছেপে ১৯৭০- এর নির্বাচন কালে দেশ জুড়ে বিতর করা হয়েছিল।আর এভাবে পরিকল্পিত ভাবে মানুষকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো হয়েছিল।

হল,পাকিস্তান আমলে অভাবের তাড়নায় কোন মহিলাকে কি মাছধরা ঝাল পড়তে হয়েছে? কাউকে কি ক্ষুধার তাড়নায় বমি খেতে হয়েছে? কাউকে কি নিজ সন্তান বিক্রি করতে হয়েছে? এরূপ কোন ঘটনা পাকিস্তান আমলে হয়নি। সে সময় দেশ শ্মশান ছিল না,বরং সে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে খোদ মুজিবের শাসনামলে।এজন্যই মুজিবের মৃত্যুতে ঢাকায় শোক মিছল হয়নি।সেদিন কেউ কোন কালো ব্যাজও ধারণ করেনি।বরং তার নিজের দলের লোকেরা পর্যন্ত মুজিবের লাশ সিড়ির নীচে ফেলে মন্ত্রীত্বের শপথ নিয়েছেন।

অধ্যায় ২৪: বিদেশী পত্র- পত্রিকায় শেখ মুজিব

বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাসে মুজিবের আসল পরিচয় পাওয়া মুশকিল। আওয়ামী বাকশালীদের রচিত ইতিহাসে রয়েছে নিছক মুজিবের বন্দনা। তাই তার এবং তার শাসনামলের প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে পড়তে হবে সে আমলের বিদেশী পত্র- পত্রিকা। বাংলাদেশ সে সময় কোন ব্যবসা- বাণিজ্য, শিল্প- সাহিত্য, জ্ঞান- বিজ্ঞান বা খেলাধুলায় চমক সৃষ্টি করতে না পারলেও বিশ্বব্যাপী খবরের শিরোনাম হয়েছিল দুর্ভিক্ষ, দূর্নীতি, হত্যা, সন্ত্রাস, ব্যর্থ প্রশাসন ও স্বৈরাচারের দেশ হিসাবে। ১৯৭৪ সালের ৩০ শে মার্চ গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছিল, “আলীমুদ্দিন ক্ষুধার্ত। সে ছেঁড়া ছাতা মেরামত করে। বলল,যেদিন বেশী কাজ মেলে, সেদিন এক বেলা ভাত খাই। যেদিন তেমন কাজ পাই না সেদিন ভাতের বদলে চাপাতি খাই। আর এমন অনেক দিন যায় যেদিন কিছুই খেতে পাই না।” তার দিকে এক নজর তাকালে বুঝা যায় সে সত্য কথাই বলছে। সবুজ লুঙ্গীর নীচে তার পা দুটিতে মাংস আছে বলে মনে হয় না।

ঢাকার ৪০ মাইল উত্তরে মহকুমা শহর মানিকগঞ্জ। ১৫ হাজার লোকের বসতি। তাদের মধ্যে আলীমুদ্দিনের মত আরো অনেকে আছে। কোথাও একজন মোটা মানুষ চোখে পড়ে না। কালু বিশ্বাস বলল, “আমাদের মেয়েরা লজ্জায় বের হয় না- তারা নগ্ন।” আলীমুদ্দিনের কাহিনী গোটা মানিকগঞ্জের কাহিনী। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাহিনী,শত শত শহর বন্দরের কাহিনী। এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে ৫০ লাখ টনেরও বেশী খাদ্যশস্য

বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য পাঠানো হয়েছে তারা পায়নি।”

১৯৭৪ সালের ২৭ সেপ্টম্বর তারিখে লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান লিখেছিল,

“বাংলাদেশ আজ বিপদজনক ভাবে অরাজকতার মুখোমুখি। লাখ লাখ লোক ক্ষুধার্ত। অনেকে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। .. ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড়ে ঢাকায় দম বন্ধ হয়ে আসে।.. বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া। গত আঠার মাসে চালের দাম চারগুণ বেড়েছে। সরকারি কর্মচারিদের মাইনের সবটুকু চলে যায় খাদ্য- সামগ্রী কিনতে। আর গরীবরা থাকে অনাহারে। কিন্তু বিপদ যতই ঘনিয়ে আসছে শেখ মুজিব ততই মনগড়া জগতে আশ্রয় নিচ্ছেন। ভাবছেন, দেশের লোক এখনও তাঁকে ভালবাসে;সমস্ত মুসিবতের জন্য পাকিস্তানই দায়ী। আরো ভাবছেন, বাইরের দুনিয়ী তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ উদ্ধার পাবে। নিছক দিবাস্বপ্ন.. দেশ যখন বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে,তখনও তিনি দিনের অর্ধেক ভাগ আওয়ামী লীগের চাঁইদের সাথে ঘরোয়া আলাপে কাটাচ্ছেন। .. তিনি আজ আত্মম্ভরিতার মধ্যে কয়েদী হয়ে চাটুকার ও পরগাছা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।.. সদ্য ফুলে- ফেঁপে ওঠা তরুণ বাঙালীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা বেশ ভালই আছে। এরাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা- বাংলাদেশের বীর বাহিনী। .. এরাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের বাছাই করা পোষ্য। আওয়ামী লীগের ওপর তলায় যারা আছেন তারা আরো জঘন্য। .. শুনতে রূঢ় হলেও কিসিঞ্জার ঠিকই বলেছেনঃ “বাংলাদেশ একটা আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি।”

১৯৭৪ সালে ২রা অক্টোবর,লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় জেকুইস লেসলী লিখেছিলেন,

“একজন মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে,আর অসহায় দৃষ্টিতে তার মরণ- যন্ত্রণাকাতর চর্মসার শিশুটির দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস হতে চায় না, তাই কথাটি বোঝাবার জন্য জোর দিয়ে মাথা নেড়ে একজন ইউরোপীয়ান বললেন, সকালে তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন,এমন সময় এক ভিখারি এসে হাজির। কোলে তার মৃত শিশু। ..বহু বিদেশী পর্যবেক্ষক মনে করেন বর্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী। “দুর্ভিক্ষ বন্যার ফল ততটা নয়,যতটা

মজুতদারী চোরাচালানের ফল”-বললেন স্থানীয় একজন অর্থনীতিবিদ।.. প্রতি বছর যে চাউল চোরাচালন হয়ে (ভারতে) যায় তার পরিমাণ ১০ লাখ টন।”

১৯৭৪ সালের ২৫ অক্টোবর হংকং থেকে প্রকাশিত ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক রিভিয়্যূ পত্রিকায় লরেন্স লিফঅসুলজ লিখেছিলেন,

সেপ্টেম্বর তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ করে চাউলের দাম মণ প্রতি ৪০০ টাকায় উঠে গেল। অর্থাৎ তিন বছরে আগে - স্বাধীনতার পূর্বে যে দাম ছিল - এই দাম তার দশ গুণ। এই মূল্যবৃদ্ধিকে এভাবে তুলনা করা যায় যে, এক মার্কিন পরিবার তিন বছর আগে যে রুটি ৪০ সেন্ট দিয়ে কিনেছে,তা আজ কিনছে ৪ পাউন্ড দিয়ে। কালোবাজারী অর্থনীতির কারসাজিতেই এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।.. ২৩শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, “প্রতি ইউনিয়নে একটি করে মোট ৪,৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হবে।" প্রতি ইউনিয়নের জন্য রোজ বরাদ্দ হল মাত্র দুমন ময়দা। যা এক হাজার লোকের প্রতিদিনের জন্য মাথাপিছু একটি রুটির জন্যও যথেষ্ট নয়।”

নিউয়র্ক টাইমস পত্রিকা ১৯৭৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে লিখেছিলঃ

জনৈক কেবিনেট মন্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে একজন বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ বললেন,“যুদ্ধের পর তাঁকে (ঐ মন্ত্রীকে) মাত্র দুই বাক্স বিদেশী সিগারেট দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যেত, এখন দিতে হয় অন্ততঃ এক লাখ টাকা।” ব্যবসার পারমিট ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগারদের ঘুষ দিতে হয়। সম্প্রতি জনৈক অবাঙ্গালী শিল্পপতী ভারত থেকে ফিরে আসেন এবং শেখ মুজিবের কাছ থেকে তার পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানাটি পুনরায় চাল করার অনুমোদন লাভ করেন। শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ মনি - যিনি ঐ কারখানাটি দখল করে আছেন- হুকুম জারি করলেন যে তাকে ৩০ হাজার ডলার দিতে হবে। শেখ মুজিবকে ভাল করে জানেন এমন একজন বাংলাদেশী আমাকে বললেন, “লোকজন তাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করুক, এটা তিনি পছন্দ করেন। তাঁর আনুগত্য নিজের পরিবার ও আওয়ামী লীগের প্রতি। তিনি বিশ্বাসই করেন না যে, তারা দুর্নীতিবাজ হতে পারে কিংবা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।”

দেখা যাক,প্রখ্যাত তথ্য- অনুসন্ধানী সাংবাদিক জন পিলজার ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লন্ডনের ডেইলী মিরর পত্রিকায় লিখেছেনঃ

“একটি তিন বছরের শিশু - এত শুকনো যে মনে হল যেন মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে। আমি তার হাতটা ধরলাম। মনে হল তার চামড়া আমার আঙ্গুলে মোমের মত লেগে গেছে। এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে,বিশ্বস্বাস্থ্ সংস্থার মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্ন দেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।”

পিলজারের সে বক্তব্য এবং বিশ্বস্বাস্থ সংস্থার সে অভিমতের প্রমাণ মেলে ইত্তেফাকের একটি রিপোর্টে। উত্তর বংগের এক জেলেপাড়ার বস্ত্রহীন বাসন্তি জাল পড়ে লজ্জা ঢেকেছিল। সে ছবি ইত্তেফাক ছেপেছিল। পিলজার আরো লিখেছেন,

“সন্ধা ঘনিয়ে আসছে এবং গাড়ী আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম- এর লরীর পিছনে পিছনে চলেছে। এই সমিতি ঢাকার রাস্তা থেকে দুর্ভিক্ষের শেষ শিকারটিকে কুড়িয়ে তুলে নেয়। সমিতির ডাইরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানালেন,“স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়ত কয়েক জন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি। কিন্তু এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি- সবই অনাহার জনিত মৃত্যু।”

লন্ডনের “ডেইলী টেলিগ্রাফ” ১৯৭৫ সালের ৬ই জানুয়ারী ছেপেছিল,
“গ্রাম বাংলায় প্রচুর ফসল হওয়া সত্ত্বেও একটি ইসলামিক কল্যাণ সমিতি (আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম) গত মাসে ঢাকার রাস্তা,রেল স্টেশন ও হাসাপাতালগুলোর মর্গ থেকে মোট ৮৭৯টি মৃতদেহ কুড়িয়ে দাফন করেছে। এরা সবাই অনাহারে মরেছে। সমিতিটি ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে ২৫৪৩টি লাশ কুড়িয়েছে- সবগুলি বেওয়ারিশ। এগুলোর মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশী রাস্তা থেকে কুড়ানো। ডিসেম্বরের মৃতের সংখ্যা জুলাইয়ের সংখ্যার সাতগুণ।.. শেখ মুজিবকে আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বোঝা বলে আখ্যায়ীত হচ্ছে। ছোট- খাটো স্বজনপ্রাতির ব্যাপারে তিনি ভারী আসক্তি দেখান। ফলে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বাকী পড়ে থাকে।.. অধিকাংশ পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট রোধ করার কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এ সরকারের নেই। রাজনৈতিক মহল মনে করেন,মুজিব খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ আরো নষ্ট করে দেবেন। তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছেন। ডেইলী টেলিগ্রাফের আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। জরুরী অবস্থা জারি করেছেন,আরো বেশী ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। অবশেষে তাতেও খুশি হননি,সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে তিনি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আওয়ামী লীগ যাকে নিয়ে গর্ব করে,এ হল তার অবদান।

১৯৭৫ সালের ২১শে মার্চ বিলেতের ব্রাডফোর্ডশায়র লিখেছিল,

"বাংলাদেশ যেন বিরাট ভূল। একে যদি ভেঙ্গে- চুরে আবার ঠিক করা যেত। জাতিসংঘের তালিকায় বাংলাদেশ অতি গরীব দেশ। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে যখন বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দেশের দক্ষিণ অঞ্চল ডুবে যায় তখন দুনিয়ার দৃষ্টি এ দেশের দিকে - অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নিবদ্ধ হয়। রিলিফের বিরাট কাজ সবে শুরু হয়েছিল। এমনি সময়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠল। --কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ যখন শুরু হল, তখন জয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। একমাত্র ভারতের সাগ্রহ সামরিক হস্তক্ষেপের ফলেই স্বল্পস্থায়ী- কিন্তু ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী- যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়।" পত্রিকাটি লিখেছে, "উড়োজাহাজ থেকে মনে হয়, যে কোন প্রধান শহরের ন্যায় রাজধানী ঢাকাতেও বহু আধুনিক অট্রালিকা আছে। কিন্তু বিমান বন্দরে অবতরণ করা মাত্রই সে ধারণা চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে যায়। টার্মিনাল বিল্ডিং- এর রেলিং ঘেঁষে শত শত লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে,কেননা তাদের অন্য কিছু করার নাই। আর যেহেতু বিমান বন্দর ভিক্ষা করবার জন্য বরাবরই উত্তম জায়গা।"

পত্রিকাটি আরো লিখেছে, "আমাকে বলা হয়েছে, অমুক গ্রামে কেউ গান গায়না। কেননা তারা কি গাইবে? আমি দেখেছি, একটি শিশু তার চোখে আগ্রহ নেই, গায়ে মাংস নেই। মাথায় চুল নাই। পায়ে জোর নাই। অতীতে

তার আনন্দ ছিল না, বর্তমান সম্পর্কে তার সচেতনতা নাই এবং ভবিষ্যতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে।"

দেশে তখন প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ চলছিল। হাজার হাজার মানুষ তখন খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছিল। মেক্সিকোর "একসেলসিয়র" পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবকে যখন প্রশ্ন করা হল, খাদ্যশস্যের অভাবের ফলে দেশে মৃত্যুর হার ভয়াবহ হতে পারে কিনা,
শেখ মুজিব জবাব দিলেন, "এমন কোন আশংকা নেই।"
প্রশ্ন করা হল, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,পার্লামেন্টে বিরোধীদল বলেন যে, ইতিমধ্যেই ১৫ হাজার মানুষ মারা গেছে।"
তিনি জবাব দিলেন, "তারা মিথ্যা বলেন।"
তাঁকে বলা হল, "ঢাকার বিদেশী মহল মৃত্যু সংখ্যা আরও বেশী বলে উল্লেখ করেন।"
শেখ মুজিব জবাব দিলেন, "তারা মিথ্যা বলেন।"
প্রশ্ন করা হল,দূর্নীতির কথা কি সত্য নয়? ভূখাদের জন্য প্রেরিত খাদ্য কি কালোবাজারে বিক্রী হয় না..?
শেখ বললেন, "না। এর কোনটাই সত্য নয়।"
(এন্টার প্রাইজ, রিভার সাইড, ক্যালিফোর্নিয়া, ২৯/০১/৭৫)

বাংলাদেশ যে কতবড় মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুর ব্যক্তির কবলে পড়েছিল এ হল তার নমুনা। দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে,সে দুর্ভিক্ষে হাজার মানুষ মরছে সেটি তিনি মানতে রাজী নন। দেশে কালোবাজারী চলছে,বিদেশ থেকে পাওয়া রিলিফের মাল সীমান্ত পথে ভারতে পাড়ী জমাচ্ছে এবং সীমাহীন দূর্নীতি চলছে সেটি বিশ্ববাসী মানলেও তিনি মানতে চাননি। অবশেষে পত্রিকাটি লিখেছে,

"যে সব সমস্যা তার দেশকে বিপর্যস্ত করত সে সবের কোন জবাব না থাকায় শেখের একমাত্র জবাব হচ্ছে তাঁর নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্ধি। জনসাধারণের জন্য খাদ্য না হোক,তার অহমিকার খোরাক চাই।"(এন্টার প্রাইজ,রিভার সাইড, ক্যালিফোর্নিয়া, ২৯/০১/৭৫)

শেখ মুজিব যখন বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন তখন লন্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফে পীটার গীল লিখেছিলেন,

“বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশ থেকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। গত শনিবার ঢাকার পার্লামেন্টের (মাত্র) এক ঘন্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাশীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদল দাবী করেছিল,এ ধরণের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাশ করলেন যে,এ ব্যাপারের কোন বিতর্ক চলবে না। .. শেখ মুজিব এম.পি.দের বললেন, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল “ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান”। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে “ঔপনিবেশিক ও দ্রুত বিচার ব্যহতকারী” বলে অভিযুক্ত করলেন।”

অথচ পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব ও তাঁর আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পদ্ধতির গণতন্ত্রের জন্য কতই না চিৎকার করেছেন। তখন পাকিস্তানে আইউবের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গনতন্ত্রই তো ছিল। গণতন্ত্রের নামে আওয়ামী লীগের পতাকা তলে যে কতটা মেরুদন্ডহীন ও নীতিহীন মানুষের ভীড় জমেছিল সেটিও সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল। এত দিন যারা গণতন্ত্রের জন্য মাঠঘাট প্রকম্পিত করত তারা সেদিন একদলীয় স্বৈরাচারি শাসন প্রবর্তনের কোন রূপ বিরোধীতাই করল না। বরং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এতবড় গুরুতর বিষয়ে যখন সামান্য তিন দিনের আলোচনার দাবী উঠল তখন সেটিরও তারা বিরোধীতা করল। সামান্য এক ঘন্টার মধ্যে এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিল। অথচ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধি হলে সে প্রসঙ্গেও বহু ঘন্টা আলোচনা হয়। ভেড়ার পালের সব ভেড়া যেমন দল বেঁধে এবং কোন রুপ বিচার বিবেচনা না করে প্রথম ভেড়াটির অনুসরণ করে তারাও সেদিন তাই করেছিল। আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রের দাবী যে কতটা মেকী,সেটির প্রমাণ তারা এভাবেই সেদিন দিয়েছিল। দলটির নেতাকর্মীরা সেদিন দলে দলে বাকশালে যোগ

দিয়েছিল,এরকম একদলীয় স্বৈরচারি শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের বিবেকে সামান্যতম দংশনও হয়নি।

১৯৭৪ সালে ১৮ অক্টোবর বোষ্টনের ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরে ডানিয়েল সাদারল্যান্ড লিখেছিলেন,

“গত দুই মাসে যে ক্ষুধার্ত জনতা স্রোতের মত ঢাকায় প্রবেশ করেছে,তাদের মধ্যে সরকারের সমর্থক একজনও নেই। বন্যা আর খাদ্যাভাবের জন্য গ্রামাঞ্চল ছেড়ে এরা ক্রমেই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে সরকার এদেরকে রাজপথের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে না দিতে বদ্ধপরিকর। এরই মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যককে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সারাদিন দুই এক টুকরা রুটি খেতে পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে দুই- একটা পিঁয়াজ ও একটু- আধটু দুধ মেলে। ক্যাম্পে ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। “যে দেশে মানুষকে এমন খাঁচাবদ্ধ করে রাখা হয় সেটা কি ধরনের স্বাধীন দেশ”- ক্রোধের সাথে বলল ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। ক্যাম্পের ব্লাকবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে জনৈক কর্মকর্তা আমার সুবিধার্থে প্রত্যেকের রুটি খাওয়ার সময়সূচীর তালিকা লিখে রেখেছেন। “তালিকায় বিশ্বাস করবেন না”-ক্যাম্পের অনেকেই বলল। তারা অভিযোগ করল যে, রোজ তারা এক বেলা খেতে পায়- এক কি দুই টুকরা রুটি। কোন এক ক্যাম্পের জনৈক স্বেচ্ছাসেবক রিলিফকর্মী জানাল যে, “সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের কোন তোয়াক্কা করে না। তারা বাইরের জগতে সরকারের মান বজায় রাখতে ব্যস্ত। এ কারণেই তারা লোকদেরকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাচেছ। বিদেশীরা ভূখা- জনতাকে রাস্তায় দেখুক এটা তারা চায় না।”

১৯৭৪ সালে ৩০ অক্টোবর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় পিটার প্রেসটন লিখেছিলেন,

“এই সেদিনের একটি ছবি বাংলাদেশের দৃশ্যপট তুলে ধরেছে। এক যুবতি মা - তার স্তন শুকিয়ে হাঁড়ে গিয়ে লেগেছে,ক্ষুধায় চোখ জ্বলছে - অনড় হয়ে পড়ে আছে ঢাকার কোন একটি শেডের নীচে,কচি মেয়েটি তার দেহের উপর বসে আছে গভীর নৈরাশ্যে। দু’জনাই মৃত্যুর পথযাত্রী। ছবিটি নতুন,কিন্তু চিরন্তন। স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা দুনিয়ার সবচেয়ে - কলিকাতার চেয়েও - বীভৎস

শহরে পরিণত হয়েছে। সমস্ত বীভৎসতা সত্ত্বেও কোলকাতায় ভীড় করা মানুষের যেন প্রাণ আছে, ঢাকায় তার কিছুই নাই। ঢাকা নগরী যেন একটি বিরাট শরাণার্থী- ক্যাম্প। একটি প্রাদেশিক শহর ঢাকা লাখ লাখ জীর্ণ কুটীর, নির্জীব মানুষ আর লঙ্গরখানায় মানুষের সারিতে ছেয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে যখন খাদ্যাভাব দেখা দেয়, ভূখা মানুষ ঢাকার দিকে ছুটে আসে। ঢাকায় তাদের জন্য খাদ্য নেই। তারা খাদ্যের জন্য হাতড়ে বেড়ায়, অবশেষে মিলিয়ে যায়। গেল সপ্তাহে একটি মহলের মতে শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই মাসে ৫০০ লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। এর বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে। নিশ্চিত করে বলার মত প্রশাসনিক যন্ত্র নাই।.. জন্মের পর পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সাহায্যের এক অভূতপূর্ব ফসল কুড়িয়েছিলঃ ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড। আজ সবই ফুরিয়ে গেছে। কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। রাজনীতিবিদ, পর্যবেক্ষক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান - সবাই একই যুক্তি পেশ করছে যা অপরাধকে নিরাপদ করছে, দায়িত্বকে করছে অকেজো। তাদের মোদ্দা যুক্তি হল এই যে, বাংলাদেশের ঝুলিতে মারাত্মক ফুটো আছে। যত সাহায্য দেওয়া হোক না কেন,দূর্নীতি,আলসেমী ও সরকারী আমলাদের আত্মঅহমিকার ফলে অপচয়ে ফুরিয়ে যাবে। বেশী দেওয়া মানেই বেশী লোকসান।”

পাত্রের তলায় ফুটো থাকলে পাত্রের মালামাল বেড়িয়ে যায়,তবে তা বেশী দূর যায় না। আশে পাশের জায়গায় গিয়ে পড়ে। তেমনি বাংলাদেশের তলা দিয়ে বেড়িয়ে যাওয়া সম্পদ হাজার মাইল দূরের কোন দেশে গিয়ে উঠেনি,উঠেছিল প্রতিবেশী ভারতে। আর এ ফুটোগুলো গড়ায় ভারতীয় পরিকল্পনার কথা কি অস্বীকার করা যায়? পাকিস্তান আমলে ২৩ বছরে পাকিস্তান সরকারের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল, সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবারী বন্ধ করা। এ কাজে প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বসানো হত। অথচ শেখ মুজিব সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবারি বন্ধ না করে ভারতের সাথে চুক্তি করে সীমান্ত জুড়ে বাণিজ্য শুরু করেন। এভাবে সীমান্ত বাণিজ্যের নামে দেশের তলায় শুধু ফুটো নয়, সে তলাটিই ধ্বসিয়ে দিলেন। তলা দিয়ে হারিয়ে যাওয়া সম্পদ তখন ভারতে গিয়ে উঠল। ভারত বস্তুতঃ তেমন একটি লক্ষ্য হাছিলের কথা ভেবেই সীমান্ত বাণিজ্যের প্রস্তাব করেছিল। অথচ পাকিস্তান আমলে ভারত এ সুবিধার কথা ভাবতেই পারেনি। অথচ মুজিব সেটাই বিনা দ্বিধায় ভারতের হাতে তুলে দিলেন। বাংলাদেশের বাজারে তখন আর রাতের

আঁধারে চোরাচলানকারী পাঠানোর প্রয়োজন পড়েনি। দিনদুপুরে ট্রাক- ভর্তি করে বাংলাদেশের বাজার থেকে সম্পদ তুলে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা তখন পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত কলকারখানার যন্ত্রাংশ খুলে নামে মাত্র মূল্যে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়। তলাহীন পাত্র থেকে পানি বেরুতে সময় লাগে না, তেমনি দেশের তলা ধ্বসে গেলে সময় লাগে না সে দেশকে সম্পদহীন হতে। ভারতের সাথে সীমান্ত বাণিজ্যের দাড়িয়েছিল, ত্বরিৎ বেগে দূর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল বাংলাদেশে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক ওরিয়ানী ফালাচীর সাথে শেখ মুজিবের সাক্ষাতকারটি ছিল ঐতিহাসিক। শেখ মুজিবের চরিত্র, আত্ম- অহংকার, যোগ্যতা ও মানবতার মান বুঝবার জন্য আর কোন গবেষণার প্রয়োজন নেই, সে জন্য এই একটি মাত্র সাক্ষাতকারই যথেষ্ট। এখানে সে বিখ্যাত সাক্ষাতাকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হলঃ

রোববার সন্ধ্যাঃ আমি কোলকাতা হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করেছি। সত্যি বলতে কি, ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী তাদের বেয়োনেট দিয়ে যে যজ্ঞ চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার পর এ পৃথিবীতে আমার অন্তিম ইচ্ছা ছিল যে, এই ঘৃণ্য নগরীতে আমি আর পা রাখবো না- এ রকম সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার সম্পাদকের ইচ্ছা যে, আমি মুজিবের সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। (এখানে তিনি এক বীভৎস বর্বর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন। সেটি হলঃ ঢাকা স্টেডিয়াম কাদের সিদ্দিকী তার দলবল নিয়ে কিছু হাতপা বাধা রাজকারকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছিল। আন্তর্জাতিক আইনে কোন বন্দীকে হত্যা করা গুরুতর যুদ্ধাপরাধ। আর সেটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রকাশ্যে,ঢাকা স্টেডিয়াম হাজার হাজার মানুষের সামনে। এবং যে ব্যক্তিটি এ নৃশংস যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত তাকে জাতীয় বীর হিসাবে মুজিব সরকার স্বীকৃতি দেয়। হত্যারত কাদের সিদ্দিকীর ছবি বিদেশী পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে, কিন্তু মুজিব তাকে ছাড়িয়ে নেন।)

আমার স্মরণ হল, ১৮ই ডিসেম্বর যখন আমি ঢাকায় ছিলাম,তখন লোকজন বলছিল, “মুজিব থাকলে সেই নির্মম,ভয়ংকর ঘটনা কখনোই ঘটতো না”। কিন্তু গতকাল (মুজিবের বাংলাদেশে ফিরে আসার পর) মুক্তিবাহিনী কেন

আরো ৫০ জন নিরীহ বিহারীকে হত্যা করেছে?..আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে সাংবাদিক অ্যালডো শানতিনিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আমার দেশে আমি সবচেয়ে সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ,আমি বাংলার বাঘ,দিকাপাল।..এখানে যুক্তির স্থান নেই।..আমি বুঝতে পারিনি আমার কি ভাবা উচিত।

সোমবার সন্ধাঃ ..তার মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল।..তার ভারসাম্যহীনতাকে আমি আর কোন ভাবেই ব্যাখা করতে পারি না।..আমি যত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, তত মনে হয়েছে তিনি কিছু একটা লুকাচ্ছেন। এমন কি তার মধ্যে যে সার্বক্ষণিক আক্রমণাত্মক ভাব, সেটাকে আমার মনে হয়েছে আত্মরক্ষার কৌশল বলে। ঠিক চারটায় আমি সেখানে ছিলাম। ভাইস সেক্রেটারী আমাকে করিডোরে বসতে বললেন, যেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোকে ঠাসাঠাসি ছিল। তিনি অফিসে প্রবেশ করে মুজিবকে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানালেন।আমি একটা ভয়ংকর গর্জন শুনলাম এবং নিরীহ লোকটি কম্পিতভাবে পুনরায় আবির্ভূত হয়ে আমাকে প্রতীক্ষা করতে বললেন। আমি প্রতীক্ষা করলাম- এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা –রাত আটটা যখন বাজলো তখনো আমি সেই অপিসর করিডোরে অপেক্ষামান। রাত সাড়ে আটটায় আমাকে প্রবেশ করতে বলা হল।আমি বিশাল এক কক্ষে প্রবেশ করলাম। একটি সোফা ও দুটো চেয়ার সে কক্ষে। মুজিব সোফার পুরোটায় নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং দুইজন মোটা মন্ত্রী চেয়ার দুটো দখল করে বসে আছেন। কেউ দাঁড়ালো না। কেই আমাকে অভ্যার্থনা জানালো না। কেউ আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করলো না। মুজিব আমাকে বসতে বলার সৌজন্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত সুদীর্ঘক্ষণ নীরবতা বিরাজ করছিল। আমি সোফার ক্ষুদ্র প্রান্তে বসে টেপ রেকর্ডার খুলে প্রথম প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু আমার সে সময়ও ছিল না। মুজিব চিৎকার শুরু করে দিলেন,

“হ্যারি আপ, কুইক, আন্ডারষ্টান্ড? ওয়েষ্ট করার মত সময় আমার নাই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?..পাকিস্তানীরা ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করেছে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

আমি বললাম,

মি. প্রাইম মিনিস্টার..। “মি. প্রাইম মিনিস্টার, গ্রেফতারের সময় কি আপনার উপর নির্যাতন করা হয়েছিল?”

“ম্যাডাম নো। তারা জানতো,ওতে কিছু হবে না। তারা আমার বৈশিষ্ট্য,আমার শক্তি,আমার সম্মান,আমার মূল্য, বীরত্ব সম্পর্কে জানতো, আন্ডারস্টান্ড?”

“তা বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে তারা আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলাবে? ফাঁসীতে ঝুঁলিয়ে কি মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়?”

“নো নো ডেথ সেন্টেন্স?”

এই পর্যায়ে তাকে দ্বিদাগ্রস্ত মনে হল এবং তিনি গল্প শুরু করলেন,

“আমি এটা জানতাম। কারণ ১৫ই ডিসেম্বর ওরা আমাকে কবর দেওয়ার জন্য একটা গর্ত খনন করে”।

“কোথায় খনন করা হয়েছিল সেটা?”

“আমার সেলের ভিতর।”

“আপনার প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে মি. প্রাইম মিনিস্টার?”

“আমাকে একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল। এমনকি আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেয়া হতো না। সংবাদপত্র পাঠ করতে বা চিঠিপত্রও দেয়া হতো না, আন্ডারস্টান্ড?”

“তাহলে আপনি কি করেছেন?”

“আমি অনেক চিন্তা করেছি।”

“আপনি কি পড়েছেন?”

“বই ও অন্যান্য জিনিস।”

“তাহলে আপনি কিছু পড়েছেন।”

“হ্যা কিছু পড়েছি।”

“কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল,আপনাকে কিছুই পড়তে দেয়া হয়নি। ”

“ইউ মিস আন্ডারস্টুড।”

“..কি হলো যে শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে ফাঁসীতে ঝুলানো না।”

“জেলার আমাকে সেল থেকে পলাতে সহায়তা করেছেন এবং তার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন।”

“কেন, তিনি কি কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন?

“আমি জানি না। এ ব্যাপারে তার সাথে আমি কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার সাথে কথা কিছু বলেননি।”

"নীরবতা সত্ত্বেও কি আপনারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।"
'হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে সাহায্য করতে চান।"
"তাহলে আপনি তার সাথে কথা বলেছেন।"
"হ্যাঁ, আমি তার সাথে কথা বলেছি।"
"আমি ভেবেছিলাম, আপনি কারোই সাথে কথা বলেননি।"
"ইউ মিস আন্ডারস্টুড।"

.. এরপর ১৮ই ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়েন। নিচের অংশটি আমার টেপ থেকে নেয়া।

"ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?"
"ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি?"
"ঢাকা স্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছ।"
"মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি মিথ্যাবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করেছি। আমি চাইলে আমি আপনাকে তার ছবিও দেখাবো। আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।"
"মিথ্যাবাদী, ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।"
"মি. প্রাইম মিনিস্টার, দয়া করে মিথ্যাবাদী শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আব্দুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনিফর্ম পরা ছিল।"

"তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল যারা প্রতিরোধের বিরোধীতা করেছিল এবং কাদের সিদ্দিকী তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হয়েছে।"
"মি. প্রাইম মিনিস্টার, ..কেউই প্রতিরোধের বিরোধীতা করেনি। তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করতে পারছিল না।"
"মিথ্যেবাদী।"
"শেষ বারের মতো বলছি, আমাকে মিথ্যেবাদী বলার অনুমতি আপনাকে দেবো না।"

(ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী, ওরিয়ানী ফালাসী অনুবাদে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু)

এই হল মুজিবের আসল চরিত্র। ঢাকা স্টেডিয়ামে হাতপা বাঁধা রাজাকারদের কাদের সিদ্দীকী ও তার সাথীরা হত্যা করল, বিদেশী পত্রিকায় সে খবর ছাপা হল, বহু সাংবাদিকসহ বহু হাজার বাংলাদেশী সেটি দেখল, অথচ শেখ মুজিব সেটি বিশ্বাসই করতে চান না। এতবড় যুদ্ধাপরাধের ন্যায় সত্য ঘটনাকে তিনি মিথ্যা বলেছেন। অপর দিকে যে পাকিস্তান সরকার তার গায়ে একটি আঁচড়ও না দিয়ে জেল থেকে ছেড়ে দিল তাদের বিরুদ্ধে বলছেন,তাকে নাকি তারা হত্যা ও হত্যা শেষে দাফন করার জন্য তারই জেলের প্রকোষ্টে একটি কবর খোদাই করেছিল। অথচ তার কোন প্রমাণই নেই। কিন্তু সমস্যা হল, সাধারণ বাংলাদেশীদের জন্য ইতিহাসের এ সত্য বিষয়গুলো জানার কোন পথ খোলা রাখা হয়নি। ইতিহাসের বই থেকে এসব সত্যগুলোকে পরিকল্পিত ভাবে লুকানো হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে এ বিষয়ে কিছুই বলা হচ্ছে না।

যে কোন ফসলের ক্ষেতে গাছের পাশে বহু আগাছাও থাকে। জীবনটা সুখের করতে হলে কোনটি গাছ আর কোনটি আগাছা এটি জানা জরুরী। নইলে আগাছার বদলে ফসলের গাছকে আবর্জনার স্তূপে যেতে হয়। আর তখন পানি ও সার গিয়ে পড়ে আগাছার গোড়ায়। যে কোন জাতির জীবনে শুধু মহৎ মানুষই জন্ম নেয় না। চরিত্রহীন দুর্বৃত্তরাও জন্মায়। শিক্ষক ও পাঠ্য বইয়ের কাজ হল, মহৎ মানুষের পাশাপাশী দুর্বৃত্তদের চিত্রগুলোও তুলে ধরা। এটি না হলে ফিরাউন, নমরুদ, আবু জেহলের মত দুর্বৃত্তরা বীরের মর্যাদা পায়। কিন্তু বাংলাদেশে সেটি হয়নি। হয়নি বলেই কে সৎ আর কে দুর্বৃত্ত সেটি চিনতেই ভূল করে। সবচেয়ে বেশী ভূল করে তারা যারা এ শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের দশ- বিশটি বছর কাটায়। এজন্যই বাংলাদেশে যখন একমাত্র দল বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হল তখন এ সব শিক্ষিতরা দল বেধে লাইন ধরেছিল। বাকশালে যোগদানের সে মিছিলে শামিল হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুরোন রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রবীণ সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী। গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে যে তারা কত নিম্ন মানের ছিলেন সেদিন সে প্রমাণও তারা রেখেছিলেন। এমন চেতনার ধারকেরা দেশের আইন- আদালতকে বুড়া আঙ্গুল দেখিয়ে গণ- আদালত বসিয়েছিল। বাংলাদেশে দুর্বৃত্তরা বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়, নেতা হয়, মন্ত্রী হয় এমনকি প্রেসিডেন্টও হয়- মূলতঃ এমন চেতনার মানুষদের কারণেই। এদের কারণেই

দেশ দূর্নীতিতে বিশ্বে বার বার প্রথম হওয়ার কলংক অর্জন করে। জাতীয় জীবনে এ এক চরম ব্যর্থতা। বিদেশ থেকে শত শত কোটি লোন নিয়ে কলকারখানা ও রাস্তাঘাট নির্মান করে কি জাতি এ ব্যর্থতার কলংক থেকে মূক্তি পায়? আসে কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন? বরং যা বাড়ে তা হল লোনের দায়ভার। এবং বাড়ে ব্যর্থতার কলংক। বাংলাদেশে এ দুটিই সমানে বেড়েছে। এ ব্যর্থ শিক্ষাব্যবস্থা ভারি হয় দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক দল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন পরিণত হয় তাদের রিক্রুটমেন্ট ক্ষেত্রে। এখান থেকেই তারা পায় দলীয় ক্যাডার।

যে মহল্লায় দুর্বৃত্ত মানুষের সংখ্যা বেশী সে গ্রামে সহজেই ডাকাত দল গড়ে উঠে। বাংলাদেশে একই কারণে প্রবলভাবে শক্তিশালী হয়েছে দুর্বৃত্ত নেতাদের রাজনৈতিক দল। জমিতে ফসলের আবাদ না হলে সে জমিতে যা বেড়ে উঠে তা হল আগাছা। তেমনি সত্যের প্রচার না হলে প্রতিষ্ঠা পায় মিথ্যা ও দুর্বৃত্তি। অথচ মুজিবামলে বাংলাদেশে সত্যের প্রচার গায়ের জোর বন্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সকল বিরোধী মতের পত্রিকা। ফলে বাজার পেয়েছিল মিথ্যা- প্রচার। এরা এ প্রচারও বাজারে ছেড়েছে যে,শেখ মুজিবই হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাঙালী। কথা হল,সেই শ্রেষ্ঠ বাঙালীটি যদি এরূপ মিথ্যাচারি ও স্বৈরাচারি হয় তবে সাধারণ বাঙালীদের জন্য মর্যাদাকর কোন গুণ অবশিষ্ঠ থাকে কি? আবর্জনার স্তুপ মাথায় চাপিয়ে রাস্তায় নামা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমন নির্বুদ্ধিতায় ইজ্জত বাড়ে না। বুদ্ধিমানেরা সেগুলিকে আবর্জনার স্তুপে ফেলে পথ চলে। অথচ বাংলাদেশে সেগুলোকে অনেকে মাথায় তুলেছে। বিষয়টি ঘটেছে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে। স্বৈরাচারি, বিদেশী চর ও মিথ্যবাদী রাজনীতিবিদদের কোন জাতিই মাথায় তুলে না। কারণ এতে বিশ্ব মাঝে শুধু অসম্মান বাড়ে। অথচ বাংলাদেশ তাদেরকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়েছে। বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা নিছক এ নয় যে তারা আবিস্কারক বা নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক তৈরীতে ব্যর্থ হয়েছে,বরং সবচেয়ে ব্যর্থতা হল বীর ও দুর্বৃত্তের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়েই ব্যর্থ হয়েছে। দুর্বৃত্তরা এজন্যই জনগণের ভোটে বার বার এমপি হয়, মন্ত্রী হয় এবং নেতা হয়। একই ব্যর্থতার কারণে মাথায় উঠেছে শেখ মুজিব ও তার অনুসারিরা। তাকে জাতির পিতা বানানোর আব্দার উঠেছে। কথা হল, যে ব্যক্তিটি গণতন্ত্র- হত্যা করলেন, হরণ করলেন ব্যক্তি-

স্বাধীনতা, ভারতের বেদীমূলে বিসর্জন দিলেন বাংলাদেশের বেরুবারী, দুর্ভিক্ষ ডেকে এনে মৃত্যু ঘটালেন বহুলক্ষ মানুষের, আন্তর্জাতিক মহলে দেশকে পরিচিত করলেন “ভিক্ষার ঝুলি” রূপে এবং মিথ্যা কথা ও মিথ্যা ওয়াদাকে যিনি নিজ চরিত্রের অলংকারে পরিণত করলেন, সর্বপরি বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশটির ধ্বংসে যিনি এক রক্তক্ষয়ী ও ভাতৃঘাতি যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরী করলেন এবং চিহ্নিত শত্রুশক্তি ভারতকে মুসলিম ভূমিতে ডেকে আনলেন - তাকে জাতির পিতা রূপে মাথায় তুললে কি বিশ্বমাঝে ইজ্জত বাড়ে? ভবিষ্যৎ প্রজন্মই বা কি বলবে?

উপসংহারঃ যে লড়াই হতে হবে বিরামহীন

মুসলমানদের জীবনে মাথা তুলে দাঁড়ানো ও সামনে এগুনোর লড়াই বিরামহীন।এ লড়াইয়ে যুদ্ধ তাই প্রতিদিন।এসব যুদ্ধের কোনটিতে যেমন বিজয় আছে, আবার কোনটিতে পরাজয়ও আছে। এসব যুদ্ধ হঠাৎ করে যেমন শুরু হয় না, তেমনি শেষও হয় না। বাঙালী মুসলমানদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের শুরু সেদিন থেকেই যেদিন সেটি লুট হয়েছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের হাতে। এ লড়াইয়ে যুদ্ধ হয়েছে অনেক। সবগুলোই যে সশস্ত্র তা নয়। কোনটি লড়তে হয়েছে অস্ত্র হাতে, কোনটি ভোটে, আবার কোনটি মেধা, দর্শন ও বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে। বিরামহীন এ লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা হয় তাঁর ঈমানের,তথা আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে তার অঙ্গিকারের। অবিরাম এ লড়ায়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। তবে সেটি সশস্ত্র যুদ্ধ ছিল না, ছিল দুটি ভিন্ন দর্শনের। যুদ্ধটি ছিল রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। এক পক্ষে ছিলঃ সেকুলার ভারতীয় জাতীয়তাবাদ; তাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু- মুসলমানের মিলিত অখন্ড ভারত। অপর দিকে ছিল প্যান- ইসলাম- যার ভিত্তিতে নানা ভাষাভাষি মুসলমান স্বপ্ন দেখেছিল মুসলমানদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার।

১৯৪৭- এর যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয়ী হয়েছিল। বিজয়ের কারণ, মুসলমানগণ সে সময় কিছু আলোকিত নেতা পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন শক্তিশালী কলম যোদ্ধা। তাদের সামনে ছিল ইসলামী জীবন দর্শন। ছিল একতা। সে একতা ও ইসলামি অঙ্গিকার মর্তের বুকে নামিয়ে এনেছিল আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহর মেহেরবানীতেই সেদিন সম্ভব হয়েছিল বীনা যুদ্ধে বিশ্বের সর্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের নির্মাণ। অভিন্ন ভাষা ও অখন্ড ভূগোলের মুসলিম দেশ – যেমন আরব ভূমি- যখন বহু টুকরায় বিভক্ত হচ্ছিল তখন উপমহাদেশের নানা ভাষার ও নানা বর্নের মানুষের ১২শত মাইলে বিভক্ত ভূ-খন্ড নিয়ে একটি অভিন্ন দেশ গড়েছিল। মুসলিম বিশ্বে এ ছিল একতার মডেল।শূণ্য হাতে সেদিন এই নতুন রাষ্ট্রটির নির্মাণ- কাজ শুরু হয়েছিল। শুরুর সে দিনগুলিতে লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব ও ছিন্নমূল উদ্বাস্ত প্রাণ বাঁচাতে ছুটে এসেছিল ভারত থেকে। কিন্তু আসেনি কোন বিদেশী সাহায্য। তারপরও সেদিন দেশ তলাহীন ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়নি। নেমে আসেনি ভয়াবহ

দুর্ভিক্ষ। মানুষ সেদিন কুকুরের সাথে উচ্ছিষ্ট খোঁজায় যুদ্ধ লড়তে হয়নি। যেমনটি আওয়ামী বাকশালী আমলে হয়েছে। আল্লাহর সাহায্য আসলে একটি জাতি চরম বিপদের দিনেও এভাবে ইজ্জত নিয়ে বিশ্ব মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ায়। অথচ একাত্তরে পৌত্তলিক ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার ন্যায় কাফের শক্তির সাহায্যে বাংলাদেশীদের সে ইজ্জত জুটেনি। বরং জুটেছিল সীমাহীন জিল্লতি ও অপমান। কিন্তু ৪৭- এর সে বিজয় বাংলাদেশের মানুষ ধরে রাখতে পারিনি। বিশ্বের বুকে সর্ব বৃহৎ মুসলিম শক্তির নির্মানের যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৯৪৭- এ যাত্রা শুরু হয়েছিল সে প্রতিজ্ঞায় তারা স্থির থাকতে পারিনি। আর এর কারণ, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিপর্যয়। সে সাথে ছিল ভারতের ষড়যন্ত্র ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের বিশাল পুঁজির বিণিয়োগ।

সিরাতুল মোস্তাকিমে টিকে থাকার কাজ ইসলামে অঙ্গিকারহীন সেকুলার নেতাদের ইমামের আসনে বসালে হয়না। ভারতের ন্যায় হিন্দু আগ্রাসী শক্তির আর্শিবাদ ও সাহায্যে সে পথ মেলে না। সেটি অর্জিত হয় না সেকুলার সাহিত্য পাঠে। এ জন্য চাই,ইসলামি জ্ঞান- সমৃদ্ধ চেতনা। জন্মের পর শিশুকে শুধু পানাহার জোগালে সে মানবতা পায় না। এজন্য পানাহারের সাথে শিক্ষাদানও অপরিহায্য। তেমনি শুধু রাষ্ট্র নির্মাণ করলেই চলে না,সে রাষ্ট্রকে ইসলামী শিক্ষার উপরও প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। নইলে সে রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য এবং সে সাথে মানবতার জন্য কল্যাণকর হয় না।এবং পরিচর্যা পায় না ইসলামি চেতনা। রাষ্ট্রে ইসলামি শিক্ষার বিস্তারে মূল দায়িত্ব হল,মোখলেছ আলেম ও ইসলামের বিজয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ কলম যোদ্ধাদের। তাঁদের লড়তে হয় মিথ্যা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে। একটি জাতির জীবনে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি হয় মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তির এ অঙ্গনেই। এজন্যই নবীজী (সাঃ) বলেছেন, জ্ঞানীর কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের মূল পরাজয়টা হয়েছে এক্ষেত্রে। বুদ্ধিবৃত্তির এ ময়দানে বিজয়ী হয়েছে ইসলামের শত্রুপক্ষ। আর বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়ের পথ বেয়েই এসেছে ইসলামপন্থিদের রাজনৈতিক পরাজয়। একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর হল ইসলামপন্থিদের সে পরাজয়ের দিন। তবে একাত্তরের যুদ্ধ শেষ হলেও,লড়াই শেষ হয়নি। চলমান এ লড়ায়ের মূল লক্ষ্যঃ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয়। একমাত্র এভাবেই নেওয়া যেতে পারে ইসলামের দুষমনদের দ্বারা কৃত অতীতের সকল ষড়যন্ত্র ও জুলুমের প্রতিশোধ। বাংলাদেশের দুর্বৃত্ত সেকুলার নেতারা দেশকে

হত্যা, লুট ও দূর্নীতি ছাড়া কিছুই দেয়নি। দিয়েছে বিশ্বব্যাপী সীমাহীন অপমান। তাদের রয়েছে বিভক্তি,সংঘাত,হত্যা, লুট ও সীমাহীন দূর্নীতির সামর্থ। রয়েছে বিদেশী শক্তির কাছে দেশ- বিসর্জনের সামর্থ। সেটি যেমন শেখ মুজিব ও তার বাহিনী প্রমাণ করেছে, তেমনি প্রমাণ করছে তাঁর উত্তরসুরীরাও। বাংলাদেশ এদের কারণেই দূর্নীতে বিশ্বে বার বার শীর্ষে অবস্থান নিয়েছে। দেশের ইজ্জত আজ তলায় ঠেকেছে, এখন নীচের নামার আর সুযোগ নেই। পথ শুধু এখন সামনে এগুনোর। এখন আর আত্মঘাতী অনৈক্য ও বিভেদ নয়,তলায় নামাও নয়। চাই ঐক্য, চাই আত্ম- গঠন ও আত্ম- উন্নয়ন। বাংলাদেশের গৌরব বাড়তে পারে শুধু এ পথেই। বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সেকুলারিজম, সমাজতন্ত্র ও মুজিবাদের পরীক্ষা- নিরীক্ষায় জাতির অমূল্য সময়ের বিপুল অপচয় হয়েছে। সেগুলো আবর্জনার স্তপে ফেলে এখন সামনে এগুনোর সময়। এ লড়াইয়ে প্রকৃত ঈমানদারের হরানোর কিছু নাই। বরং জয়ের জন্য রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

“নিশ্চয়ই ঈমানদারের জান ও মাল আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিণিময়ে। (আল্লাহর সাথে কেনাবেচার এ চুক্তির কারণে) তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। এ লড়াইয়ে তারা যেমন শত্রুদের হত্যা করে,তেমনি নিজেরাও নিহত হয়”-(সুরা তাওবাহ, আয়াত ১১১)।

আল্লাহপাক আরো বলেছেন, “হে ঈমানদারগণ,তোমাদের কি এমন এক ব্যবসার কথা বলে দেব যা তোমাদের জাহান্নামের বেদানাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? আর সেটি হল,তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস কর,এবং তোমাদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জ্বিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে পারতে।”-সুরা সাফ,আয়াত ১০- ১১)

আল্লাহর সাথে ঈমানদারের চুক্তি এবং জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচার জন্য যে ব্যবসাটির কথা কোরআনে বলা হয়েছে,সেটি কি নামায- রোযা- হজ্ব- যাকাতে আদায় হয়? নবীজী (সাঃ)কি তাঁর ইবাদত- বন্দেগী নিছক নামায- রোযায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন? বস্তুতঃ এ লক্ষ্যে জ্বিহাদ বা লড়াইয়ের বিকল্প নেই। ঈমানদারের জীবনে এমন জ্বিহাদ বা লড়াই তো আমৃত্যু। এ জ্বিহাদ, আল্লাহতায়ালার প্রদর্শিত পথ বেয়ে দেশগড়ার। এ জ্বিহাদ দূর্বৃত্ত বেঈমানদের

হাত থেকে দেশ- মূক্ত করার, তথা আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের। নামায- রোযার বাইরে এ জ্বিহাদ লড়তে হয় প্রতিটি ঈমানদারকে।

নবীজী (সাঃ) নিজে এবং সাহাবায়ে কেরাম নামায- রোযার বাইরে এমন লড়াই আমৃত্যু লড়েছেন। নবীজীর (সাঃ) এমন কোন সাহাবা পাওয়া যাবে না যিনি নিজের জান- প্রাণ দিয়ে এ কাজে ময়দানে নামেন নি। শতকরা ৬০ ভাগের বেশী সাহাবা সে লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন। নবীজী (সাঃ) নিজে ৫০- এর বেশী যুদ্ধ লড়েছেন। সে লড়াই যে নিছক বহিঃশত্রু বা অমুসলমানদের বিরুদ্ধে তা নয়। বরং সে সব নামধারি মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহর হুকুম তথা ইসলামের প্রতিষ্ঠায় বা বিজয়ে বাধা দেয়। ইসলামের মহান খলিফা হযরত আলী (রাঃ) তো তার শাসনামলে বড় বড় যুদ্ধগুলো লড়েছেন মুসলিম নামধারিদের বিরুদ্ধে। এমন যুদ্ধ করতে হয়েছিল হযরত আবু বকর (রাঃ) কেও। নবীজীর (সাঃ) ওফাতের পর এরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল- যা ছিল আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ। আজকের মুসলিম নামধারি সেকুলারগণ শুধু যাকাত বিধান নয়, সমগ্র ইসলামকে সেকেলে ও সাম্প্রদায়িক বলে সেটির প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করছে। ফলে আইন- আদালত, ব্যাংক- বীমা, শিক্ষা- সংস্কৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইসলাম একটি পরাজিত আদর্শ। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামের এমন পরাজিত দশা এক বিস্ময়ের বিষয়।

আরবের বুকে ইসলাম যখন বিজয়ী আদর্শ তখনও সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এতটা অধিক ছিল না। আরো বিস্ময়ের বিষয়, ইসলামের এমন পরাজিত দশার মধ্যে বাস করেও যারা নিজেদের ঈমানদার রূপে পরিচয় দেন তাদের মধ্য এ নিয়ে কোন মাতম নেই। বিজয়ের লক্ষ্যে কোন প্রস্তুতিও নেই। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা ঈমানদারদের সাথে যে দ্বি- পাক্ষিক চুক্তির কথা বলেছেন, তা নিয়ে তাদের মধ্যে কোন অনুভূতিও নেই। ঈমানদার হওয়ার অর্থ যে এমন একটি কেনা- বেচার চুক্তিতে মহান আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া,সে হুশ বা চেতনাই বা ক’জনের? তাই চরম অবহেলা হচ্ছে পবিত্র কোরআনে বর্ণীত আল্লাহর নির্দেশিত সে ব্যবসাটির সাথে। আল্লাহর পথে লড়াই ছেড়ে ধর্মপালনকে তাঁরা জায়নামাযে সীমাবদ্ধ রেখেছে। অথচ ইসলামের প্রয়োগের মূল ক্ষেত্রটি তো জায়নামাযের বাইরে। জায়নামাযে যে ইবাদত, সেটির লক্ষ্য তো আল্লাহর

সাথে কৃত চুক্তিপালনে ও তার নির্দেশিত ব্যাবসায় আত্মনিয়োগে অঙ্গিকার বাড়ানো। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের নামায- রোযা তাদের জীবনে সে অঙ্গিকার কতটুকু বাড়িয়েছে? আল্লাহর পথে লড়াই দূরে থাক, তাদের অধিকাংশই পরিণত হয়েছে ইসলামের প্রতিষ্ঠারোধকারি সেকুলার রাজনীতিবিদদের অর্থদাতা, ভোটদাতা ও অবৈতনিক লাঠিয়ালে।আ ল্লাহর নির্দেশিত এজেন্ডা ভূলে তারা অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছে সেকুলার এজেন্ডা বাস্তবায়নে।আর এভাবে সেকুলার দলের নেতা- কর্মী বা সমর্থক রূপে তারা জেনেবুঝে খাটছে, আল্লাহর বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পরাজিত করায়। অথচ এদের অনেকে নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্ব করে, তাসবিহ্ তাহলিলও করে।

নবীজী (সাঃ)র আমলে ইসলামের বিজয়ের কারণ, ইসলামের পক্ষের সকল জনশক্তি রক্তাক্ত লড়াইয়ের ময়দানে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে সময় মুসলমান হওয়ার অর্থই ছিল, আল্লাহর দ্বীনের লড়াকু সৈনিক হওয়া। ফলে মুসলমান হয়েছেন অথচ প্রাণদানের প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধ করেননি এমন কোন উদাহরণ নেই। অথচ বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা পরিণত হয়েছে হয় নীরব দর্শকে, অথবা শত্রুপক্ষের সক্রিয় সমর্থকে। অপর দিকে ইসলামের বিপক্ষ শক্তি তাদের সকল জনশক্তিকে নিয়ে এসেছে রাজনীতির লড়ায়ে। মহান আল্লাহতায়ালা একটি জাতির ভাগ্য কখনই পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জাতির লোকেরা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন না করে। আর সে ভাগ্য পরিবর্তনের চাবি সেকুলারিজম যেমন নয়, তেমনি সমাজবাদ বা পুঁজিবাদও নয়। রাজনীতিতে নির্লিপ্ত সুফিবাদ বা দরবেশী জীবনও নয়। ভাগ্য পরিবর্তনের সে চাবিটি মহান আল্লাহতায়ালা স্বয়ং দিয়েছেন। আর সেটি হল আল- কোরআন। ধর্ম- কর্ম,আইন- আদালতসহ মুসলমানের সমাজনীতি ও রাজনীতির এটাই হল একমাত্র রোডম্যাপ। আল্লাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় সৃষ্টির কল্যাণে এটিই হল তাঁর সবচেয়ে বড় দান। মানুষের পথ দেখানোর দায়িত্ব তিনি নিজ হাতে নিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে সে ঘোষনাটি এসেছে এভাবে,

“ইন্না আলাইনাল হুদা” অর্থঃ নিশ্চয়ই পথ দেখানোর কাজ আমার”।

ঈমানদারের দায়িত্ব হল সে পথ অনুসরণের। আল- কোরআন হল,আল্লাহতায়ালার প্রদর্শিত সে পথ,ইসলামি পরিভাষায় সিরাতুল মোস্তাকিম। কথা হল, বাংলাদেশের মুসলমানেরা সে দায়িত্ব কতটুকু কাঁধে তুলে নিচ্ছে? সে দায়িত্ব নিছক নামায- রোযা- হজ্ব- যাকাতে পালিত হয় না,রাজনীতির জ্বিহাদেও তাদেরকে নামতে হয়। একমাত্র তখনই সম্ভব হয় রাজনীতি ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে দুর্বৃত্তদের সরানো। মুসলমানের রাজনীতি থেকে যেমন ইসলামকে আলাদা করা যায় না, তেমনি আলাদা করা যায় না তার চেতনা থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরাম জ্বিহাদকে। হিন্দু ও ইংরেজদের সম্মিলিত চেষ্টাতেও ১৯৪৭ সালে সেটি সম্ভব হয়নি বলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে আওয়ামী বাকশালীদের বড় সাফল্য হল, মুসলমানের রাজনীতি থেকে তারা ইসলামকে আলাদা করতে পেরেছিল। ফলে পাকিস্তান টিকেনি। পাকিস্তান ছিল ইসলাম ও মুসলিম কেন্দ্রীক রাজনীতির ফসল। এদেশটির বেঁচে থাকারও এটিই ছিল একমাত্র প্রাণশক্তি। আওয়ামী- বাকশালী রাজনীতির বড় সাফল্য,তার সে প্রাণশক্তি জোগানোর শিকড়টাই দুর্বল করে দেয়। আর এতেই ধরাশায়ী হয় সর্ব- বৃহৎ এ মুসলিম রাষ্ট্রটি। বাংলাদেশেও তারা সে নীতির প্রভাব অব্যাহত রেখেছে। ইকবালের কথায়,

“দ্বীন আগার জুদা হোতা হ্যায় সিয়াসতছে রেহ যাতা হ্যায় চেঙ্গিজী” অর্থঃ “ধর্ম যদি পৃথক হয় রাজনীতি থেকে, তবে থেকে যায় শুধু চেঙ্গিসের বর্বরতা”

মুজিব আমলে বীভৎস বর্বরতা এজন্যই এত ব্যপকতর হয়েছিল। আওয়ামী- বাকশালী পক্ষটি আজও সেটিই চায়। মুজিব আমলে বাংলাদেশের মুখে চুনকালী লাগানোর যে কাজটি শুরু হয়েছিল এবং ১৫ ই আগস্টে হঠাৎ অসমাপ্ত রেখে তাদের বিদায় নিতে হয়, সেটিকেই তারা আবার নব উদ্যোমে শুরু করতে চায়। ভারতসহ সকল ইসলামবিরোধী শক্তি তাদের সে কাজে সর্বপ্রকার সহায়তা দিতে দু- পায়ে খাড়া। এবারের হামলার লক্ষ্য নিছক দেশের অখন্ড ভূগোল নয়,বরং ইসলামী চেতনা। মুজিবামলে ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করেছিল,কিন্তু নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। এতেই তাদের আফসোস। এবার সে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে শুরু হয়েছে নব প্রস্তুতি। রাজপথে তারই মহড়া হয় লগি- বৈঠা নিয়ে মানুষ হত্যায়। চায়

আরেকটি একাত্তর। আবার চায় হত্যা, লুট, সন্ত্রাস ও অন্যের বাড়ীঘর জবর-দখলের অবাধ সুযোগ।

একাত্তর আসলে, আসে ভারতীয় বাহিনী ও তার লুট, আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, আসে রক্ষিবাহিনীর অত্যাচার,আসে বহু লক্ষ মানুষের মৃত্যু। নিরস্ত্র-নিরীহ- বন্দী মানব হত্যা তখন উৎসবে পরিণত হয়। সে সাথে আসে বিশ্ব জুড়ে ব্যর্থ- রাষ্ট্র ও তলাহীন ঝুড়ি হওয়ার দূর্নাম। এমন একটি নতুন একাত্তর থেকে জাতি বাঁচতে হলে পুরোন একাত্তরের আত্মঘাতী ইতিহাসকে জানতে হয়। অথচ সে ইতিহাস পাঠই বাংলাদেশে হচেছ না। ফলে জনগণ ভুলে যাচেছ ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বৃত্ত মানুষদের কুকর্মগুলো। আর এর ফলে ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে উঠে আসছে পুরোন একাত্তরের অতি নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষগুলো। জ্ঞান- বিজ্ঞানের নানা শাখা- প্রশাখার মাঝে ইতিহাস-বিজ্ঞানই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। গণিত, রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান না থাকলে কারো মানুষ রূপে বেড়ে উঠা বাধাগ্রস্ত হয় না। মহান আল্লাহতায়ালা তাই এসব বিষয় শেখাতে কোন নবী- রাসূল পাঠাননি, কোন গ্রন্থও নাযিল করেননি। মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা যখন আরব ভূমিতে নির্মিত হল, তখন রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যার চর্চা কতটা হয়েছিল? অথচ সেদিন অতিশয় গুরুত্ব পেয়েছিল ইতিহাস থেকে পাঠ গ্রহন। সে আমলেও তারা আদ-সামুদের কাহিনী, মাদাইয়েনের অধিবাসীদের কথা, ফিরাউন ও নমরুদের ইতিহাস, হযরত নূহ (আঃ) ও ইউনূস (আঃ) এর কিসসা, পবিত্র কা'বার উপর আবরাহার হামলার কথা তারা ভালভাবে জানতেন। সে সব অভিশপ্ত ও আযাবপ্রাপ্ত জাতিগুলো নিজেদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে গেছে অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। কোন বিজ্ঞান- ক্লাসে বা গবেষণাগারে সে পাঠলাভ হয় না। ইতিহাসের এ পাঠলাভের ফলেই নবীজীর (সাঃ) সাহাবাগণ জানতেন, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিণতির কথা। জানতেন আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার ও অবাধ্যতার শাস্তির কথা। ইতিহাসের জ্ঞান থেকে তারা সেদিন পেয়েছিলেন গভীর প্রজ্ঞা ও কান্ডজ্ঞান। নীতি ও নৈতিকতা নিয়ে বাঁচবার জন্য এমন প্রজ্ঞা তো অপরিহার্য। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরীক্ষাগার হল ইতিহাস। এখানে পরীক্ষা- নিরীক্ষা হয় নানা ধর্ম, নানা মত ও নানা পথের এবং তাতে ব্যয় হয় মানব জাতির বহু রক্ত, বহু অর্থ, বহু মেধা ও বহু শ্রম। সে সাথে ব্যয় হয় বহু শত বছরের দীর্ঘ সময়।

এরূপ বিপুল ব্যয়ে ও বিপুল আয়োজনে ইতিহাসের ভান্ডারে যোগ হয় শত শত কোটি মানুষের হাজার হাজার বছরের অমূল্য অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা কখনও গৌরবময় সাফল্যের,কখনও করুণ ব্যর্থতার। কখনও তা আনে গৌরব, কখনও আনে ভয়াবহ ধ্বংস ও আযাব। তবে এরূপ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ হারিয়ে যায় না, বরং জীবিতদের জন্য রেখে যায় মূল্যবান শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চেয়ে ইতিহাসের এ শিক্ষার গুরুত্ব কি কম?

মহামানবদের পাশাপাশি শেখবার প্রচুর উপাদান থাকে দুর্বৃত্তদের ইতিহাস থেকেও। তাই শুধু স্বাধীনতার লড়াকু সৈনিক টিপু সুলতানদের ইতিহাস পড়লেই চলে না,পড়তে হয় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরদের ইতিহাসও। পড়তে হয় উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের পররাজ্য গ্রাসের কৌশল ও তাদের শোষন প্রক্রিয়াগুলিও। পবিত্র কোরআনে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাই শুধু হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ন্যায় মহামানবদের কাহিনী বর্ণনা করেননি,বর্ণনা করেছেন নমরুদ, ফেরাউন, কারুন, আবরাহদের ন্যায় দুর্বৃত্তদের চরিত্রও । মুজিব পরিবার ও তার অনুসারিরাও তাদের দূর্নীতি, ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশীদের জন্য রেখে গেছে অমূল্য শিক্ষা। ফলে তাদের ব্যর্থতা থেকে আজকের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাঙালী মুসলমানদের শিখবার জন্য রয়েছে প্রচুর উপাদান।তবে বাংলাদেশীদের ব্যর্থতা এক্ষেত্রে প্রকট। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হলে ইতিহাসটি সঠিক হওয়া চাই। ইতিহাসের কিতাব যদি পৌরানিক কল্পকথার ন্যায় মিথ্যাচারের পরিপূর্ণ হয়ে তবে তা পাঠে কোন কল্যাণ আছে কি? পৌরাণিক কিতাব পাঠে যেমন শাপশকুনও যেমন উপাস্য মনে হয় তেমনি মিথ্যা ইতিহাস পাঠে অতিশয় দুর্বৃত্তও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে হয়। বাংলাদেশে ইতিহাস পাঠের নামে বস্তুতঃ সেটিই হয়েছে। একদিকে যেমন সঠিক ইতিহাস লেখা হয়নি, তেমনি বাড়েনি ইতিহাস থেকে পাঠ- গ্রহণের আগ্রহ। ফলে গড়ে উঠেনি ইতিহাস জ্ঞানলব্ধ প্রজ্ঞা ও কান্ডজ্ঞান। ফলে ব্যর্থতা ফুটে উটেছে দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা- দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে। তাই মানুষ ঝুকছে দূর্নীতির রাজনীতির দিকে। ফলে দুর্বৃত্তদেরকে বিজয়ী করতে মানুষ দল বেঁধে ভোট দেয়,অর্থ দেয়,এমনকি প্রাণও দেয়। কোন সভ্যদেশে এটি কি আশা করা যায়? জনগণের মাঝে যে অজ্ঞতার কারণে নমরুদ,

ফেরাউন, চেঙ্গিজ ও হিটলারের মত ব্যক্তিদের দলেও লোকের অভাব হয়নি, সেরূপ অজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশেও লোকের অভাব হয়নি গণতন্ত্রবিধ্বংসী আওয়ামী- বাকশালী ও স্বৈরাচারিদের।

কোরআনে ফিরাউন, নমরুদ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)- র কাহিনী বার বার উল্লেখ করা হয়েছে,যাতে মানুষ কে মূসা আর কে ফিরাউন সেটি চিনতে যেন ভূল না করে। আল্লাহতায়ালা এভাবে ভাল মানুষের ন্যায় খারাপ মানুষের মডেলও খাড়া করেছেন। এ দুই প্রকার মানুষ প্রতি যুগে প্রতি সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখা দেয়। বিষধর সাপ চেনার ন্যায় দুর্বৃত্তদের চেনাও অতি জরুরী। নইলে পদে পদে বিপদ আসে। জনগণ তখন বার বার বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়। তখন দেশের নেতা হয় দূর্বৃত্তরা। দেশ তখন বিশ্বরেকর্ড গড়ে দূর্বৃত্তিতে। নিছক খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও কলকারখানা গড়ে জাতি কি এমন দূর্যোগ ও গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে পারে? পারে না।এজন্য চাই সুস্থ্য ইতিহাসজ্ঞান, চাই সুস্থ্য জীবন- দর্শন। সে সঠিক জ্ঞানের লক্ষ্যে চাই লাগাতর ইতিহাস চর্চা। চাই সঠিক ইতিহাসের বই। চাই কোরআনী জ্ঞান। অথচ বাংলাদেশে এর কোনটিই সঠিক ভাবে হচ্ছেনা।

ইতিহাস রচনার নামে যা হচ্ছে তাতে দুর্বৃত্তরা চিত্রিত হচ্ছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী রূপে। অপর দিকে সঠিক ইতিহাস ও কোরআনের দর্শন- চর্চা বন্ধ করতে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে চলছে চরমসন্ত্রাস; এবং সেটি ১৯৭১থেকেই। হামলা হয়েছে বইয়ের স্টলে। কথা বলতে দেয়া হয় না এবং প্রাণ- নাশের ভয় দেখানো হয় ইসলামপন্থি লেখকদের। ফলে বিগত ৩৭ বছরে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই সাহস করে সত্য কথা বলেছেন। আর এতে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে একচেটিয়া দখল জমিয়েছে আওয়ামী বাকশালী চক্র। ইতিহাস চর্চার নামে তারা সেটিরই চর্চা চায় যেটি তাদের পছন্দের। এ লক্ষ্যে মুজিবামলে ইতিহাস লেখার কাজে দলীয় লোকদের বসানো হয়েছিল। সে সময় ইতিহাসের বইয়ে পরিকল্পিত ভাবে ঢুকানো হয়েছে মিথ্যাচার। ভেজাল খাদ্যে সুস্থ্যতা হারায় ব্যক্তির দেহ,আর অসুস্থ্য দেহে সুখাদ্যে রুচি লোপ পাবে সেটিই তো স্বাভাবিক। তেমনি ভেজাল ইতিহাস পাঠে ইতিহাস থেকে ব্যক্তির শিক্ষা লাভই হয় না। আর এতে অসুস্থ্যতা বাড়ে মন ও মনন তথা চেতনায়।আর অসুস্থ্য চেতনার মানুষ কি পায় সঠিক জ্ঞান- লাভের আগ্রহ? নর্দমার কীটের ন্যায় সে

তো খুঁজে আবর্জনার স্তুপ। এমন অসুস্থ্য চেতনার কারণেই নবীজীর (সাঃ)আমলে কাফেরগণ কোরআন তেলাওয়াত শুনলে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিত। অথবা কোরআন পাঠের আসরে পাথর ছুড়তো যাতে আসরই ভেঙ্গে যায়।তারা তো খূঁজতো আরব কবি ইমরুল কায়েসের অশ্লিল কবিতা। একই অবস্থা বাংলাদেশেও।

এজন্যই বাংলাদেশের সেকুলার মহলে পবিত্র কোরআন ও ইসলামী বইয়ের প্রতি এত অনাগ্রহ ও অনাদর। ফলে বাংলাদেশে ইতিহাসের নামে বা সাহিত্যের নামে বিস্তর বই- পুস্তক লেখা হলেও তাতে প্রজ্ঞা বা কান্ডজ্ঞান বাড়েনি। বরং বিপুল ভাবে বেড়েছে মাছি- চরিত্রের মানুষ। প্রতি দেশেই এমন চরিত্রের মানুষ থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে তারা বেড়েছে ব্যাপক ভাবে। মাছি যেমন গলিত আবর্জনা খোঁজে, এরাও তেমনি নেতা রূপে দুর্বৃত্ত মানুষ খোঁজে। মাছি যেমন দুর্গন্ধময় আবর্জনার মাঝে মহা আনন্দ পায়, এরাও তেমনি দুর্বৃত্ত নেতাদের বিজয় নিয়ে মহা- উৎসব করে। তাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠও বলে। এদের কারণে বাংলাদেশের কোন নির্বাচনে সৎ মানুষের পক্ষে বিজয় লাভ অসম্ভব। নির্বাচন করতে হলে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভোট যুদ্ধে নামতে হয়।আত্মঘাতি মানুষ যেমন জেনে বুঝে বিষ পান করে,আত্মঘাতি জাতিও তেমনি জেনেবুঝে মিথ্যাচর্চা করে। এবং অনৈক্য ও সংঘাতের পথ বেছে নেয়। এমন জাতির পরাজয়, অপমান ও ধ্বংস বাড়াতে কি বিদেশী শত্রুর প্রয়োজন পড়ে? জনগণের দেহ ও মনের সুস্থ্যতার খাতিরে তাই শুধু ভেজালযুক্ত খাদ্যকে আবর্জনার স্তুপে ফেললে চলে না,আবর্জনার স্তুপে ফেলতে ভেজালযুক্ত ইতিহাসের বইকেও। লিখতে হয়, পড়তে হয় এবং বাঁচিয়ে রাখতে হয় সঠিক ইতিহাস। এবং আরো অনিবার্য হল, সে ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ। অবিরাম আত্মঘাতি বিপর্যয়ের হাত থেকে একটি জাতি একমাত্র তখনই মুক্তি পেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

1. B.Ramon, 2007 The Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane, Lance Publishers & Distributors 2/42 Sarvapriya Vihar, New Delhi 11016

২. মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ, মৌল প্রকাশনী ৩৮/২ক, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০

৩.আতাউর রহমান খান, ২০০০ ওজারতির দুই বছর পঞ্চম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান ৫, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০

৪. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ১৯৯৩ একাত্তরের স্মৃতি, নতুন সফর প্রকাশনী ৪৪, পুরানা পল্টন দোতালা, ঢাকা ১০০০

৫. সা'দ আহম্মদ, ২০০৬ আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল (বৃটিশ- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

6. G.W. Chowdhury, 1974 The Last Days of United Pakistan C. Hurst & Company, London

৭. আবুল মনসুর আহম্মদ, ১৯৮৯ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর - পঞ্চম সংস্করণ সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, করিম চেম্বার ৫ম তলা, ৯৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

৮. ইব্রাহিম হোসেন, ২০০৩ ফেলে আসা দিনগুলো নতুন সফর প্রকাশনী, ৪৪, পুরানা পল্টন দোতালা, ঢাকা ১০০০

৯. মুনির উদ্দীন আহমদ, ১৯৮০ বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর জাতীয় গ্রন্থ বিতান, ১৭ কে জি গুপ্ত লেন, ঢাকা

১০. অলি আহাদ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি: ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

১১. আব্দুর রউফ, ১৯৯২ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১২৩ আরামবাগ ঢাকা ১০০০

১২. এম. এ মোহাইমেন, ১৯৯৪ ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ২৮/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০

13. Mohammad Seraj Mannan, 1987 The Muslim Political Parties in Bengal 1936-1947 Islamic Foundation Bangaldesh, Baitul Mukarram, Dhaka

১৪. সরকার শাহাবুদ্দীন আহম্মদ, ২০০৪ আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল বুকস্ ফেয়ার, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

১৫. অশোকা রায়না, ১৯৯৬ ইনসাইড র'ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায় (বাংলা অনুবাদ) অনুবাদ: লেঃ (অবঃ) আবু রুশদ রুমী প্রকাশনী

16. Peter Mansfield, 1985 The Arabs, Penguin Books Ltd, Harmondworth, Middlesex, England